বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্
৪১/৭

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সপ্তম বর্ষ।

বাঁশবেড়িয়া,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দে দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
অস্থিম শয়ন (পদ্য)	১৫৪
অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী	১৯১|২৭৩|৩০৮
আকাশ-কুসুম	৯৯|১৪৬
আগমনী	২২৭
আমার অভাব	১৮৩
আমিত্ব	১১|৯০
আর্য্য সমাজে নারীজাতীর অবস্থা	৪২
আলো ও ছায়া (পদ্য)	২৪
কবিবর সৈয়দ আলাওল সাহেব	৪১১
কুলির মেয়ে (পদ্য)	৯৭
কান্যকুব্জে রাজসূয় এবং স্বয়ম্বর	২১৫|২৬৪
কীটের দেবত্ব (পদ্য)	১১১
কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	৩৩৭
কেন ভালবাসিণু (পদ্য)	২৬৩
কোন্ পথে যাই?	২৯৮
গীত (পদ্য)	৬৪
গ্রন্থ সমালোচনা	১১৭
ঘুমঘোর (পদ্য)	৩০৪
চামেলী (উপন্যাস)	১৬|৫৮
চুট্‌কী	১৮১
টপ্পা ও বিধু বাবু	৪৩৩
টানাটানি	২০১
তুমি (পদ্য)	৪১
তুমি (পদ্য)	৩০৫
দাদা (পদ্য)	
দেবী	
ধর্ম্ম-পদং	
নব-বর্ষ (পদ্য)	
নিরাশায় (পদ্য)	
পাগলের স্বপন (পদ্য)	
প্রত্যাদেশ	
প্রেম-প্রতিমা (পদ্য)	১৮০
বর্ষারম্ভে	২
বসন্তসেনা	৩০০|৩৯৭|৪২১
বালবিধবা (পদ্য)	২১১
বিদায় (পদ্য)	৩৭৩
বিরহ	২১২
ভালবাসা	১৩০
মার্শালনীল (পদ্য)	৩৫
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	৩৬|৭০|১১৮|১৫৭|১৯৭|২৩১|২৭৫|৩০৮|৩৫৩|৩৮৫|৪৪৭
মূলরের পত্র	৩০৫
মৃত্যুর পর	২৫|৪৬|১০৪|১২১|১৬১|২১৭|২৩৭|২৮৪|৩২২|৩৬৩|৪০৩
যজ্ঞ	৫|৬৫|২০৭
যোগসাধনা (পদ্য)	৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	১৩৮|২৬৬|২৭৭
সৎকার্য্যবাদ	৩৫
সুখশান্তি	৮১
স্বপন (পদ্য)	৮৯
হলাহল (গল্প)	২৪৫
হিমালয় কন্দরে সাধু দর্শন	৩১৯

সপ্তম বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত আনন্দময় শর্ম্মা।
" আবদুল করিম।
" উমেশচন্দ্র চাকলাদার।
" কালীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ।
" কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
" দাশরথী ঘোষ এম, এ, বি, এল।
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।
শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসু এম, এ।
" পার্ব্বতিনাথ ঘোষ বি, এল।
" পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল।
" প্রেমলাল বৈরাগী।
" বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ।
" মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
" যদুনাথ কাঞ্জিলাল বি, এল।
" রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
" রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল।
" শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল।
" সতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল।
" সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।
" ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।
" ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ।

ও সম্পাদক প্রভৃতি।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।
সপ্তম বর্ষ।
১৩০৬ সাল।

নব-বর্ষ।

নবীন বৈশাখে আজি কি বার্ত্তা বহিয়া
এলে তুমি নব বর্ষ? হে নব বৎসর!
পুরাণো যে সবই মোর! সেই নিরন্তর
স্বার্থচিন্তা অনুসরি সুখের লাগিয়া
সংসার-কণ্টকবনে বেড়াই ছুটিয়া,
আজও আমি পুণ্যপথে নহি অগ্রসর।
কাঁদি না দুঃখীর দুঃখে, হই না কাতর,
দীন-দরিদ্রের অশ্রু দিই না মুছিয়া,
অনায়াসে প্রবঞ্চিত করি প্রার্থীজনে।
নিশিদিন ডাকি তাই একান্তে কেবল,—
কোথা তুমি, হে বাঞ্ছিত বর্ষ অভিনব,
কবিজন্ম হয় মোর নিতান্ত বিফল!
এস এস নব বর্ষ! সঙ্গে আনো তব
বিশ্বের পিরীতি নব বাঞ্ছিত রতনে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বর্ষারম্ভে।

আবার বছর আসিয়াছে। আবার নবীন বৈশাখে নব-বর্ষ সমাগম। কালচক্রের সবেগ আবর্ত্তনে আবার চৈত্র দূরে গেল, আবার বৈশাখ নিকটে আসিল। আজি গৃহে গৃহে মঙ্গল আরতি, আজি গৃহে গৃহে গ্রহাচার্য্যের গমন, আজি দোকানে দোকানে নূতন খাতা, আজি আবার নূতন পঞ্জিকা পুরাতন করিয়া নূতন নূতন পঞ্জিকার অহঙ্কার। ভাই জিজ্ঞাসা করি বল দেখি তোমার পরমায়ুর এক বৎসর কমিল না বাড়িল?

মা জগদম্বে, বৎসর ত এল, বৎসর ত গেল মা কিন্তু কি করিয়া যে গেল মা তা তুমি যেমন জান এমন ত কেহ জানে না। মনে করি, রাজার সঙ্গে, রাজভক্তিটুকু ছাড়া, আমরা আর কোন সংশ্রব রাখিব না। কিন্তু পারি না ত। দুর্ভিক্ষের দুর্ব্বল চলুন, তৃষ্ণাতুরের শুষ্ক তালু, পীড়িতের আর্ত্তনাদ যে পুনঃ পুনঃ রাজার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। নূতন নূতন আইন যে দুম্ দুম্ শব্দে চমক ভাঙ্গাইয়া দেয়। কাজেই রাজার সমাচার লইতে হয়। ভারতে লাট বদল হইয়াছেন। পুরাতন লাট এল্‌গিন চলিয়া গিয়াছেন। নূতন বড় লাট কর্জ্জন আসিয়াছেন ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সীমলা শৈল বিহারাবসানে কেমন থাকিবেন তা মা তুমিই জান। নব পাদরী লাটেরও উদয় হইয়াছে।

কই মা প্লেগ ত থামিল না? তোর মনের কথা আমরা জানিতে চাহি না কিন্তু এই কর মা যেন তোমার ভারত সন্তান ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হয়। আমাদের সঙ্গে সকলের সহিত যে সম্পর্ক, মা তোমার কৃপায় যেন সেটুকু বজায় থাকে। মা রুমের বাদসাহের রুমনগরে একবার প্লেগ হইয়া প্রতি দিন চল্লিশ হাজার লোক মরিয়াছিল, তাই যদি হয় মা—ডরাইব কেন? যতক্ষণ রাখিবে ততক্ষণ থাকিব। কতটা কশাঘাতে চৈতন্য হইবে তা তুমিই জান—বিলম্বে প্রয়োজন কি?

মা প্লেগ প্লেগ করিয়া আবার বিশ্ব-বাঙ্গালা ক্ষেপিয়াছে। বসন্তের কোকিল, মলয়ের অনিল, ভ্রমরের গুঞ্জন তাই আজ পথের ভিখারী আদর নাই—কেহ আদর করে না, চখে দেখে না। তাই বুঝি এবার বসন্তটা হইল না। তাই বুঝি কবিরা বীভৎস রসের ভাবে ভোর হইয়া আছেন,

তাই বুঝি সাহিত্যের বাজারের দোকানে সব কপাট পড়িয়াছে। কোথাও কচিৎ দু এক খানা দরমা বা ঝাঁপ খোলা। আইনের নাগপাশ বন্ধনে দোকানী মহাশয়দিগের নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তোমার ইচ্ছায়, মা, হইলেই বা ক্ষতি কি? প্লেগের রূপ ত বিশ্বরূপ ছাড়া নহে?

এই দুর্দ্দিনে কে আর কাহার মনের কথা শুনিবে—যখন সকলেই নিজ নিজ দুঃখ-কাহিনী বলিবার জন্য ব্যস্ত? যখন পিতা পুত্রের প্রভেদ ঘটে, ভাই ভগিনীর মিল থাকে না, যখন সময়ের বিড়ম্বনায় রাজাকে প্রজা অবিশ্বাস করে, বন্ধুবিচ্ছেদ যখন প্রতিদিনের ঘটনা তখন কাহার যে কি ভাল লাগে তা কে বলিবে? কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ বিশেষত আমরা হিন্দু আমরা ভগবানকে সব সমর্পণ করিতে জানি। ভগবানকে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া তাই আজি নূতন বৎসরের নূতন দিনে দুটা পূর্ণিমার পুরাতন কথা তুলিয়াছি।

একটা বৎসর শীঘ্র কাটিয়া যায় কিন্তু একটা দিন কাটে না। এই এক বৎসরকাল আমরা যথাসাধ্য আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য করিয়াছি; যতটা করা উচিত ততটা করিতে পারি নাই বটে কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও পরাঙ্মুখ হই নাই। ইচ্ছা থাকিলেও নিজে সব করিবার যো নাই, কাজটা যে দশের হাতে। তার উপর রোগের বিড়ম্বনার উপর কাহারও হাত নাই। ভরসা করি সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য করিবেন, কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা যেন আমাদিগকে আর স্মরণ করাইয়া দিতে না হয়। আর জগদম্বে তুমি এই কর মা আমাদের নিজের কর্ত্তব্য কি যেন কখন না ভুলি।

হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক গ্রাহকগণের ব্যবহারের তীব্র সমালোচন করিয়াছেন। স্পষ্টতই বলিয়াছেন, বঙ্গের কৃতী অকৃতী উভয় সন্তানই হিন্দু পত্রিকা গ্রহণ করিয়া মূল্যের টাকা দেন না। পত্রিকা গ্রহণটা একটা সখের জিনিষ। সখের জিনিষে পয়সা খরচ করিতে যদি প্রাণে লাগে, তাহা হইলে সখটা কিছু নয় বলিয়া মনে হয়—গরজে গোয়ালা ঢেলা বয়। ধর্ম্মের ভাবে খাদ আসিতেছে। অর্থাভাবে অনেক পত্রিকা অকালে উঠিয়া যায়, বরাবর ত শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু বাজারে সাময়িক পত্রেরই বা কমি কই? পাঠক মহাশয় একবার মনে মনে হিসাব করুন, দেখুন কতগুলি সাময়িক পত্র এক্ষণে চলিতেছে। দুইটা কথার কিরূপে সামঞ্জস্য হইবে? কাগজ

াইয়া লোকে দাম দেন না অথচ বঙ্গদেশে নিত্য নূতন কাগজ প্রকাশিত হইতেছে, ইহার অর্থ কি? আরও একটা কথা আছে যে সকল কাগজ প্রকাশিত হয় বা হইতেছে, তাহার অধিকাংশই ভাল এবং ভাল ভাল লোক কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ইহারই বা অর্থ কি?

ইহা মীমাংসা করিবার চেষ্টার আবশ্যকতা নাই, ইহার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলে অনেক কথা উঠিবে। এখন থাক্।

ভরসা করি পূর্ণিমার গ্রাহক অনুগ্রাহকগণ আমাদের উপর পূর্ব্ববৎ কৃপা বিতরণ করিবেন। মা আমাদিগকে বল দাও উৎসাহ দাও, যেন কক্ষ ও লক্ষ্য ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট না হই—বড়ই দুর্দ্দিন!

এস ভাই সকলে একবার বলি—

কাহং মন্দমতিঃ ক্কেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ।
কিং তত্র পরমাণুর্ব্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়েতে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

আমাদের মোচার খোলার নৌকা পূর্ণিমা কালসাগরের তরঙ্গাঘাতে টলিতে টলিতে, উঠিতে নাবিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, চলিয়াছে। কে জানে কতদিন চলিবে? সকলই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। আসুন তবে সকলে একবার মঙ্গলাচরণ করি। আসুন ধ্যানস্থ হইয়া দেখি—

বটবৃক্ষং মহোচ্ছ্রিং পদ্মরাগফলোজ্জ্বলং।
গারুত্মতময়ৈঃ পত্রৈর্ব্বিচিত্রৈরুপশোভিতং॥
নবরত্নমহাকল্পৈর্লম্বমানৈরলঙ্কৃতং।
বিচিন্ত্য বটমূলস্থং চিন্তয়েল্লোকনায়কং॥
স্ফটিকরজতবর্ণং মৌক্তিকীমক্ষমালা
অমৃতকলসবিদ্যাজ্ঞানমুদ্রাঃ করাব্জৈঃ।
দধতমুরগকক্ষং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং
বিধৃতবিবিধভূষং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে॥

ওঁ

যজ্ঞ।

যজ্ঞ লইয়া অনেকে অনেক অর্থ করেন। বাস্তবিক দেশ, কাল, পাত্র লইয়া যজ্ঞের নানা অর্থ। এখন আমরা প্রথমে বৈদিক যজ্ঞ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মানুষ যদি আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে জানিতে পারে যে তাহার প্রাণবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মানসিকবৃত্তি—এই তিন বৃত্তি স্বতন্ত্র। এক কালে তিন বৃত্তি কার্য্য করে বলিয়া, আমরা বৃত্তির স্বতন্ত্রতা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যেখানে এক বৃত্তিই প্রবল, সেখানে আমরা সেই বৃত্তি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি।

তরু, লতাদির বৃত্তি কেবল প্রাণবৃত্তি। তাহারা পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করে এবং সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে আহার সঞ্চয় করে। তাহাদের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও আছে। এবং জনন ক্রিয়া সকল শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে আছে। কিন্তু এ কথা কেহ বলিবে না, যে তরু, লতাদির ইন্দ্রিয় বৃত্তি আছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচ ইন্দ্রিয় বিষয়ের মধ্যে কেবল মাত্র স্পর্শ জ্ঞান নাম মাত্র কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে আছে।

পশুদের মধ্যে প্রাণবৃত্তিও আছে, ইন্দ্রিয় বৃত্তিও আছে। পশুরা দেখিতে পায়, শুনিতে পায়। তাহারা রস আস্বাদন করে এবং গন্ধ, স্পর্শ অনুভব করে। যাহা ভাল, অর্থাৎ যাহার অনুভব ভাল বোধ হয়, তাহারই সম্বন্ধে পশুদের এক প্রবল অনুরাগ হয়। ইহাকেই কামবৃত্তি বলে। যেখানে ইন্দ্রিয়বৃত্তি, সেইখানেই কামবৃত্তি। এই জন্য কামবৃত্তি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্গত। পশুদের কামবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু তাহাদের মানসিক বৃত্তি নাই। তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান নাই। তাহারা পাপ পুণ্য জানে না কাল্ কি হবে, এ ভাবনা তাহাদের নাই।

মনুষ্যগণের মধ্যে প্রাণবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মানসিকবৃত্তি, এই তিন বৃত্তিই আছে। মানসিক বৃত্তির যত বিকাশ হয়, ততই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনুষ্যের পশুর সহিত সাধারণ এবং প্রাণবৃত্তি পশু ও উদ্ভিদ্ এই দুয়ের সহিত সাধারণ।

আমাদের পৃথিবী উদ্ভিজ্জ, পশু ও মনুষ্য এই তিন জাতীয় জীবেরই

ভোগ স্থান। এই জন্য সকল বৃত্তিই এই পৃথিবী মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৃত্তি লইয়া উপাধির ভেদ আছে।

আমাদের স্থূল শরীর লইয়াই প্রাণবৃত্তি। শ্বাসপ্রশ্বাস, আহার ও জনন-ক্রিয়া, এই তিনই স্থূল শরীর লইয়া। যদি স্থূল শরীর না থাকে, তাহা হইলে প্রাণবৃত্তির কোন অংশও সাধিত হয় না। তাই স্থূল উপাধি লইয়া প্রাণবৃত্তি।

স্বপ্ন অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই, শুনিতে পাই এবং নানারূপ ভোগ করিতে পারি। কেবল তাহা নয়। স্বপ্নে কত দূর দেশ দেখিতে পাই এবং অতীত ও ভবিষ্যতের বন্ধন যেন তখন ভাঙ্গিয়া যায়। একটু মাত্র মানসিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন নাচিয়া বেড়ায়। কিন্তু স্বপ্নে বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। তখন মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়। তখন বাসনার ছায়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা পুষ্ট হইয়া নানারূপ অলৌকিক মূর্ত্তি ধারণ করে। সে সময়ে যে উপাধি তাহাকে একরূপ সূক্ষ্ম উপাধি বলা যাউক। সে উপাধি স্বপ্নদেহের উপাধি।

স্থূলদেহে ও স্বপ্নদেহে আমরা ভোগের চরিতার্থতা লাভ করিতে পারি না। মনের সাধ মনেই থাকিয়া যায়। কত নিঃস্বার্থ ভালবাসা, কত পবিত্র প্রেম সমাজের ধাক্কায় চুরমার হইয়া যায়। স্নেহময় শিশু পিতামাতার হৃদয় শূন্য করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হয়। কত হৃদয়ের বেগ প্রবল প্রতিঘাতে রুদ্ধ হইয়া কেবল কষ্টেরই কারণ হয়। কেবল মনের বেগে হায় হায় বলিয়া আমরা বসিয়া থাকি। কত কবিত্বের উৎস, কত বিজ্ঞানের প্রতিভা, কত উচ্চ কল্পনার ছবি, কত জগৎ-মাতান কার্য্যের উদ্যম, প্রতিকূল ঘটনায় আবদ্ধ থাকে। সমাজের পরিচ্ছেদ, স্থূলদেহের পরিচ্ছেদ। ইহাতে মানসিকবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে না। স্বপ্নদেহে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ছুটাছুটি করিতে পারে বটে। কিন্তু স্বপ্নের সকল কার্য্যই অলীক। বিম্বের প্রতিবিম্ব, ধ্বনির প্রতিধ্বনি, পদার্থের ছায়া মাত্র। যেখানে মন নাই, সেখানে কিছুই নাই। এমন অবস্থা যদি মনে করি, যাহাতে মানসিকবৃত্তি চরিতার্থ হয়, যাহাতে স্থূল দেহের পরিচ্ছেদ নাই, স্বপ্নের ভাসা ভাসা উদ্যোগ শূন্যতা ও অলীকতা নাই, তবে সে অবস্থার উপাধি মানসিক দেহ।

আমাদের মধ্যে তিনটি দেহই আছে বলিয়া, আমরা ইহাদের স্বতন্ত্রতা বুঝিতে পারি না।

যাহাকে মরণ বলি, সেই মৃত্যুবিকারে স্থূল দেহটি খসিয়া যায়। তখন স্বপ্নদেহ প্রবল হয়। সেই দেহকে তখন প্রেতদেহ বলে। যখন প্রেতদেহটি খসিয়া যায়, তখন মানসিকদেহ প্রবল হয়। সেই দেহকে দেব দেহ বলে।

যখন প্রেতদেহ স্বতন্ত্র হয়, তখন আমরা পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পৃথিবীকে জানি ঐ পৃথিবীতে প্রেতদেহের ভোগ হইতে পারে না। প্রেতদেহের ভোগের জন্য একটি প্রেত লোক চাই। সে লোকে আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহা দ্বারা কেবল মাত্র স্থূল বিষয়ের অনুভব হয়, প্রয়োজনবিহীন হয়। সে লোকে পদার্থ সকলও সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়ও সূক্ষ্ম।

আবার মানসিক দেহের জন্য একটি মানসিক লোক চাই। সে লোকে এরূপ উপাধি থাকিবে, যে অবাধে মানসিক বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে।

বাস্তবিক বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বরের অনুগ্রহে তিনটি লোকই আছে।

যেখানে স্থূল উপাধি প্রবল, যেখানে প্রাণবৃত্তির উপর সকল বৃত্তিই নির্ভর করে, সে এই ভূর্লোক, আমাদের পৃথিবী। যেখানে প্রেতদেহ দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও কামবৃত্তি চরিতার্থ হয়, সে ভুবর্লোক। প্রেতলোক, যমলোক ও পিতৃলোক এই লোকের অন্তর্গত। যেখানে মানসিক দেহ দ্বারা মানসিক বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহাকে স্বর্লোক, স্বর্গলোক বা দেবলোক বলে।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই তিন লোক মিলিত হইয়া ত্রিলোকী হয়।

উদ্ভিজ্জগণের মৃত্যু হইলে তাহারা এই পৃথিবী মধ্যেই থাকে। এই পৃথিবী মধ্যেই আবার অন্য আকারে উৎপন্ন হয়।

পশু সকল দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া অল্পকালের জন্য ভুবর্লোকে যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের মানসিক অংশ না থাকাতে, প্রেতলোকে তাহারা স্থায়ী হইতে পারে না। কিছুকাল পরেই আবার অন্য মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। কীট পতঙ্গাদি মৃত্যুর কিছু কাল পরেই আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। ইহাদের সম্বন্ধে মৃত্যুর পর বেদে "জায়স্বম্রিয়স্ব" এই তৃতীয় মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের মৃত্যুর পর জন্ম, জন্মের পর মৃত্যু হয়। ইহারা মৃত্যুর পর অন্য লোকে অবস্থান করে না।

আবার যাহারা কেবল মাত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া দুষ্কৃত সঞ্চয় করে, যাহারা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় বৃত্তির বশীভূত হইয়া অবৈধ পার্থিব ভোগকে সার করে, সেই সকল পাপকারীগণ ভুবর্লোকস্থিত যমলোকে যাইয়া অনিষ্ট কর্ম্মের

ফল ভোগ করে। এবং যমলোক হইতে এই পৃথিবীলোকে পুনরাবৃত্তি করে। তাহারা স্বর্গলোকে যাইতে পারে না। কৌষীতকী শাখায় লিখিত আছে—"যে বৈকে চাস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি।" যে কেহ মৃত্যুর পর এই লোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে বা স্বর্গলোকে গমন করে। এই বাক্য খণ্ডন করিয়া ব্যাসদেব নিম্নলিখিত সূত্র লিখিয়াছেন—"সংযমনেত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতি দর্শনাৎ"

শারীরক সূত্র ৩-১-১৩।

যমরাজও নচিকেতাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বসমাপদ্যতে মে॥ কঠবল্লী ২-৪।

স্বর্গলোকে যাইবার জন্য ইষ্টকর্ম্ম করিতে হয়। ইষ্টকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়। ইষ্টকর্ম্ম কি বেদে লিখিত হইয়াছে। বাপী কূপ তড়াগাদি খনন ইষ্টকর্ম্ম। দান ইত্যাদি ইষ্টকর্ম্ম। যাহা লোক মধ্যে ভাল কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ইষ্টকর্ম্ম। পুণ্য দ্বারা লোকে স্বর্গলোকে যায় বটে, কিন্তু সেই পুণ্যের ক্ষয় হইলেই, আবার মনুষ্য পৃথিবী মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে। এমন কি কোন উপায় নাই, যে উপায় অবলম্বন করিয়া বহুকাল ধরিয়া স্বর্গে থাকিতে পারা যায়, অবিরত স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারা যায় এবং দেবতা ও দেবরমণীর সহিত চির বিহার করিতে পারা যায়। স্বর্গের সুখে কণ্টক নাই। সে সুখ কি চিরস্থায়ী হইতে পারে না? অবশ্য পুণ্য সঞ্চয় করিব, যদি পুণ্য ব্যতিরেকে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত না হয়। কিন্তু পুণ্যের বল আমাদের আর কত হইতে পারে। স্বর্গে চির অবস্থানের উপায় বৈদিক যজ্ঞ। "স্বর্গ কামো যজেত"। যাহারা স্বর্গের কামনা করে, তাহারা দেব যজ্ঞ করিবে। "অপাম্ সোমমমৃতা অভূম"। যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া আমরা অমর হইব। দেবতারা যেমন অমর হইয়া স্বর্গভোগ করে, আমরাও হয়ত সেরূপ অমর হইয়া স্বর্গভোগ করিতে পারিব। এই প্রবল কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বতন ঋষিগণ বৈদিক যজ্ঞ করিতেন।

দেবযজ্ঞ কি তাহা পর প্রবন্ধে দেখা যাইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

যোগসাধনা।

কে তুমি কেন গো হেন আমার কাছে?—
আমি ত জীবনে মরা,
মরমে অনল ভরা,—
স'রে যাও তব কায় ঝলসে পাছে।
যে দেখে আমারে হায়,
সেই দূরে স'রে যায়,
আমারে করিবে দয়া ভবে কে আছে?

দগধ হৃদয় মোর স্নেহের আশে,—
দাঁড়ালে সংসার-ঠাঁই,
সে যে বলে দূর ছাই,
হৃদয় ভাঙিয়া দেয় ভ্রুকুটি হাসে।
সবে ঢালে দয়াভার,
আমি শুধু পর তাঁর,
মোরেই ডাকে না শুধু স্নেহের ভাষে।

কত দয়া কত স্নেহ জগতে ভাসে,
আমারি নয়ন ধার,
পশে না মরমে কার,
এ আঁখি কেহই নাহি মুছাতে আসে।
দয়া স্নেহ হেথাকার,
চাঁদার খাতায় সার,
এখানে দুখিতে কেহ ভাল না বাসে?

(তাই) শত দূরে অশ্রুজলে ঘর বেঁধেছি,—
দীর্ঘশ্বাস সখী সনে,
প'ড়ে আছি এ নি'জনে,
সংসার নিঠুর বড় এবে বুঝেছি।
আর সংসারের গান,
শুনিতে না চাহে প্রাণ,
অনন্ত আরাম গেহ হেথা পেয়েছি।

সাধিব জীবন-ব্রত এখানে নিতি,
না হ'তে সকালবেলা,
ভেঙেছে আমার খেলা,
তা ব'লে কি পোড়া প্রাণে ব'বে না প্রীতি ?
সাধিয়া তপস্যা যোগ,
ভুলিব এ কর্ম্মভোগ,
গাহিবে পরাণ তাহে আরাম-গীতি।

কে তুমি এ যোগব্রত ভাঙিতে এলে,
আমার বুকের কালী,
ধোবে কি অমৃত ঢালি,
অথবা তুমিও যাবে চরণে ঠেলে !
শত চূর্ণ এ হৃদয়,
তাই পদে পদে ভয়,
কি জানি দেবতা ! পাছে যাও গো ফেলে।

এত যে যাতনা—ভুলি ওমুখ চেয়ে,
ও যে গো স্বর্গীয় মুখ,
স্মরণেতে হরে দুখ,
উছলে অমৃত নদী মরম ছেয়ে।
ও চরণে নিশি দিন,
তাই চাহি হ'তে লীন,
তাই এই যোগ সাধা—পাগল হ'য়ে।

ভেঙনা এ মহা যোগ ধরি চরণে।
যাহা আছে সব যাক,
শুধু এ সাধনা থাক,
বহিবে অমৃত তাহে মরু-জীবনে।
ও মুখে নয়ন রাখি,
এই যোগে ডুবে থাকি,
যাইব সে নিত্যধামে বাসনা মনে।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

আমিত্ব।

(৪)

মানবের শরীরের অভ্যন্তরে যে বায়ু আছে, তাহা নিরোধ করিলে সমাধি হয় ও ভগবদ্দর্শন হয়। যাঁহারা বলেন যে নিশ্বাস প্রশ্বাস যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র, তাঁহারা ঠিক জানেন না। মৃত্যুর পরেও ত যন্ত্র বিদ্যমান থাকে তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে না কেন? কতকগুলি জীবের আবার ফুস্‌ফুস নাই। মানব শিশুর ফুস্‌ফুস নাই। তাই ছেলেদের পেট ধক্ ধক্ করে। একই বায়ু দেহের স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ করে। ভগবান অনেক স্থলেই বলিয়াছেন যে আমিই জঠরাগ্নি হইয়া অন্নাদি পরিপাক করি। পাঁচটি প্রধান বায়ু জীবের শরীরে আছে। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ বায়ু। উর্দ্ধগমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ু হইতেছে—প্রাণ বায়ু। অধোগমনশীল ও পায়ু প্রভৃতি নীচাঙ্গস্থায়ী বায়ু হইতেছে—অপান বায়ু। সর্ব্ব নাড়ী সঞ্চারী ও সর্ব্ব শরীর ব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান। উর্দ্ধে উৎক্রমনশীল ও কণ্ঠস্থায়ী বায়ুর নাম উদান। যে বায়ু শরীর অভ্যন্তরস্থ ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক করে সুতরাং রক্ত রস মল মূত্রাদিতে পরিণত করে তাহার নাম সমান বায়ু। কাহারও কাহারও মতে আরও পাঁচটী বায়ু আছে। তাহাদের নাম নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। নাগ বায়ুর কার্য্য হইতেছে উদ্গীরণ। কূর্ম্ম বায়ুর কার্য্য হইতেছে নিমীলনাদি। কৃকর বায়ুর কার্য্য হইতেছে ক্ষুধা করা। দেবদত্তের কার্য্য—জৃম্ভণ। ধনঞ্জয়ের কার্য্য—পুষ্টি। বেদান্তবাদীগণের মতে শেষোক্ত বায়ু পাঁচটি, প্রথমোক্ত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর মধ্যেই পরিগণিত ও অন্তর্নিবিষ্ট।

শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে বেষ্টন করিয়া আছে, রক্ত মাংস হাড় ইত্যাদি, অর্থাৎ শরীররূপ কেমিকেল কম্পাউণ্ড। প্রাণ চলিয়া গেলে বা মৃত্যু হইলে যে শরীর পড়িয়া থাকে, সে শরীর আত্মা নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তখন মোটা করিয়া বলিয়াছিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক জড়দেহ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন অসিকোষ যেমন অসির আচ্ছাদক সেই রূপ মন বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার আচ্ছাদক। এই জন্য মন বুদ্ধি প্রভৃতিকে শাস্ত্র "কোষ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোষও পাঁচটি। পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক নামক প্রথম পরিচ্ছেদে এই পাঁচটি কোষের পরিচয় আছে। অন্নময়

কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষ, আর আনন্দময় কোষ। গুটীপোকা যেমন স্বীয় কোষ প্রস্তুত করিয়া আপনি তন্মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে ও নিরতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে, আত্মাও সেই রূপ এই পঞ্চ কোষ আবরণে আবৃত হইয়া নিরতিশয় দুঃখ ভোগ করে ও স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যায় ও সংসার গতি প্রাপ্ত হয়। দেব রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" অন্নকোষ বা স্থূল দেহের অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ অবস্থিত। তাহার অভ্যন্তরে মনোময় কোষ অবস্থিত। তাহার অভ্যন্তরে আবার বিজ্ঞানময় কোষ অবস্থিত। ইহাকে 'কর্ত্তা'ও বলে। বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ অবস্থিত। এই আনন্দময় কোষকে 'ভোক্তা'ও বলে। পর পর অবস্থিত এই পাঁচটি কোষকে "গুহা" বলা হয়। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে দেহ তাহাই স্থূলদেহ, তাহাকেই অন্নময় কোষ বলে। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত কি তাহা পরে বুঝাইতেছি। পিতৃমাতৃভুক্ত অন্ন হইতে যে বীর্য্য জন্মে তাহা হইতেই স্থূলদেহ উৎপন্ন হয় এবং প্রধানত অন্নরস দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। এই জন্য স্থূল শরীরের নাম অন্নময় কোষ। এই অন্নময় কোষের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে অভাব হয় অর্থাৎ ইহা থাকে না। সুতরাং ইহা আত্মা হইতে পারে না। স্থূল শরীর চারি প্রকারের, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। এই চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীরই অন্নের বিকার। অন্ন অর্থে আহারীয় দ্রব্য। সেই জন্য এই কোষের নাম অন্নময় কোষ।

প্রাণময় কোষ।—লিঙ্গ শরীর মধ্যে বর্ত্তমান ও রজোগুণের কার্য্যভূত যে প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু এবং বাক্ আদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটি মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ বলিয়া উক্ত হয়। পূর্ব্বেই বায়ুর কার্য্য বলা হইয়াছে। এই বায়ু দেহের সর্ব্বত্রই বহমান, আপাদমস্তক ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ও দেহে বল সঞ্চয় করিতেছে এবং ইন্দ্রিয়গণের উপর কর্তৃত্ব করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে। এই প্রাণময় কোষ 'আত্মা' হইতে পারে না কারণ ইহা জড় পদার্থ; ইহার চৈতন্য নাই।

সাত্ত্বিকৈ র্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ। সত্ত্বগুণের কার্য্য, চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহার সহিত সংশায়াত্মক মন মিলিত হইয়া মনোময় কোষ বলিয়া কথিত হয়। পঞ্চদশীর এই মত। কিন্তু বেদান্ত সারের

মতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে মনোময় কোষ বলে। মনোময় কোষের কার্য্য কি?—এই গৃহ আমার, আমার শরীর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র ইত্যাকার জ্ঞান করাইতেছে। এই মন কদাপি স্থির নহেন। সর্ব্বদা সংশয় উৎপন্ন করিতেছেন এবং কাম ক্রোধ লোভাদি দ্বারাও ক্ষণে ক্ষণে উৎপীড়িত হইতেছে। সেই জন্য মনোময় কোষ ও আত্মা শব্দে কথিত হয়েন না।

বিজ্ঞানময় কোষ।—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়। মন সংশয়াত্মক বটেন কিন্তু বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। চিচ্ছায়া বিশিষ্ট যে বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে লীন হয় ও জাগ্রদবস্থায় নাসাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া থাকে, তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ। ইহার লয় আছে সুতরাং ইহাও আত্মা নহে। এই বিজ্ঞানময় কোষই আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন এবং ইনিই ইহকালে অবস্থান করেন ও পরলোকে গমন করেন। এইজন্য ইহাকে ইহকাল ও পরকালগামী জীব বলা হয়। প্রাণময় কোষের কার্য্য ক্রিয়াশক্তি; মনোময় কোষের কার্য্য ইচ্ছাশক্তি; আর বিজ্ঞানময় কোষের কার্য্য জ্ঞানশক্তি। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিনটি কোষ মিলিত হইয়া যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে শাস্ত্রে সূক্ষ্ম শরীর বলে।

আনন্দময় কোষ—কারণ শরীর অবিদ্যায় যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা ইষ্টলাভ ও ইষ্টদর্শনাদি জনিত মোদাদি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হয়। পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগকালে ইহা আনন্দ অনুভব করে পরে কিন্তু সে আনন্দের শেষ হইয়া যায়। আনন্দময় কোষ আত্মা নহেন কারণ এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী নিত্য নহে। আত্মা যখন যে কোষে অবস্থান করেন তখন সেই কোষের সহিত তাঁহার প্রীতি হয় তখন তিনি সেই কোষই বলিয়া উক্ত হন। সেই জন্য আত্মা কখনও প্রাণময়, কখনও মনোময়, কখনও আনন্দময়। যখন মানব বুঝিতে পারে যে আত্মা পঞ্চ কোষ হইতে পৃথক্ এবং তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় তখনই তাহার মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটির নাম সূক্ষ্মভূত বা পরমাণু ইহাদিগকে সূক্ষ্ম তন্মাত্র সমূহও বলে। আমরা কর্ণে শব্দ পাই, ত্বকে স্পর্শ অনুভব করি,

চক্ষু দ্বারা রূপ দেখি, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করি এবং নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ পাই। এই পরমাণু বা সূক্ষ্মভূত হইতে পঞ্চ স্থূলভূত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মভূত পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলভূত হয় "স্থূলভূতানি তু পঞ্চীকৃতানি"—বেদান্তসার। সূক্ষ্মভূত জগৎ নির্ম্মাণের উপযোগী নহে বলিয়া তাহাকে স্থূল করিয়া লইতে হয়। এই পঞ্চীকরণ কি প্রকারে সাধিত হয়? সূক্ষ্ম আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের প্রত্যেককে প্রথমত সমান দুই দুই অংশে বিভাগ করিয়া সেই দুই দুই অংশের এক এক অংশকে সমান চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে সকল ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ হইল। যথা, একের দুই অংশ সূক্ষ্ম আকাশ, একের আট অংশ সূক্ষ্ম বায়ু, একের আট অংশ সূক্ষ্ম তেজ, একের আট অংশ সূক্ষ্ম জল, একের আট অংশ সূক্ষ্ম পৃথিবী = স্থূল আকাশ। এইরূপে অপরাপর স্থূলভূত হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস; এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ইহাদিগের প্রথমোক্তগুলি অপেক্ষা শেষোক্ত গুলির এক একটি করিয়া গুণ সংখ্যা অধিক। কারণ গুণ কার্য্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আকাশ তামশ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন তাহার গুণ শব্দ আর অন্য কোন কারণ নাই। কিন্তু বায়ু আকাশের কার্য্য এবং তাহার আপনার গুণ স্পর্শ কিন্তু আকাশ হইতে উৎপন্ন করিয়া তাহাতে আকাশ গুণও বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে পর পর গুলি, যাহা উপরে দেখান হইয়াছে।

এক্ষণে একটা কথা উঠিতে পারে। ইংরেজী কেমিষ্ট্রি মতে এলিমেণ্ট অনেকগুলি। আর হিন্দুমতে পাঁচটি মাত্র ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম ইহার কারণ কি, উভয়ে এত প্রভেদ কেন? এই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করা অতীব কঠিন। আমাদের মতে হিন্দুর বিভাগই ঠিক এবং য়ুরোপীয় প্রথাও ক্রমে এই মত অবলম্বন করিবে। এমনও দেখা যাইতেছে যে প্রথমে য়ুরোপীয়রা যাহাকে এলিমেণ্ট বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আর মূল পদার্থ নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমরা পরে এক সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর দান করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। এক্ষণে পারিতেছি না। তবে একটা কথা শ্রোতব্য। স্থূল পঞ্চ ভূতের পাঁচ

প্রকার আকার। য়ুরোপীয়দের যে এলিমেণ্ট বা মূল পদার্থগুলি তাহাও এই পাঁচ প্রকার আকারের বটে। সলিড, লিকুইড ও গ্যাস প্রভৃতি।

আমার শরীরের সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ও ভগবানের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইতে পারিলে কথাটা অনেক খুলিয়া আইসে ও আমিত্বের বিচার চলে। সেই জন্য এইক্ষণে মূল প্রকৃতি মায়া হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্টি ও জীবের দেহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

নিরাশায়

ভাই, ভেঙ্গেছে তরণীখানি, প্রতীপ পবনে
ছিঁড়িয়াছে পক্ষ তার। তরুণ তপন
ঢাকিয়াছে মুখখানি গাঢ় নীলাম্বরে,
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ ভীম পারাবারে।
ক্ষীণদেহ কর্ণধার জরতি জরিত;
সম্বলবিহীন দীন কাঁপে হাত দুটী।
ভেসে যায় তরীখানি যথেচ্ছ গমনে
নারে নিবারিতে। শত মৈনাক গোপিত
রঙ্গময় স্রোত মাঝে, কুয়াসা আঁধার।
ডুবে ডুবে তরিখানি। হায় ভগবান!
নাহি আশা, নাহি বল, ত্রাসে কাঁপে বুক
দুরু দুরু। ভেসে যায় দুর্ব্বল তরণী।
ডুবিবে সে ডুবাইবে অতল সলিলে,
হাঁসিবে অরাতি কূল, এই হবে শেষ!
তথাপিও ছাড়িব না হাল। প্রাণভয়ে
মানভয়ে ভীরুজনে করি পদাঘাত
চিরদিন। পরশ পাথর চাহে যেই
ডরে কি সে কালসাপে? ডরে কি মরিতে?
মরণ শরণ মোর মরণ শরণ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

চামেলী।

(উপন্যাস।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রাণের গাথা।

রাত্রি দুইটা। চামেলী শয্যায় পড়িয়া আছেন। বৃদ্ধ হরমোহন বাবু উপর্য্যুপরি চারি রাত্রি জাগিয়া আজ গাঢ় নিদ্রিত। চামেলীর পীড়া বাড়িয়াছে বই কমে নাই। জ্বর, তৃষ্ণা, চক্ষুলাল, অসংলগ্নকথা, পার্শ্ববেদনা, কষ্টকর কাশি, তাপের বৃদ্ধি, দুর্ব্বলতা সহকারে নাড়ীর কম্প বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রত্যেক কুলক্ষণই বর্ত্তমান। চামেলীর সেই আয়তনয়ন যেন এক প্রকার রক্তবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। গৃহে একটি প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। পীড়িতার পার্শ্বে প্রভাস এক দৃষ্টে তাহার শুষ্ক মুখখানির প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছেন।

প্রভাসও আজ কয়েকদিন অক্লান্ত, অবিশ্রামে, পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই। যখন একবার অবকাশ পান কেবল চিকীৎসা পুস্তক তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন। তাঁহার এবং ডাক্তার বাবুর প্রতিভা একত্রিত হইয়াও রোগের কিছুই উপশম করিতে পারিতেছে না। বেগবতী নদীকে বাধা দেওয়া সহজসাধ্য নয়।

প্রভাস বসিয়া আছেন, আর অন্য মনে পীড়িতার অবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। থারমোমিটারটা কাছে ছিল, একবার তদ্দ্বারা তাপ পরীক্ষা করিতে গেলেন। চামেলী বিরক্তিসহ বলিল, "আঃ! কে গো?"—

"কেন চামেলী? আমি, আমি,—" প্রভাস সাগ্রহে ম্লানমুখে উত্তর দিলেন "আমি আমি"। চামেলী চক্ষু উন্মীলন করিল।

প্রভাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "চামেলী কেমন আছ? আমায় চিন্তে পাচ্ছ"?

চামেলী বলিল "বড় তৃষ্ণা জল জল"। এক চামচ জল লইয়া প্রভাস চামেলীর মুখে দিলেন। পীড়িতা জল খাইয়া যেন একটু সুস্থ হইল বলিল, "আমি বেশ আছি। এখানে কে আছেন? রাত কত?" প্রভাস বুঝিলেন চামেলীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি বলিলেন,—

জ্যাঠা মহাশয় বড় পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এখানে কেবল আমি একা আছি। রাত দুইটা। প্রভাস হরমোহন বাবুকে গ্রাম সম্বন্ধে জ্যাঠা মহাশয় বলিতেন।

চামেলী ভ্রূকুঞ্চিত করিল, প্রভাসের দুই হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার কি ঘুম পায় নাই? রাত জেগে অসুখ করবে যে! আমার জন্য তুমি,—" প্রভাস বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার জন্য ভেব না, তোমার এ অসুখ দেখে কি আমার ঘুম পায়? তোমার জন্য,—

চামেলী বিষণ্ণ বদনে বলিল, "তা সত্য, কিন্তু আমি ত এর শতাংশের একাংশ ভালবাসাও তোমাকে দিতে পারি নাই, তোমার কাছে থাকলে আমি অনেক যন্ত্রণা ভুলি সত্য কিন্তু প্রকৃত আত্মহারা হইতে ত পারি না, যেন কেমন একটা অভাব থাকে, প্রাণ যেন আরো কিছু চায়। তবে তুমি আমার জন্য এত কর কেন? প্রভাসের চোখে জল আসিল বলিলেন, "চামেলী তোমার অন্তর আমি কি বুঝতে পাচ্ছি না? তুমি আমাকে যে টুকু স্নেহ কর সেই টুকুই যে অপার্থিব। আমি যে এত করি কেন, জাননে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বোনের অসুখ হইলে ভাইএর কি কিছু করিবার অধিকার নাই? চামেলী তুমি হিন্দুনারী বিবাহিতা তোমার দেহ, হৃদয় সমস্ত তোমার স্বামীর আমরণকাল এ কথাটি ভুলিও না--আমাকে ভ্রাতৃভাবে দেখিও আমি তাহাতেই সুখী হইব।

এবার চামেলীর চোখে জল ছল ছল করিতে লাগিল বলিল "আমি এবার বাঁচিব না"—।

"কেন চামেলী"? মর্ম্মান্তিক আগ্রহে প্রভাস বলিলেন "কেন চামেলী"?

চামেলী পূর্ব্ববৎ বলিল "বাঁচিয়া সুখ কি?"

প্রভাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন ভাবিলেন "বাঁচিয়া সুখ কি?" বলিলেন "বাঁচিয়া সুখ নাই সত্য কিন্তু মরিয়া ফল কি? যদি সেখানে আরও অসুখ থাকে।"

চামেলী আবার জল চাহিল। পাত্রে পথ্য ছিল, এবার তাহাই এক চামচ লইয়া প্রভাস চামেলীর মুখে দিলেন। চামেলী পুনরায় বলিল, "আমার বিশ্বাস যাহা চাই, মরিলে এবার তাহাই পাইব, তাই মরিতে সাধ হয়"।

প্রভাস। চামেলী সত্য করিয়া বল তোমার প্রাণ কি চায়?

চামে। প্রাণ যে কি চায় তাহা ভাষায় বুঝাইতে পারি না, সে প্রাণের কথা প্রাণই বুঝে—সত্য কথা বলিতে কি কতবার ভাবিয়াছি, তোমাকে পতিরূপে পাইলে সুখী হইতাম কিন্তু তোমাকে ভালবাসি কি না বিচার করিয়া দেখিলে সে ভালবাসার খাই কোথায় হারাইয়া যায় তাহাও ঠিক বুঝি না, তোমাকে দেখিয়া ঠিক আত্মহারা হই না কিন্তু অনেকটা তৃপ্তি পাই সে তৃপ্তি জগতে আর কোথাও পাই নাই, তাই বলিতে হয়, তোমাকে ভালবাসি কিন্তু তোমাতে ডুবি নাই। কোথাও যেন ডুবিতে সাধ হয়, আমি কাহারও হইলাম না, এ দুঃখ যেন বড়ই অসহনীয়।" পীড়িতা মুর্চ্ছিতা হইল।

প্রভাস তাড়াতাড়ি মুর্চ্ছিতার মুখে চোখে ঠাণ্ডা জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে মুর্চ্ছাত্যাগ হইল। প্রভাস বলিলেন, "চামিল, ঘুমাও, আর বেশী কথা কয়ো না, ঘুমাও।" পীড়িতা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইল, ঘুমাইল কি না জানি না।

প্রভাস পীড়িতার পার্শ্বদিকে আসিয়া বসিলেন, সেই দিকে একটি ক্ষুদ্র তাকে একখানি বাঁধান বই দেখিতে পাইলেন। বইখানির শীর্ষদেশে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল "প্রাণের গাথা"। প্রভাস বাঁধান বইখানি লইয়া খুলিলেন, দেখিলেন সে খানি মুদ্রিত পুস্তক নয়, একখানি খাতা। খাতা খুলিয়া দেখেন, লেখা চামেলীর। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—

সাগরে মিশিতে যবে ধাই,
সে যে গো গরব ভরে, ঠেলে দেয় পায়ে ক'রে,
কাতর পরাণে তাই ধরণী লুটাই।
দীন এ অভাগীজন, দিতে নাহি কোন ধন,
আমার সম্বল শুধু বন ফুল হায়!
সেই বন ফুল দলে, সে দেব পূজিতে গেলে,
সৌন্দর্য্য বিহীন ব'লে সে যে দলে পায়।
এত অনাদরে কেন পরাণ না যায়।

এক বার দুই বার তিন বার পড়িলেন, লেখিকার ক্ষোভপূর্ণ হৃদয়খানি যেন দর্পণের ন্যায় সেই কবিতা কয়পংক্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রভাসের চক্ষে জল আসিল। দ্বিতীয় কবিতাটি দেখিলেন, তাহাতে লেখাছিল,—

ক্ষুদ্র বনলতা যবে সহকার চায়,
না পেয়ে আশ্রয় তরু ধরণী লুটায়!
সমুখে যাহাই পায়, জড়াইয়া ধরে তায়,
আশ্রয়ের যোগ্য কি না করে না বিচার,
তখন বিচার শক্তি থাকে কি তাহার?
অন্যটিতে,— সাগরে ডুবিতে সদা এ হৃদয় চায়,
প্রভাস চরণ পানে, ছুটে প্রাণ কায়মনে,
হৃদয়ে বাঁধিতে তারে বড় সাধ যায়।
সে চরণে হৃদি হায়, কভু ফেরে কভু ধায়,
নাহি বুঝি প্রহেলিকা হায় এ কেমন!
এ তীব্র রহস্য ভেদ হবে কি কখন!

প্রভাস অবনত মস্তকে খাতা বন্ধ করিলেন, আর পড়িতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে কি এক তীব্র লহরী খেলিতে লাগিল। তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রভাত হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এই কি সেই।

কলিকাতার একটি বৃহৎ বাটী নানারূপ মহার্হ দ্রব্যাদির দ্বারা সজ্জিত। দ্বারে সশস্ত্র শান্ত্রিগণ পাহারা দিতেছে। বাটিটি দেখিলেই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে তাহার অধিকারী তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। সেই বাটীর বৈঠকখানার একটি প্রকোষ্ঠে একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িতভাবে একটি বাবু একখানি ইংরাজি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। বাবুটির বয়স পঞ্চবিংশতির অধিক নহে, মুখশ্রী সুন্দর সরলতাব্যঞ্জক। তাঁহার পরিধানে ফরাসডাঙ্গার ফিন ফিনে কালাপাড় ধুতি, গায়ে সুইজের একটি পাঞ্জাবী, মাথায় অ্যালবার্টসিথা আর সেই সুরঞ্জিত কেশরাজি হইতে ইডিকলম দেলখোস প্রভৃতি এসেন্সের সৌরভরাজি অন্যের দিল খোস করিয়া তুলিতেছে। বাবুটির গৃহটিও বহুমূল্য বিলাতি দ্রব্য দ্বারা সজ্জিত। বাবুটি যে বিলাসপ্রিয় তাহা তাঁহার গৃহের আস্‌বাবাদি এবং তাঁহার পরিচ্ছদাদি দৃষ্টেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বাবু পুস্তক পাঠ করিতেছেন এমন সময় সরকার আসিয়া জানাইলেন,

"স্কুলের একজন সেক্রেটরী কিছু চাঁদার প্রত্যাশায় আসিয়াছেন," বাবু বলিলেন "সহি বহি কোথা?" "এই যে" বলিয়া সরকার সহিবহি প্রদান করিলে, বাবু দশ টাকার সহি দিয়া বলিলেন "এখনই দশ টাকা দাও গে"। সরকার চলিয়া গেলে অন্য একটি ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, আগন্তুক বাবুটির সহিত গৃহস্বামীর পরিচয় ছিল না সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কোথা হইতে?"

আগ। বসন্ত বাবুকে জানেন?

বাবু। বসন্তকে জানি না সে যে আমার class friend.

"আমি তাঁহারই নিকট হইতে আস্‌ছি, এই পত্র আপনাকে দিয়াছেন" এই বলিয়া তিনি বাবুটির হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। পত্র দ্বারা বসন্ত বাবু তাঁহাদের একটি সমিতির জন্য বাবুটির নিকট কিছু চাঁদা প্রার্থনা করিয়াছেন, বাবুটি দ্বিরুক্তি না করিয়া আগন্তুকের নিকট হইতে সহিবহি গ্রহণ করিয়া পঁচিশ টাকা সহি করিলেন।

এইরূপে বেলা তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত চাঁদার খাতায় নাম লেখা চলিল। চাঁদার খাতায় নাম লিখিতে বাবু মুক্তহস্ত। দানের পাত্রাপাত্র বিচার নাই, যাহার সহিত কিঞ্চিত আলাপ আছে যে দুটা ভাল কথা বলিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, বাবু তাঁহারই প্রতি অনুকুল। নিজের আয়ের দিকে লক্ষ্য নাই, ব্যয় চলিতেছে অজস্র।

যখন চাঁদার খাতায় নাম লেখা কার্য্য সমাধা হইল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়, বাবু তখনও পুস্তক পাঠে বিভোর। বাবুর গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য তখনও আলো জ্বালিয়া ঝাড়গুলি আত্ম কৃতার্থতা লাভ করে নাই। গৃহ অল্প অন্ধকারযুক্ত হইয়াছে, বাবু পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন বহুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, ভৃত্য আসিয়া আলো দিয়া গেল, বাবুর চমক নাই ঝি আসিয়া জলখাবার রাখিয়া গেল, বাবুর লক্ষ্য নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "হায় অদৃষ্ট বাল্যের এত সাধ, এত আশা, এত কল্পনা সমস্তই অতল জলে গেল! সৌন্দর্য্যের তীব্র পিয়াসায় হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, এ পিয়াসা মিটিবার কি উপায় নাই! লোকে বলে মানুষ যা চায় তাই পায়, তবে আমি যে আজন্মকাল সৌন্দর্য্যের সাধনা করিলাম পাইলাম না কেন? কে বলে ভগবান সর্ব্বশক্তিময়, ভগবান

যদি সর্ব্বশক্তিমানই হইতেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র বাসনাটি পূর্ণ করিতে তাঁহার শক্তিতে কুলাইল না কেন? কতবার ভাবিয়াছি, তাহাকে ভালবাসিব তাহাকে লইয়াই প্রাণের পিয়াসা মিটাইব কিন্তু ছাই তীব্র সৌন্দর্য্যকাঙ্খা আসিয়া আমার সকল সঙ্কল্প ভাঙিয়া দেয়! আচ্ছা আমার এই যে সৌন্দর্য্যকাঙ্খা ইহা কি অন্যায় ইহাতে কি পাপ সঞ্চয় করিতেছি! পাপ! পাপ কিসের জগতে কে না সৌন্দর্য্য ভালবাসে! গোলাপের এত আদর কেন তাহার সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই ত!" এমন সময় পশ্চাদ্দেশ হইতে কে বলিল, "না গুণ আছে বলিয়া"! বাবুটি পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এ কি তুমি কোথা হইতে কি মনে করে?"

আগন্তুক একজন ভদ্র যুবক। আগন্তুক ব্যক্তি কহিলেন "কেন আসতে নাই কি"? "সে কি কথা আস না ইহাই দুঃখ" এই বলিয়া বাবুটি আগন্তুক যুবার হস্ত ধরিয়া পার্শ্বের চেয়ারে বসাইলেন। যথাবিহিতরূপে শিষ্টাচার কার্য্য সমাধা হইলে আগন্তুক যুবা বলিলেন "কেমন সতীশ সুখে আছ ত?

বাবু বলিলেন "সুখ সে অনেক দিন বিদায় লইয়াছে।

আগন্তুক। কেন? তুচ্ছ সৌন্দর্য্য পিয়াসার জন্য কেন ভাই আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ? রূপ কদিনের "কল্পান্তস্থায়িনোগুণা" রূপের নাশ আছে গুণ অবিনাশী। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দর্শনমাত্রে কিয়ৎ ক্ষণের জন্য দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে সত্য কিন্তু তাহা গুণহীন হইলে কতক্ষণ থাকে। সৌরভহীন কোন সুন্দর কুসুম অজ্ঞতাবশে কেহ চয়ন করিয়া যতক্ষণ না নাসিকাগ্রে ধরে ততক্ষণই তাহার আদর করে, যে মুহূর্ত্তে তাহার সৌরভহীনতা প্রকাশ পায় সেই মুহূর্ত্তে চয়নকারী তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করে। পলাশ বা শিমুলের ফুল দেখিতে কত জমকাল কিন্তু কে তাহাকে আদর করে। দেখ চিত্র বিচিত্র বিবিধ পক্ষী থাকিতে ভারতবর্ষ হইতে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত কাল কোকিলের এত আদর কেন? একটা চলিত কথায় আছে "রূপে বাঁধে গুণে বশে" সর্ব্বত্রই গুণের আদর, গুণই মনুষ্যত্ব তখন তুমি তুচ্ছ সৌন্দর্য্যের জন্য এত লালায়িত হইতেছ কেন? তোমার পদতলে কোহিনূর গড়াগড়ি যাইতেছে, কাচখণ্ড লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেছ কেন? একবার কি দুঃখিনী চামেলীর কথা মনে করবে না? তোমার শত অনাদর অপ্রতিহতভাবে প্রতিনিয়ত সহ্য করিয়াও সে তোমার চরণ ছাড়া

হইতে চাহে না। তোমার প্রতি তাহার যত্ন ভালবাসার কথা একবার স্মরণ কর দেখি? তাহার সে অপার্থিব গুণরাশীর প্রতিদানে তুমি তাহাকে প্রতিনিয়ত অনাদর লাঞ্ছনা দান করিতেছ, তোমার কি একটু ধর্ম্মভয় নাই? অহরহ সেই নিরপরাধিনী সরলা বালিকার চক্ষে জল পড়িতেছে, তাহাতে কি তোমার পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না? ভগবান কি রুষ্ট হইতেছেন না?

এই সতীশচন্দ্র চামেলীর স্বামী। আগন্তুক প্রভাস। বাল্যকাল হইতে প্রভাস সতীশচন্দ্রের সহিত এক স্কুলে এক ক্ল্যাসে পাঠ করিয়াছেন সেই সময় হইতে উভয়ের বন্ধুত্ব। চামেলীর সহিত সতীশচন্দ্রের বিবাহ হওয়ায় সেই বন্ধুত্ব এখন আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যবন্ধু বলিয়াই ধনী সতীশচন্দ্রকে আজ প্রভাস এত কথা বলিতে পারিলেন।

কাহাকে পাপ কাহাকে পুণ্য বলে সতীশচন্দ্র অত বুঝিতেন না কিন্তু পাপকে তিনি বড় ভয় করিতেন। কেহ যদি কোন কার্য্যকে 'পাপ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন সতীশচন্দ্র কদাপি সে কার্য্য করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাসী আত্মীয় বান্ধবগণ অথবা ধনবিদ্যাসম্পন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যে কোন বিষয় যেরূপভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তিনি সেইরূপই বুঝিতেন, নিজে কখনও কোন বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতেন না। এই সকল কারণে অনেকে তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিত কিন্তু বস্তুতঃ সতীশচন্দ্র নির্ব্বোধ নহেন তবে তিনি অত্যন্ত সরল ও উদার প্রকৃতি, এই সরলতা উদারতাই অনেক সময় অনেক স্থলে তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত করিত। সংসার বিষম স্থল এখানে এত সরলতা উদারতা ভাল নহে সতীশচন্দ্র তাহা বুঝিতেন না।

প্রভাস যখন বলিলেন "ইহাতে কি তোমার পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না?" তখন সতীশচন্দ্রের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল, হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশনজ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল, চামেলীর সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখখানি হৃদয়ে জাগরিত হইল বলিলেন "প্রভাস আমি ত চামেলীকে কোন কষ্ট দিই নাই, সে যখন যাহা চাহিয়াছে তাহাই দিয়াছি।"

প্রভা। সে কথা সত্য কিন্তু একটি জিনিষ দাও নাই।

সতী। কি?

প্রভা। ভালবাসা। স্ত্রী অর্থাদি ছাড়া স্বামীর নিকট আরও কিছু প্রত্যাশা করে, সে প্রার্থিত দ্রব্যটির নাম ভালবাসা, পতী পত্নীর মধ্যে ভাল-

বাসা সঞ্চারিত না হইলে সংসার অশান্তিময় হয়, জীবন বিষময় হইয়া উঠে—তাহা কি বুঝিতেছ না?

সতী। সব বুঝিতেছি, আজ কয় মাস চামেলীর অভাবে আমার মনে যে শান্তি আছে তাহাও নহে, কেমন যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছে! যাহোক ভাই যা হবার হয়েছে, আর আমি চামেলীকে মনঃপীড়া দিব না, আমি তাকে ভালবাসব, শীঘ্র তাকে আমার কাছে আনব।

প্রভাস। ভগবান তোমার সুমতি দিন সৌন্দর্য্যকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া গুণানুশীলন করিতে চেষ্টা কর তবেই চামেলীকে লইয়া সংসারে স্বর্গ সুখানুভব করিবে। তুমি যে বলছ চামেলীকে শীঘ্র আনবে কিন্তু এখন আনবে কি করে? সে যে শঙ্কট পীড়ায় পীড়িত জানি না এ যাত্রায় ভগবান কি করেন! আমি তোমাকে সেই সংবাদ দিবার জন্যই এসেছি—একবার দেখ্‌তে যাবে না?

চামেলীর পীড়ার সংবাদে সতীশচন্দ্রের হৃদয়ে আঘাত লাগিল, প্রফুল্ল বদনমণ্ডল বিষাদচ্ছটায় আচ্ছন্ন হইল, মর্ম্মস্থল মথিত হইয়া নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। প্রভাস বিস্মিত অন্তরে ভাবিলেন "এ কি চামেলীর জন্য আজ সতীশচন্দ্রের চক্ষে জল! যে সতীশচন্দ্র চামেলীর ছায়া স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করিত সেই সতীশচন্দ্র আজ চামেলীর জন্য কাঁদিতেছে! এই কি সেই!

সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরবে কত কি চিন্তা করিয়া বলিলেন "প্রভাস এখনি চল, চামেলীকে দেখিতে যাই"।

প্রভাসের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না, আবার ভাবিলেন "এই কি সেই"?

ক্রমশঃ।

আলো ও ছায়া।

জগত জড়ায়ে বুঝি এই হেন রিতি-রে।
একাধারে দুই রাগ তাই হেরি নিতি-রে॥
বিমল নিরমলতা কভু নাহি মিলে হেতা।
ছায়া শূন্য নাহি হেরি একটীও ভাতি-রে॥
ঘৃণেয় মলিন মাঝে শুভ থাকে কত সাজে।
করুণার অশ্রুকণা উহার ও সাথি-রে॥
সৌরভে কুসুম ভরা কুসুম কীটেও পোরা।
মহত্ত্বে ক্ষুদ্রত্ত্বে ভেদ কত সুক্ষ্মতর-রে॥
গোলাপ ফুটেছে যায় কাঁটা সারি বেড়ে তায়।
হিংসা ফণি ঘেরে যেন মাণিক নিকর-রে॥
ফুটিছে যেখানে ফুল তথা ছুটে অলিকুল।
মাধুর্য্যে শঠত্ত্বে বুঝি প্রেমের মিলন-রে॥
প্রকৃতির চারুহাসি সরগ সৌন্দর্য্য রাশি।
মাধুর্য্য-মহিমা মাখা রমণী রতন-রে
প্রীতি প্রেম নির্ঝরিণী করুণা আদর্শ রাণী
সঙসার মরু'পরে স্নিগধ কানন-রে
কি গুণে আবার হায় প্রকৃতি উলটি যায়
উষার কিরণ কেন মধ্যাহ্নে প্রখর-রে॥
যে হৃদে বহে মমতা সেই হৃদে কোপনতা
দ্বেষ হিংসা কুটিলতা স্বার্থের আকর-রে
দেব অর্চ্চিত প্রসূনে নরক বিকার-রে॥

শ্রীদঃ

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিসপ ওয়েল্ডন সাহেবের ভাবের প্রকৃত স্থান কোথায় তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত লর্ড হাউসের পূর্ব্বোক্ত বিচারটি আদ্যোপান্ত উদ্ধার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় সভ্যদেশ আধুনিক সভ্যতার ধবলগিরি। অত উচ্চে উঠিয়াও ইংলণ্ডের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ আজি বিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষে ভগবানের প্রত্যাদেশ মানেন না ইহা স্থিরচিত্তে ভাবিবার কথা বটে। অথচ মনে রাখিতে হইবে, বাইবেল ইংরেজের ধর্ম্ম পুস্তক—তথা অনেক আদেশ প্রত্যাদেশ মিরাকেলের কথা, অবতারের কথা, ভগবানের কথা আছে। যে ভগবান মানে সে ভগবানের কথা, আদেশ, প্রত্যাদেশ, মানে না বলিলে কি বুঝা যায়? ভগবানের বিড়ম্বনা ও নাস্তিকতার রাজত্ব। পরমহংস দেব বলিতেন তর্ক করিও না। যাক্।

পরমহংস দেবের নাম মনে পড়াতে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িয়া গেল। যে মোক্ষমূলর বেদকে গালি দিয়াছেন তাঁহারই কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। মোক্ষমূলর সম্প্রতি একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার নাম "রামকৃষ্ণ—তাঁহার জীবনী ও বচনাবলী" (লংমান্‌স্ কোং লণ্ডন)। এই পুস্তক লিখিতে গিয়া মোক্ষমূলর বড় বিপদে পড়িয়াছেন, হিন্দুয়ানী বিশ্বাস করিবেন কি না, যোগ কুম্ভক সমাধি, ভগবদ্দর্শন এ সব বিশ্বাস করিবেন কি না, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তাঁর নিজের কথা তিনিই নিজে বলুন। য়ুরোপের সাধারণ অবিশ্বাসের কথা বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—

No doubt it is difficult to believe all the sayings which the ancient Yogis are credited with, and the achievements of modern Yogis also are often very startling. I confess I find it equally difficult to believe or not to believe them. We are told by eye-witnesses and trustworthy witnesses that these Yogis go without food for weeks and months, that they can sit

আলো ও ছায়া।

জগত জড়ায়ে বুঝি এই হেন রিতি-রে।
একাধারে দুই রাগ তাই হেরি নিতি-রে॥
বিমল নিরমলতা কভু নাহি মিলে হেতা।
ছায়া শূন্য নাহি হেরি একটীও ভাতি-রে॥
ঘৃণেয় মলিন মাঝে শুভ থাকে কত সাজে।
করুণার অশ্রুকণা উহার ও সাথি-রে॥
সৌরভে কুসুম ভরা কুসুম কীটেও পোরা।
মহত্ত্বে ক্ষুদ্রত্ত্বে ভেদ কত সুক্ষ্মতর-রে॥
গোলাপ ফুটেছে যায় কাঁটা সারি বেড়ে তায়।
হিংসা ফণি ঘেরে যেন মাণিক নিকর-রে॥
ফুটিছে যেখানে ফুল তথা ছুটে অলিকুল।
মাধুর্য্যে শঠত্ত্বে বুঝি প্রেমের মিলন-রে॥
প্রকৃতির চারুহাসি সরগ সৌন্দর্য্য রাশি।
মাধুর্য্য-মহিমা মাখা রমণী রতন-রে
প্রীতি প্রেম নির্ঝরিণী করুণা আদর্শ রাণী
সঙসার মরু'পরে স্নিগধ কানন-রে
কি গুণে আবার হায় প্রকৃতি উলটি যায়
উষার কিরণ কেন মধ্যাহ্নে প্রখর-রে॥
যে হৃদে বহে মমতা সেই হৃদে কোপনতা
দ্বেষ হিংসা কুটিলতা স্বার্থের আকর-রে
দেব অর্চ্চিত প্রসূনে নরক বিকার-রে॥

শ্রীদঃ

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিসপ ওয়েল্ডন সাহেবের ভাবের প্রকৃত স্থান কোথায় তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত লর্ড হাউসের পূর্ব্বোক্ত বিচারটি আদ্যোপান্ত উদ্ধার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় সভ্যদেশ আধুনিক সভ্যতার ধবলগিরি। অত উচ্চে উঠিয়াও ইংলণ্ডের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ আজি বিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষে ভগবানের প্রত্যাদেশ মানেন না ইহা স্থিরচিত্তে ভাবিবার কথা বটে। অথচ মনে রাখিতে হইবে, বাইবেল ইংরেজের ধর্ম্ম পুস্তক—তথা অনেক আদেশ প্রত্যাদেশ মিরাকেলের কথা, অবতারের কথা, ভগবানের কথা আছে। যে ভগবান মানে সে ভগবানের কথা, আদেশ, প্রত্যাদেশ, মানে না বলিলে কি বুঝা যায়? ভগবানের বিড়ম্বনা ও নাস্তিকতার রাজত্ব। পরমহংস দেব বলিতেন তর্ক করিও না। যাক্।

পরমহংস দেবের নাম মনে পড়াতে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িয়া গেল। যে মোক্ষমূলর বেদকে গালি দিয়াছেন তাঁহারই কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। মোক্ষমূলর সম্প্রতি একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার নাম "রামকৃষ্ণ—তাঁহার জীবনী ও বচনাবলী" (লংমান্‌স্ কোং লণ্ডন)। এই পুস্তক লিখিতে গিয়া মোক্ষমূলর বড় বিপদে পড়িয়াছেন, হিন্দুয়ানী বিশ্বাস করিবেন কি না, যোগ কুম্ভক সমাধি, ভগবদ্দর্শন এ সব বিশ্বাস করিবেন কি না, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তাঁর নিজের কথা তিনিই নিজে বলুন। য়ুরোপের সাধারণ অবিশ্বাসের কথা বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—

No doubt it is difficult to believe all the sayings which the ancient Yogis are credited with, and the achievements of modern Yogis also are often very startling. I confess I find it equally difficult to believe or not to believe them. We are told by eye-witnesses and trustworthy witnesses that these Yogis go without food for weeks and months, that they can sit

unmoved for any length of time, that they feel no pain, that they can mesmerise with their eyes and read people's thoughts. All this I can believe; but if the same authorities tell us that Yogis can see form of gods and goddesses moving in the Sky, or that ideal god appears before them; that they hear voices from the Sky, perceiving a divine fragrance, and lastly they have been seen to sit in the air without any support, I must claim the privilege of S. Thomas a little longer, though I am bound to say the evidence that has come to me in support of the last achievement is most startling. * * A better knowledge seems desirable. —Whether for the statesman who have to deal with the various classes of Indian Society, or for the missionaries who are anxious to understand and to influence the inhabitants of that country, or lastly for the students of philosophy and religion who ought to know how the most ancient philosophy of the world, the Vedanta, is taught at the present day by the Bhaktas, that is, the friends and devoted lovers of God.

অর্থাৎ প্রাচীন যোগীরা যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন (বা যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন) সেই সকল কথা বিশ্বাস করা নিঃসন্দেহ কঠিন। এ কালের যোগীগণের কৃত কার্য্যাবলীতেও প্রায়ই চমৎকৃত হইতে হয়। আমি স্বীকার করি আমার পক্ষে এই সকল কার্য্য বিশ্বাস করা যেরূপ কঠিন, বিশ্বাস না করাও সেইরূপ কঠিন। প্রত্যক্ষকারী এবং বিশ্বাসী সাক্ষীর মুখে শুনিয়াছি, যে এই যোগীরা বহু সপ্তাহ এবং বহু মাস অনাহারে থাকেন, এক মনে নিস্পন্দ-ভাবে যতকাল ইচ্ছা ততদিন উপবেশন করিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহাদের যন্ত্রণার কোন অনুভূতি নাই, দৃষ্টি মাত্র বশীকরণ করিতে পারেন এবং অপরের মনের কথা বুঝিতে পারেন। এই সমস্ত আমি বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু ঐ সকল সাক্ষীরাই যদি বলেন যে, যোগীরা দেবদেবীর আকৃতি আকাশে বিচরণ করিতে দেখিতে পান, আকাশবাণী শ্রবণ করেন, দিব্য গন্ধ ঘ্রাণ

করেন, আধার ব্যতিরেকে শূন্যমার্গে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিয়া থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে আমি নিতান্তই আরো কিছু দিন সেণ্টটমাসের অধিকারে দাবী করিব। করিলেও, আমি ইহা বলিতে বাধ্য, শেষোক্ত কৃতকার্য্যটির সাপক্ষে আমি যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক। * * ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সমাজের সহিত যাঁহাদের ব্যবহার সেই রাজ পুরুষগণের পক্ষেই হোক আর সেই দেশের অধিবাসীগণকে বুঝিবার ও ভুলাইবার জন্য চিন্তিত যে মিশনরীগণ (খৃষ্টধর্ম্ম যাজনকারী) তাঁহাদের পক্ষেই হোক, আর, আজিকার দিনে ভূমণ্ডলের প্রাচীনতম দর্শনশাস্ত্র বেদান্তের 'ভক্ত'গণ কি করিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, এ কথা অবশ্য জ্ঞাতব্য যাঁহার পক্ষে সেই দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিদ্যার্থীগণের পক্ষেই হোক—এ বিষয়ের আরও ভালরূপ জ্ঞান বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

পাঠক মহাশয়, মোক্ষমূলরের বেদস্পর্শটা একেবারে বিফল হয় নাই। আর্য্যোচিত সূক্ষ্ম-বিশ্বাস শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার মন অধিকার করিতেছে। ভাল, তিনি ধৈর্য্যই অবলম্বন করুন। সব মিলিবে। পাঠক মহাশয় এই মোক্ষমূলর সমাধি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা আর এক স্থলে সঙ্কলন করিব। এখন এই পর্য্যন্ত।

প্রসঙ্গক্রমে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। মোক্ষমূলর শৌনকের অনুক্রমনী অনুসারে ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাক ও মন্ত্রের একটা হিসাব দিয়াছেন। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডল আছে। প্রথম মণ্ডলে ২৪টি অনুবাকে ১৯১টি মন্ত্র বা স্তোত্র আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলে, ৪ অনুবাক, ৪৩টি স্তোত্র। তৃতীয় মণ্ডলে, ৫ অনুবাক, ৬২টি মন্ত্র। ৪-অ৫-ম৮। ৫-৬-৮৭। ৬-৬-৭৫। ৭-৬-১০৪। ৮-১০-৯২ (আরও ১১টি বালখিল্য)। ৯-৭-১১৪। ১০-১২-১৯১। মোট ১০ মণ্ডলে, ৮৫টি অনুবাক, ১০১৭ স্তোত্র। বালখিল্য ১১টি যোগ দিলে মোট স্তোত্র সংখ্যা ১০২৮টি। বাস্কল শাখায় আরও ৮টী স্তোত্র আছে। তাহা হইলে ১০১৭+৮=১০২৫ হইতেছে।

ঋগ্বেদ সংহিতা কোন কোন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন হইবে না। ডাক্তার হগ সাহেবের মতানুসারে ঋগ্বেদ সংহিতার রচনার সময় পূঃ খৃ ২৪০০। লাটিন—ফ্রেডরিক রোজেন। সমুদয় নহে। প্রথম অষ্টক।

ইংরেজী—মূল ও সায়নের টীকা, মোক্ষমূলর। (১৮৪৯-৭৪)। গ্রিফিথ সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদ। দুই বালম-চৌদ্দ টীকা। ষ্টিভেনসন্ রোয়ার, উইলসন্, কাউয়েল, ইহারা কেহই শেষ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা।—প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অনুবাদ আরম্ভ হয়। শেষ হয় নাই। পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। শেষ হয় নাই—সরস্বতীর মৃত্যু হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদ সংহিতা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইনিও প্রধানত সায়নের টীকার উপর নির্ভর করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রীয়।—ঋগ্বেদের অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

ফরাশিশ।—লাংলোয়া সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ফরাশিশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। মোক্ষমূলরের গুরু বুর্ণফ্ ফরাশিশ ছিলেন; তিনিও ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন।

জর্ম্মান।—বেনফে কতকটা জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করেন; শেষ হয় নাই। লডউইগ জার্ম্মান ভাষায় সমুদয় ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ করিয়াছেন। মোক্ষমূলরের ঋগ্বেদ সংহিতার সম্পাদন শেষ হইবার কিছু দিন পরে এই অনুবাদ প্রকাশ হয়। পণ্ডিত গ্রাসমান্ ও জার্ম্মান ভাষায় সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে অহিন্দুজনোচিত টীকা সন্নিবিষ্ট করায় তাঁহার অনুবাদের গৌরবের লাঘব হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদ হইতে পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ কল্পে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের অনুবাদ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

প্রথম সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

২। অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন, তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। অগ্নি দ্বারা (যজমান) ধন লাভ করেন, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, ও তদ্দ্বারা অনেক বীর পুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

৪। হে অগ্নি তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক সে যজ্ঞ কেহ হিংসা করিতে পারে না, এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহই দেবগণের নিকটে গমন করে।

৫। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্ম্মা, সত্যপরায়ণ ও প্রভূত ও বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত; সেইদেব দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৬। হে অগ্নি তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধনা করিবে, হে অঙ্গিরা, সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই।

৭। হে অগ্নি আমরা দিনে দিনে দিবারাত্র মনের সহিত নমস্কার সম্পাদন করতঃ তোমার সমীপে আসিতেছি।

৮। তুমি দীপ্যমান্, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের অতিশয় দীপ্তিকারক এবং যজ্ঞশালায় বর্দ্ধনশীল।

৯। পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ হও; মঙ্গলার্থ আমাদিগের নিকটে বাস কর। ইহার ইংরাজী অনুবাদ দেখুন।

1. I lawd Agni, the great high priest, god minister of Sacrifice.

The herald, lavishest of wealth.

2. Worthy is Agni to be praised by living as by ancient Seers.

He shall bring hitherward the gods.

3. Through Agni man obtaineth wealth yea plenty waxing day by day.

Most rich in heroes, glorious.

4. Agni, the flawless Sacrifice, which thou encompassest about

Verily goeth to the Gods.

5. May Agni, Sapient-minded priest, truthful, most gloriously great..,

The God, come hither with the Gods.

6. Whatever blessing, Agni, thou wilt grant unto thy worshipper,

That, Angiras, is thy true gift.

7. To thee, dispeller of the night, O Agni day by day with prayer,

Bringing thee reverence, we come;

8. Ruler of sacrifices, guard of Law eternal, radiant one,

Increasing in thine own abode.

9. Be to us easy of approach, even as a father to his son:

Agni be with us for our weal.

পাঠক মহাশয় এখন কেবল ব্যাপারটা দেখিয়া চলুন। আমার বক্তব্য পরে।

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের নাম শতর্চিন। এই মণ্ডলের ঋষি মধুছন্দাবিশ্বামিত্র। প্রথম মণ্ডলে ৪৪টি মন্ত্র ইন্দ্রের উদ্দেশে, ৪৩টি অগ্নির, ১৫টি অশ্বিন, ১১টি মরুৎ, ৯টি বিশ্বদেবা, ৪টি উষা, ৪টি ঋভু, ৩টি স্বর্গ ও মেদিনী। অপরাপর দেবেরও আছে।

দ্বিতীয় মণ্ডল। এই মণ্ডলের ঋষি গৃৎসমদ। (অমুক মণ্ডলের অমুক ঋষি, ইহার গূঢ় অর্থ আছে)। ১৪টি ইন্দ্রের, ৯টি অগ্নির ইত্যাদি।

তৃতীয় মণ্ডল। এই মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র। এই মণ্ডলে গায়ত্রী আছে। ২২টি ইন্দ্রের, ২১টি অগ্নির ইত্যাদি।

চতুর্থ মণ্ডল। গোতম পুত্র বামদেব ঋষি। ১২টি ইন্দ্রের, ১১টি অগ্নির ইত্যাদি।

পঞ্চম মণ্ডল। অগ্নির ২১, মিত্রবরুণ ১১, ইন্দ্র ৯, মরুৎ ৯, বিশ্বদেব ৯, অশ্বিন ৬। ৪০ সংখ্যকা সূক্তে—সূর্য্য গ্রহণ।

ষষ্ঠ মণ্ডল। ভারদ্বাজ ঋষি। ইন্দ্র ২১, অগ্নি ১৩, পুষণ ৫, বিশ্বদেব ৪ ইত্যাদি।

সপ্তম মণ্ডল। বশিষ্ঠ ঋষি। ইন্দ্র ১৪, অগ্নি ১৩, অশ্বিন ৮, উষা ৭, বিশ্বদেব ৭, বরুণ ৪। ছন্দ ত্রিষ্টুব। এই মণ্ডলেই ভেকের উপর একটি মন্ত্র আছে।

পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধার করিয়া দিলাম!

HYMN 103. *Frogs.*

1. They who lay quiet for a year, the Brahmans who fulfill their rows,

The frogs have lifted up their voice, the voice Parjanya hath inspired.

2. What time on these, as on a dry skin lying in the pool's bed, the floods of heaven descended,

The music of the frogs comes forth in concert like the cows, lowing with their calves beside them.

3. When at the coming of the Rains the water has poured upon them as they yearned and thirsted,

One seeks another as he talks and greets him with cries of pleasure as son his father.

4. Each of these twain receives the other kindly, while they are revelling in the flow of waters,

When the frog moistened by the rain springs forward, and Green and Spotty both combine their voices.

5. When one of these repeats the other's language, as he who learns the lesson of the teacher,

Year every limb seems to be growing larger as ye converse with eloquence on the waters.

6. One as Cow-bellow and Goat-bleat the other, one frog is Green and one of them is Spotty.

They bear one common name, and yet they vary, and, talking modulate the voice diversely.

7. As Brahmans, sitting round the brimful vessel, talk at the Soma-rite of Atiratra,

So, frogs, ye gather round the pool to honour this day of all the year, the first of Rain-time.

8. These Brahmans with the Soma-juice, performing their year-long rite, have lifted up their voices;

And these Adhvaryus, sweating with their

kettles, come forth and show themselves, and none are hidden.

9. They keep the twelve month's god-appointed order, and never do the men neglect the season.

Soon as the Rain-time in the year returneth, these who were heated kettles gain their freedom.

10. Cow-bellow and Goat-bleat have granted riches, and Green and Spotty have vouchsafed us treasure.

The frogs who give us cows in hundreds lengthen our lives in this most fertilising season.

এই সূক্তের বাঙ্গালা অনুবাদ ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাঙ্গালা ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

৭ মণ্ডল। ১০৩ সূক্ত

মণ্ডুক দেবতা। বশিষ্ঠ ঋষি।

বৃষ্টিকাম ব্যক্তি এই সূক্ত জপ করেন। নিরুক্তকার বলেন যে বশিষ্ঠ বৃষ্টিকাম হইয়া পর্জ্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডুক সকল তাঁহার অনুমোদন করে। তজ্জন্য তিনি মণ্ডুকগণকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

১। সম্বৎসর ব্রতচারী স্তোতাদিগের ন্যায়(১) (সম্বৎসর) শয়ান থাকিয়া মণ্ডুকগণ পর্জ্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

২। শুষ্ক চর্ম্মের ন্যায়, সরোবরে শয়ান মণ্ডুকগণের নিকট স্বর্গীয়জল যখন আগমন করে, তখন বৎস-যুক্ত ধেনুর শব্দের ন্যায়(২) মণ্ডূকগণের শব্দ সঙ্গত হয়।

৩। বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জ্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত্ত মণ্ডূকগণকে জল দ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেন অখ্খল শব্দ করতঃ পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এক মণ্ডূক অন্যের নিকট গমন করে।

(১)"মূলে ব্রাহ্মণাঃ" আছে। অর্থ "ব্রহ্ম" বা স্তোত্র উচ্চারণকারী। তাহাদিগের স্তোত্র উচ্চারণের সহিত ভেকদিগের রবের তুলনা হইতেছে।

(২)বৎস পাইলে ধেনুগণ যে রব করে, বৃষ্টি আগমনে ভেকদিগের রব তাহার সহিত তুলনা করা হইতেছে। ইহার পরের ঋক গুলিতেও ভেকদিগের শব্দ সম্বন্ধে অন্যান্য উপমা আছে।

৪। জল পড়িলে পর যখন মণ্ডূকগণ হৃষ্ট হয়, যখন পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া অত্যন্ত লম্ফ প্রদান করত ধূম্র বর্ণ মণ্ডূক হরিৎবর্ণ মণ্ডূকের সহিত একত্রে শব্দ করে, তখন এক মণ্ডূক অন্যকে অনুগ্রহ করে।

৫। শিষ্য গুরুর ন্যায় যখন এই মণ্ডূক সকলের মধ্যে একটি অন্যের বাক্য অনুকরণ করে, যখন হে মণ্ডূকগণ! তোমরা সুন্দর শব্দ বিশিষ্ট হইয়া জলের উপর লম্ফপ্রদান করতঃ শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্ব্বযুক্ত শরীর সমৃদ্ধ হয়।

৬। ইহাদের একের শব্দ গোরুর ন্যায়, অপরের শব্দ ছাগলের ন্যায় একটি ধূম্র বর্ণ, অপরটি হরিদ্বর্ণ। সকলেরই এক নাম অথচ রূপ বিবিধ প্রকার, ইহারা নানা দেশে শব্দ করতঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

৭। হে মণ্ডূকগণ, অতিরাত্র নামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায়(৩) সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ (সরোবরের) চতুর্দ্দিকে শব্দ করতঃ যে দিন প্রাবৃট্ সঞ্চার হইল, সেই দিন চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি কর।

৮। সোমযুক্ত সাম্বৎসরিক স্তুতিকারী স্তোতাগণের ন্যায়(৩) এই (মণ্ডূকগণ) শব্দ করিতেছে; পবর্গচারী অধ্বর্য্যুগণের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, লুকায়িত কোন কোন মণ্ডূক সম্প্রতি বৃষ্টিতে আবির্ভূত হইতেছে।

৯। নেতা মণ্ডূকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহারা দ্বাদশ (মাসের) ঋতুগণকে হিংসা করে না। সম্বৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, গ্রীষ্মস্থ তাপ পীড়িত মণ্ডূকগণ গর্ত্ত হইতে বিমুক্তি লাভ করে।

১০। ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মন্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, অজবৎ শব্দবিশিষ্ট মন্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, ধূম্র বর্ণ মন্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক। সহস্র (ওষধি) প্রসবকারী (বর্ষা ঋতুতে) মণ্ডূকগণ অপরিমিত গো প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধিত করুক।

টীকায় দত্ত মহাশয়ের খোঁচা দেখিলেন। প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের অনুবাদে তাঁর টীকা দিতে নাই। এখানে ব্যাপারটা দেখিতেছেন। একটু

(৩)ব্রাহ্মণ শব্দ অর্থে স্তোতা, ব্রাহ্মণজাতি নহে। তাহা এই ঋকে স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতেছে। মূলে * * আছে অর্থ "স্তুতিকারী স্তোতাগণ"। ব্রাহ্মণ নামে একটি ভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নাই।

সুযোগ পাইয়াছেন আর বলিতেছেন "ব্রাহ্মণ নামে একটি ভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নাই"। কে বলিল? প্রমাণ কি? দুই দিন আগে ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি হইলেই বা কার ক্ষতি হইত! সে যাহা হৌক এইরূপ দুই একটি সূক্ত অবলম্বন করিয়াই য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের উপর অযথা গালি বর্ষণ করেন। মোক্ষমূলর বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছেন, ভেকের স্তোত্রটা আর কিছুই নহে, ওটা কেবল পুরোহিতের উপর শ্লেষ। বস্তুতঃ তাহা নয়। গূঢ় কথা আছে। ভেক হটযোগী। এখন এই পর্য্যন্ত।

ঋগ্বেদ অষ্টম মণ্ডল।—এই মণ্ডলের ৯২টি সূক্ত ইহা ব্যতীত আরও ১১টি সূক্ত আছে, তাহাদের নাম বালখিল্য। এই মণ্ডলের অনেকগুলি ঋষি। সূক্তগুলির মধ্যে ইন্দ্রের ৩৬, অগ্নি ১১, বিশ্বদেব ৫, মরুৎ ৩ ইত্যাদি।

নবম মণ্ডল।—১১৪টি সূক্ত। অধিকাংশই পবমান সোমদেবের স্তুতি। ১১৩ সংখ্যক সূক্তে পরকালে স্বর্গসুখের বর্ণনা।

দশম মণ্ডল।—এই মণ্ডলের সূক্তের সংখ্যা ১৯১টি। ইন্দ্র ৩৪, অগ্নি ২৫, বিশ্বদেব ২২। কোন কোন দেবতা এই মণ্ডলের ঋষি স্থানীয়। ১০ সংখ্যা যম ও সমীর কথোপকথন। ১৪ যম ও প্রজ্জ্বলিত চিতাশায়ী পুরুষের উদ্দেশে। ১৪।৯ শ্মশানভূমি হইতে ভূতাপসারণ মন্ত্র। ১৫ পিতৃগণ ও শ্রাদ্ধ। ১৮ মৃত্যু ও যম স্বতন্ত্র। এই সূক্তেই সতীদাহ সূচিত হইয়াছে। ৭২ শক্তি, দেবগণের উৎপত্তি ও বিশ্বসৃষ্টি। ৮১ বিশ্বকর্ম্মা। ৯০ পুরুষসূক্ত। পরম পুরুষ ও শক্তির কথা। সৃষ্টি। এই সূক্তে জাতিভেদ সূচিত হইয়াছে। ১২১-ক বা হিরণ্যগর্ভ। ১২৯ সৃষ্টি। ১৬৩-যক্ষ্মা-নাশ-মন্ত্র।

পাঠক মহাশয়কে মাত্র ঋগ্বেদের সংহিতা ভাগের অতি স্থূল আভাস দিলাম। গুহ্য কথা উহ্য রহিল। অপরাপর বেদের সংহিতা ভাগের আভাস ও দিতে পারিলাম না। স্থান ও সময়—উভয়েরই অভাব। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা ভাগটা কিছুই নহে—কেবল স্বভাব দর্শনে অভিভূত প্রাকৃত জনের হৃদয়োচ্ছ্বাস। কিন্তু ইঁহাদেরও মতে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগটার গৌরব আছে। তাই বেদের ব্রাহ্মণভাগের একটু বিশেষ বিবরণ দিতে অগ্রসর হইতেছি। ভরসা করি জগদম্বা সফল করিবেন।

সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ সংহিতার মূল মুদ্রিত হইয়াছে—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গ্রিফিথ্ সাহেব সামবেদ সংহিতা ইংরেজীতে অনুবাদ

করিয়াছেন, মূল্য কাগজ ৩।০ টাকা, বাঁধাই ৪৲ টাকা। তাঁর অথর্ব্ববেদ সংহিতার ইংরেজী অনুবাদ দুই খণ্ডে প্রত্যেকের মূল্য কাগজ ৫।০ টাকা, বাঁধাই ৬৲ টাকা। উভয় পুস্তকই কাশীর লেঙ্গারস্ কোম্পানির নিকট প্রাপ্তব্য। বঙ্গভাষায়ও যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের অনুবাদ হইতেছে।

ক্রমশঃ।

মার্শাল নীল।

মাখমে গঠিত অঙ্গ অতি সুকোমল,
অতি মৃদু বাসে ভরা রসে ঢল ঢল;
শিশিরে বদনখানি, ভিজায়েছে ফুলরাণী
(তাই) লাজে অবনত। নহ গোলাপ কমল
ঊর্দ্ধ-মুখ ঊর্দ্ধ-বুক ব্যাপ্ত-পরিমল। ১।
ঘনছায় ভরা অতি নিবীড় কানন,
অথবা আমার সেই ঋষি-তপোবন।*
বিহঙ্গ ললিত স্বরে, মধুর সঙ্গীত করে,
ঝর ঝর নদী বহে, নীলিম গগণ
তোমার মতন সেই ঋষি-তপোবন। ২।
তুমি বিরহিণি! কেন রাজার বাগানে?
উল্লাস কল্লোল-ভরা, সাজে কি এখানে?
মুখরা চপলা যত, বিলাসিনী শত শত
কেহ হাঁসে কেহ গায় মদভরা প্রাণে।
(ঐ দেখ) গোলাপ মল্লিকা হাঁসে চেয়ে তোর পানে। ৩।
ঋষির বাঞ্ছিত পূত শান্ত স্নিগ্ধ ফুল
বিষাদ মাখান মুখ অমিয় অতুল।
বিষাদ সংযত যার, অবনত হৃদিভার
সে বুঝিবে মর্ম্মগাথা, তুই যে কি ফুল।
রাজার বাগানে তুই এ বিষম ভুল! ৪।

শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী।

*The Retreat, Modhupore.

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত, পৌষ ও মাঘ।' কিন্তু পুরা নহে। সম্পাদক "নিবেদনে" বলিতেছেন "পৌষ ও মাঘ সংখ্যা নব্যভারত একত্রে প্রকাশ হইল। মাঘ মাসের বাকী তিন ফর্ম্মা ফাল্গুণ সংখ্যায় সংলগ্ন হইবে।" হৌক্ ক্ষতি কি? নব্যভারত এইরূপে সময় ধরিয়াছেন। ভরসা করি আর পশ্চাৎপদ হইবেন না। "একাদশীর দিনে জন্মাষ্টমী" (৺ঈশ্বর গুপ্ত) ভাল নহে।

এবার নব্যভারতে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে "বিদায়গাথা" "দিগ্বিজয়ী বীর" "স্মৃতি"(পদ্য)। "বিদায় গাথা" স্ত্রীলোকের লেখা, লেখিকা "কনকাঞ্জলী রচয়ত্রী" তাই যত্ন করিয়া পাঠ করিলাম কিন্তু কথাটা বুঝিলাম না। যদি দুঃখের কথাই তুলিলেন, তবে কি দুঃখ, কেন দুঃখ, বলিলেন না কেন? উচ্চ শ্রেণীর কবিতায় ইঙ্গিতেও চলে—কিন্তু তাও ধরিতে পারিলাম না। আর কি তিনি কবিতা লিখিবেন না? রাজরাজেশ্বরীর তপস্যায় কাল-যাপন করিবেন? কবিতা হয় নাই, পদ্য হইয়াছে। "দিগ্বিজয়ী বীর" অত্যন্ত অস্পষ্ট। কবিতা অস্পষ্ট হইলেই কবি শেলি হন না। কাঁচামিঠা আম পাকায় খাওয়া চলে না। "স্মৃতির স্মৃতি অতীব কঠোরা, তাই বৃন্দাবনী বৈষ্ণবী উপমায় প্রকাশমানা—

অতীত-শ্রীকৃষ্ণ-রূপ, কাল-বংশী করে,
ঘটনা-ভৃগুর পদচিহ্ন বক্ষে আঁকা,
বিষয়-সঙ্গীত-সুধা পক্ক বিম্বাধরে,
মহাকাল গোবর্দ্ধন-ভারে অঙ্গ বাঁকা।

ক্বচিৎ তান্ত্রিকী—

ঘটনার প্রতিবিম্ব, কাল-ইতিবৃত্ত,
বিষয়-বিভ্রম-হ্রদে কুল-কুণ্ডলিনী,
অতীত সংক্ষিপ্ত-সার, জীবন-সাহিত্য,
বিশৃঙ্খলা মাঝে ফুল্ল শৃঙ্খলা-ললিনী।

ক্বচিৎ বেদ-বিলাসিনী—

ঐন্দ্রিয়িক কর্ম্মফল ভোগ বিলাসিনী,
যতন-সঞ্চিত জ্ঞান-কোষের অধ্যক্ষ
বিষয়-বিবৃতি, অনুশোচনা রূপিনী,
ঘটনাঘটন-ঘট, অতীতের সাক্ষ্য।

স্মৃতি শব্দটি আবার তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত। আমরা নাচার। "রাজনীতি ও রমেশচন্দ্র"। রমেশচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন, সেই কথা বলিয়া লেখক শেষে বলিয়াছেন, "কংগ্রেস দ্বারা দেশের অন্তত রাজনৈতিক শিক্ষা কিছু হইবে, লোকে প্রথমে এইরূপ আশা করিয়াছিল; কিন্তু এখন সে আশা ক্রমে নৈরাশ্যেই পরিণত হইতেছে।" মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কটাক্ষও আছে। "স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধ" 'ক্রমশঃ' চলিতেছে। "উদয়ন আচার্য্য" দ্বিতীয় প্রস্তাব। বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার উপর জটিলতা। 'ব্রহ্ম ও জগৎ", (১১), তাহার উপর ক্রমশঃ, সুতরাং কিছু বলা চলে না। "খোকার বিলাতের পত্র" অনেক বিলাতী খবর আছে। "শ্রীমদ্-ভগবদ্ গীতা ও সমন্বয় ভাষ্য" পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষে দেবেন্দ্রবিজয় বাবু অনেক ভাল ও প্রকৃত কথা বলিয়াছেন। "ব্রাহ্ম সমাজের দারিদ্র্য সমস্যা" সম্পাদকের লেখা। "আমরা সরল চিত্তে লিখিতেছি, ব্রাহ্ম সমাজ ধন-বৈষম্য দূর করিতে একেবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।"—এটা কি জাতিভেদ নয়? "দেশের বৈষম্য পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া আমরা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় লইয়াছিলাম" বলিয়া প্রথমেই "জাতি মাহাত্ম্য" উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় যে সমাজে জাতিভেদ নাই সে সমাজে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাই হইবে। য়ুরোপে ভারতের ন্যায় জাতিভেদ না থাকায় আজ খৃষ্টান য়ুরোপে এনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট, কমুনিষ্টদল রক্তলোলুপ নিশাচরের ন্যায় দলে দলে ভ্রমণ করিতেছে আর সমস্ত য়ুরোপ স্তব্ধ চকিত ও ভীত হইয়া রহিয়াছে। য়ুরোপে যে জাতি ভেদ আছে সে কেবল ধনের জাতিভেদ। বিলাতী আদর্শে গঠিত সমাজকেও য়ুরোপের পাপে ভুগিতে হইবে—তাই আজ সম্পাদকের এ ক্রন্দনে আশ্চর্য্য হইলাম না। 'প্রজানীতি' প্রবন্ধে পূর্ণিমায় এ কথা খুলিয়া বলা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় রোগ চিনিয়াছেন কিন্তু ঔষধ চেনেন নাই। ঔষধ—আজিকার সভ্যতার প্রথম সমস্যা। যাহাহৌক লেখকের সরলতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, ভরসা করি সমাজের প্রত্যেক লোকের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে। কথা অতি গুরুতর ও আশু প্রতিকার অবশ্য কর্ত্তব্য। "শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা" পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "মহাত্মা গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ" লেখকের দোষে রস জমে নাই।

সাহিত্য, মাঘ। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যালের একটি ছবি আছে।

"স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল" প্রথম প্রবন্ধ। "ভানুমতী" উপন্যাস চলিতেছে। "মৌর্য্যসম্রাট অশোক" তৃতীয় প্রস্তাব। "যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয়" শেষ হইয়াছে। লেখকের মতে পৃঃ খৃঃ ২৪৪৮ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। লেখকের মতে গ্রীকবিজয় সম্বন্ধে যে বর্ত্তমান মত প্রচলিত আছে তাহা ভ্রম-সঙ্কুল। "সহযোগী সাহিত্য" প্রস্তাবে আছে, আসামের অতি-ঐতিহাসিক জাতির বিবরণ ও অধ্যাপক বুলারের জীবন-চরিত। "হারাধনের বট" একটি ক্ষুদ্র গল্প। স্যামুয়েল ক্লিমেন্স একজন বিখ্যাত আমেরিকান পরিহাস রসিক। তিনি মার্কটোয়েন নামধারী হইয়া পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি দেনার দায়ে বিব্রত হইয়া ঋণ পরিশোধ কল্পে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন More Tramps Abroad নামে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের অনেক কথা আছে। লেখক তাহারই আংশিক বিবরণ দিয়াছেন। ভারতবাসীর প্রতি লেখকের সহানুভূতি আছে। গান শুনিয়া যাহাদের কান ঝালাপালা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে একটু শ্রুতি-সুখকর বটে। লেখক একটা বড় কথা বলিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের মৃত্যু হইবে না—মিশনরীদের কথা বিশ্বাস করিও না।

সাহিত্য, ফাল্গুণ। "ভানুমতী" চলিতেছে। "কর্ম্ম" কর্ম্মফলের কথা। নূতন ধরণে। চন্দ্রের নাম কেন "ওষধিপতি" হইল? তাহার মীমাংসা। "তবেই মোটের উপর সূর্য্যতেজঃ লতাবৃদ্ধির অন্তরায়, রাত্রি লতাবৃদ্ধির সহায়"। সূর্য্যতেজ লতাবৃদ্ধির অন্তরায়—বৈজ্ঞানিক এ কথা স্বীকার করিবেন না। ইংরেজীতে যাহাকে "ক্লোরোফিল গ্রেণ" বলে, তাহার উপর সূর্য্যালোকের ক্রিয়ার বিচার আদৌ দেখিলাম না। লেখক একটা অনুমান করিয়াছেন—বিজ্ঞানের কথা বলিতে পারেন নাই আর শাস্ত্রের কথা বলিবার চেষ্টাও করেন নাই। "সমর্থরামদাস স্বামী" প্রবন্ধে তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার অভিনব প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেক নূতন সংবাদ আছে। "ভারতবর্ষে", মার্ক টোয়েন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আংশিক বিবরণ। একজন মিশনরী, ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার কেন হইল না তাহার কারণ মার্ক টোয়েনকে বলিয়াছেন। মোট কথা ভারতের হিন্দুর অলৌকিক ঘটনার নিকট বাইবেলের অলৌকিক ঘটনা ভাসিয়া যায়। হনুমানের কাছে স্যামসন লাগে না। "বন্যা" গল্প, কিপলিং হইতে ভাষান্-

রিত। অনুবাদে রসভঙ্গ হইয়াছে। "সহযোগী সাহিত্য" ব্রেটহার্টের বিবরণ ও যবদ্বীপে ভ্রমণ বৃত্তান্ত দিয়াছেন। "জননী"(কবিতা) বেশ। "মাধবী দেবী" লেখক বলিতেছেন যে শিখিমাইতীর ভগিনী "মাধবী" যে পদ রচনা করিয়া দিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "স্ত্রীকবি মাধবী" বলিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহার জবাব। আমরা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় জবাবের জবাবে কি বলেন শুনিতে ইচ্ছা করি। "কবিতাকুঞ্জে" অনেকগুলি সরস কবিতা আছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা। এই কয়টি বিষয় আছে। ১। বাঙ্গালার আদি রসায়ণ গ্রন্থ। ২। উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা। ৩। বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা। ৪। বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ। ৫। বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ। ৬। দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কাল নির্ণয়। ৭। কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয়। ৮। কার্য্য বিবরণ। ৯। মদনপালের তাম্রশাসনের প্রতিকৃতি।

আমাদের মত পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। বাঙ্গালির দোষ, উদ্যমভঙ্গ, না ঘটিলে পত্রিকা শীর্ষস্থান অধিকার করিবে বলিয়া মনে করি। কাগজ ভাল, ছাপা ভাল।

নির্ম্মাল্য, মাঘ। "বাঁশী" উল্লেখ যোগ্য একটি ক্ষুদ্র গল্প, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। লেখা বেশ। লেখকগণের বিশেষ যত্ন আছে বলিয়া বোধ হয়।

ঋষি, মাঘ। প্রথম প্রস্তাব "ভক্তি", বৈষ্ণবের মত। "কোমলে ক্লেশ" (ক্রিমি)। ক্রিমির পাঁচন—বিড়ঙ্গ তিন আনা, সোমরাজী আধ আনা, দাড়িমের শিকড়ের ছাল তিন আনা, চাঁপাফুল এক আনা, শুঁঠ এক আনা, সোণামুখী আধ আনা। জল এক পোয়া, শেষ এক ঝিনুক। ৪।৫ বারে খাওয়ান উচিৎ। একটু গরম করিয়া। প্রস্তুতের বার ঘণ্টা পরে আর ঐ পাঁচন খাইতে নাই। "রাজা ও প্রজা" উল্লেখ যোগ্য। গত আশ্বিন ও কার্ত্তিকের 'সৎসঙ্গ' সমালোচনায় আমরা যে 'দশ অবতার' তুলিয়াছিলাম, ঋষির সম্পাদক বলিতেছেন যে 'তাহা মৎকৃত ঋষি পত্রিকায় লিখিত। 'সৎসঙ্গ' উহা আমার নাম উল্লেখ ব্যতিরেকেই স্বপত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।' ঋষির "অহিফেন" প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। কোন্ কোন্ রোগে আফিমের ব্যবহার তাহা লিখিয়াছেন। ইংরেজী মতে আফিমে ঊনিষটি পদার্থ আছে, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ দেখিলাম না। অহিফেন কমিশনের সার কথাটা উদ্ধার করিয়া দিলে আরো ভাল হইত।

পূর্ণিমার নিয়মাবলী।

১। পূর্ণিমার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। এক সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা। সাধারণতঃ অগ্রিম মূল্য না পাইলে পূর্ণিমা পাঠান হয় না।

২। পূর্ণিমা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। যদি কেহ কোনও মাসে কাগজ না পান, পর মাসে ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে, তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। গ্রাহকগণ পত্রের উত্তর পাইবার ইচ্ছা করিলে টিকিট পাঠাইবেন; নতুবা উত্তর পাইবেন না। বেয়ারিং বা ইন্‌সফিস্যেণ্ট পত্র গ্রহণ করা হয় না।

৪। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ নামের নম্বর লিখিবেন। কাগজের মোড়কে যে নম্বর থাকে তাহাই গ্রাহক-নম্বর।

৫। পূর্ণিমায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি, সমালোচনার জন্য পুস্তক প্রভৃতি, বিনিময়ের সংবাদ পত্রাদি ও মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। নূতন লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন, কোনও রচনা মনোনীত না হইলে আমরা পাণ্ডুলিপি ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৭। প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

৮। বিলি করিবার অনিয়ম ঘটিলে বা পূর্ণিমা সংক্রান্ত অন্য কোনও বিষয়ে জানিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে লিখিতে হয়।

৯। পূর্ণিমায় বিজ্ঞাপন দিবার হার সাধারণতঃ কভারে প্রতি পৃষ্ঠা বার্ষিক ২০৲ কভার ভিন্ন অপর পৃষ্ঠা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিলে এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

☞বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষের বাঁধান "পূর্ণিমা" কয়েক খণ্ড মাত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মূল্য রাজ সংস্করণ = ২।০
" সুলভ সংস্করণ = ১৷৷০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

পূর্ণিমা কার্য্যালয়,
বাঁশবেড়িয়া।

পূর্ণিমা কার্য্যাধ্যক্ষ,
বাঁশবেড়িয়া

বা

তুমি।

তুমি বন ফুল, স্নিগ্ধ শান্ত সুকোমল,
শিশির সিঞ্চন বিনা শুষ্ক বায়ু তাপে।
ক্লান্ত অবসন্ন যেন বিষাদ মলিন—
কোরকে কেটেছে কীট পশিয়া হৃদয়ে। ১।

অধরে কোমল হাঁসি চাপে দাবানল,
ঢল ঢল আঁখি দুটী ভাসে জলে স্থলে,
তরঙ্গে কমল ভাসে হেলিয়া দুলিয়া
বায়ুভরে, দুঃখ তার কে বুঝিতে পারে? ২।

সাধ শুধু মুছাইব তব আঁখি-জল,
নিবাইব তুষানল মরম বেদনা,
দাস হয়ে সেবা দিব, ব্যথা দূরে যাবে,
আবার ফুটিবে ফুল আলোকি জগত। ৩।

হৃদি রাণি! শোভে তোর ধূলায় শয়ন?
উদাসিনীবেশ? কবে দেবতা প্রসাদ
অযতনে পড়ে থাকে? কোহিনুর কভু
শোভা পায় ফকীরের তৃণ আচ্ছাদনে? ৪।

বুকেতে রাখিব তোরে অতি সযতনে,
তপ্ত বালুকণা লাগি পশিবে চরণে
আমার উপরে যাক ঝড় বা করকা
সুখে থাক তুমি, সখি, বিহগ কুলায়ে। ৫।

শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী।

আর্য্য-সমাজে নারীজাতির অবস্থা।

আর্য্য সমাজের গৌরবের কথা চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছি। সত্যযুগের সুখশান্তি পবিত্রতার আদর্শ দ্বাপর ও ত্রেতায় যখন ক্রমে হীনতর হইয়া আসিয়া কলিযুগে চরমদশায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন, আর্য্যসমাজের প্রাচীন সভ্যতা যেন সেই প্রকারে ক্রমে হীনতর হইয়া আসিয়াছে বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। "আর্য্যামী" না করিলে দেশহিতৈষী বা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি দুচারিটী অপ্রিয় সত্য বলিতে আজ সাহস করিলাম।

আর্য্যসাহিত্য ও পুরাণে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সতীত্ব ও দাম্পত্যপ্রেম, অপত্যস্নেহ, আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র সাহিত্য ও পুরাণের মধ্যে ভাইভগিনীর ভালবাসার দৃষ্টান্ত একটীও খুঁজিয়া পাইলাম না। হইতে পারে আমার ক্ষুদ্র চক্ষে দেখা যায় নাই। কেহ একটী সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রে নারীজাতির অধিকার অতি সামান্য। সন্তান থাকিলে স্ত্রী স্বামীর পিণ্ড দিবার অধিকারী নহে, স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী নহে, পুত্রকন্যার সম্পত্তিরও নহে। সন্তান মায়ের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সর্ব্বস্ব অপাত্রে বিন্যস্ত করিলে সমাজে তাহার কোন অপরাধ হয় না। ভগিনী ভ্রাতার সম্পত্তির অধিকারী নহে। রমণীর কার্য্যকুশলতায় অবিশ্বাস বশতঃই হউক অথবা অন্য কোন কারণে হউক, মাতা বা বিধবা কন্যা বা ভগিনী রমণীমাত্র বিষয়াধিকার হইতে বঞ্চিত।

প্রাচীন সমাজেও রমণীকে কখন স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয় নাই। মনু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রমণী চিরদিন পিতা ভ্রাতা বা পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রশ্চ স্থাবিরেভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।
বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে
পুত্রাণাং ভর্ত্তরিপ্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং

হৃদয়ের মহত্ত্বে, কার্য্যনিপুণতার বা গৃহিণীপনার পারদর্শিতা হেতু রমণী সংসারে আধিপত্য সঞ্চয় করিয়া থাকিলেও রাজদ্বারে বা শাস্ত্রকারের মণ্ডপে তাঁহার প্রভাব কখন স্বীকৃত হয় নাই।

যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।
যত্রঃ তৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ আত্মা পত্নী সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যাঃমনুরব্রবীৎ॥
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা

এ সকল বিধিবাক্য আমি বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা রমণীর সমাজে উচ্চাসনের পরিচয় পাওয়া যায় না। নিজের স্বর্গতি লাভের জন্য পুত্র প্রয়োজন, পুত্রহেতু স্ত্রী প্রয়োজন। স্বামীর ধর্ম্মের ভাগী স্ত্রী, স্ত্রীর ধর্ম্মের ভাগী স্বামী নহে। এ সকল দেখিলে বোধ হয় স্ত্রীলোকের সুখের জন্য যে শিক্ষা, আদর বা ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল সে কেবল স্বামীর সাংসারিক সুখের জন্য, স্ত্রীর মঙ্গল তাহার মুখ্যহেতু নহে।

অতি প্রাচীন আর্য্য সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজে তাহাদের যে দুরবস্থা, গ্রীস রোম জার্ম্মানী প্রভৃতি পাশ্চাত্য আর্য্যসমাজেও সেইরূপ দুরবস্থা ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কয়েকটী নিদর্শন দেখাইব।

পূর্ব্বে সকল পরিবারে ক্রীতদাস বা গোলাম পোষণ হইত। এখনও নেপাল, আসাম, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে এবং পূর্ব্ববাঙ্গালায় গোলাম রাখিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ক্রীতদাসের ধন প্রাণ যৌবন মান সকলই প্রভুর পদগত। ক্রীতদাসীকে স্ত্রীর মত করিয়া পরিবারের মধ্যে রাখিলে কোন নিন্দা হইত না—উহা তখন সামাজিক প্রথা। উড়িষ্যায় এ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কটকে সাগর পেশা বা চাকর পেশা বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, তাহাদের জন্ম এইরূপে। সে যাহা হউক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মনু স্ত্রী পুত্র ও ক্রীতদাসকে সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ইহারা সম্পত্তি অধিকার পাবে না—ইহারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিবে তাহা তাঁহার, তাহারা যাঁহার।

ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যতে তস্য তদ্ধনং॥

স্ত্রী, পুত্র বা দাস কোন অপরাধ করিলে দড়ি পাকাইয়া তাহার দ্বারা বা বাখারি দ্বারা তাহাদের দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং স্বোপার্জ্জিত বা অপরাধের দণ্ড সম্বন্ধে স্ত্রী ও দাসীর মধ্যে কোন তারতম্য করেন নাই।

মানবপ্রকৃতি নামক গ্রন্থে আমি দেখাইয়াছি যে দাসী হইতেই স্ত্রীর উৎপত্তি। মনু যাহাকে আসুর বিবাহ বলিয়াছেন, অন্য বংশ হইতে বলপূর্ব্বক আনিয়া বিবাহ করা—তাহাই বিবাহের প্রথম ব্যবস্থা। এখনও এমন অসভ্যজাতি আছে যাহারা জঙ্গলে কোন রমণীকে আক্রমণ করিয়া সংসর্গ করিতে পারিলেই রমণী তাহার স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। বিবাহের পবিত্রতা অসভ্য সমাজে অতি সামান্য। কে দাসী কে পত্নী বুঝা যায় না। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি প্রাচীন আর্য্যসমাজেও ক্রীতদাসী পত্নীর ন্যায় ব্যবহৃত হইত এবং পরিবারের একজন বলিয়া গণ্য হইত। তবে কি না অসভ্য সমাজের দাসী অপেক্ষা আর্য্যসমাজের দাসীর অবস্থা একটু উন্নত ছিল। জুলুদের মধ্যে বড় ভায়ের বিধবাদিগকে ছোট ভায়েরা ভাগ করিয়া লয়—ভেরা পাজ কদ্দো ও দামারা দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে। বিহারে বড় ভায়ের বিধবাকে নিকা করিবার প্রথা দেখা যায়। বোধ হয় পূর্ব্ববাঙ্গালায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। নবজিলাণ্ডে বাপের বিধবাদিগকে ছেলে উত্তরাধিকার করে। বাপের যে সকল বিধবার সন্তান হয় নাই, মেক্সিকোর অসভ্যেরা তাহাদিগকে গ্রহণ করা দোষ মনে করে না। আসামের মিকসীজাতি ও এগবাদিগের মধ্যে দাস উপকূলে ও ভাহোসী দেশে বাপের বিধবাদিগকে স্ত্রী বলিয়া পুত্রেরা গ্রহণ করে। হিন্দু আর্য্যদিগের দাসীদিগকে এই দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মনু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন:—

বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমং প্রচারং চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে॥

উশনঃ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—

অবিভাজ্যং স গোত্রাণামা সহস্রকুলাদপি।
যাজ্যং ক্ষেত্রঞ্চ পত্রঞ্চ কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ॥

দুর্ভাগ্যের বিষয় জীমূতবাহন ও যাজ্ঞবল্ক্য এই স্ত্রীরূপিনী ক্রীতদাসীদিগকে অবিভাজ্য বলেন নাই। তাহাদিগকে ভাগ করিয়া লইবার অধিকার পুত্রদের আছে।

প্রাচীন রোমদেশে দাস হত্যার অপরাধ হইত না। আমার পাঁটা আমি যখন ইচ্ছা মারিতে বা কাটিতে পারি—ক্রীতদাসেরা গৃহপালিত পশু পক্ষীর অন্যতর, কেবল ক্রীতদাস কেন পরিবারের কর্ত্তা আপন স্ত্রী পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকে হত্যা করিতে পারিতেন, যাকে তাকে দান করিতে বা বেচিয়া

ফেলিতে পারিতেন। এই রোমকেরা আমাদের ন্যায় আর্য্যসন্তান। আমরা দেখাইব হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যেও স্ত্রী পুত্র কন্যার উপর কর্ত্তার এইরূপ অধিকার ছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

গুরোঃ শিষ্যো পিতুঃ পুত্রে দম্পত্যোঃ স্বামি ভৃত্যয়োঃ।
বিরোধেতু মিথস্তেষাং ব্যবহারো ন সিধ্যতি॥

বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—

শোণিত শুক্রসম্ভবো পুত্রঃ মাতা পিতৃ নিমিত্তকঃ। তস্য প্রদান বিক্রয় ত্যাগেষু মাতা পিতরৌ প্রভবতঃ। নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ। সহি সন্তানায় পূর্ব্বেষাং। ন স্ত্রী দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ বা। অন্যত্র অনুজ্ঞানাদ্‌ভর্ত্তুঃ।

পিতামাতার শুক্র শোণিত সংযোগে পুত্রের উৎপত্তি। অতএব তাহার দান, বিক্রয় ও পরিত্যাগ বিষয়ে পিতা মাতারই প্রভুতা। কিন্তু এক পুত্রস্থলে দান চলিবে না। কারণ সে পূর্ব্বপুরুষদিগের ধারা। স্ত্রীলোকে স্বামির আজ্ঞা বিনা দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না।

মমসেন তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে রোমান পিতা আপন পুত্রকে দানবিক্রয় বা হত্যা করিলে সমাজে কোন অপরাধ হইত না। ফুয়েজিয়ানেরা আপন সন্তান বিক্রয় করিয়া থাকে, একটু মদের দামে পাটাগোনায়ার লোকেরা আপন স্ত্রী পুত্র স্পানিয়ার্ডদিগের নিকট বিক্রয় করিত। মাকুটীজাতি যে দামে কুকুর বেচে সেই দামে পুত্র বেচিয়া থাকে। জাপানে পুত্র বিক্রয় করিবার অধিকার অদ্যাপি আছে। সুতরাং দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঋচীক কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া শুনঃশেফকে বিক্রয় করিবে আশ্চর্য্য কি। শুনঃশেফকে কিনিয়া লইয়া গিয়া রাজা অম্বরীষ বলিদান দিবেন, ঋচী তাহা জানিতেন। চণ্ডালিনীর ছাগলছানা বেচিতে কষ্ট হয়, ব্রাহ্মণের পুত্র বেচিতে কষ্ট হয় নাই।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে পিতার সদ্গতিতে কন্যার কোন অধিকার ছিল না। আধুনিক মিতাক্ষরা কিছু দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন

ভগিন্যাঞ্চ নিজাদংশাৎ দত্বাংশন্তু তুরীয়কম্

স্ত্রীজাতি কিছু পাইবে না, ইহাই সনাতন নীতি, যেখানে কিছু দিবার ব্যবস্থা আছে তাহাই নূতন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ।

ডাক্তার হগ সাহেবের মতে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের সময় পূঃ খৃঃ ১৪০০ হইতে ১২০০, আর মন্ত্র ভাগের সময় ২৪০০-১৪০০। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আবার ব্রাহ্মণ ভাগ, মন্ত্র ভাগ অপেক্ষা পুরাতন। হিন্দুর নিকট বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং এ সকল বিষয়ের আলোচনায় আর সময় নষ্ট করিব না। যিনি যাহাই বলুন সকলকে মুক্তকণ্ঠে ইহা বলিতে হইতেছে যে বেদ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্ব পুরাতন। বেদসংহিতা-পদ্য, বেদব্রাহ্মণ-গদ্য।

প্রথমেই ব্রাহ্মণের একটা হিসাব দিতেছি। পরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ দিব।

ঋগ্বেদ—১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২। কৌষিতকী।

যজু { শুক্লযজু—১। শতপথ।
　　 { কৃষ্ণযজু—১। তৈত্তিরীয়।

সামবেদ—১। তাণ্ড্য, ২। ষড়বিংশ, ৩। মন্ত্র, ৪। সামবিধান, ৫। দৈবত, ৬। আর্ষেয়, ৭। সংহিতা, ৮। বংশ।

অথর্ব্ব—গোপথ ব্রাহ্মণ।

য়ুরোপীয়দিগের মতে উল্লিখিত কয় খানি ব্যতীত প্রত্যেক বেদের আরও অনেক ব্রাহ্মণ ছিল, এক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। মোক্ষমূলরের মতে আরও অনেক বেদসংহিতা, বেদব্রাহ্মণ এবং বেদশাখা এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। বেদের অপৌরুষেয়তা অপ্রমাণ করিবার জন্য এই সমস্ত কথা মিশনরীগণ সানন্দে আলোচনা করেন। ইহাদের তর্ক এই যে বেদ (ও ব্রাহ্মণ) যখন 'শ্রুতি' তখন মুখে মুখে শিক্ষিত হইত, সুতরাং ভুলিবার সম্ভাবনা।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ।—(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বোম্বাইয়ের হগ সাহেব সম্পাদকতা করিয়া মূল প্রকাশ করেন এবং অনুবাদও করেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৬৩ সালে ইহা মুদ্রিত হয়।

মোক্ষমূলর ও মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌ (Indian Wisdom p 22 to 35)

এ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ও কতক কতক বিবরণ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী একটি সংস্করণ বাহির করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'কে অনেকে ঐতরেয় উপনিষৎও বলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গদ্য ও পদ্য এবং প্রধানত আট ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগে আবার পাঁচটি করিয়া অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার পাঁচটি করিয়া খণ্ড আছে। ইহাতে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ ও হোমের ব্যাপার আছে। যথা সোমযাগ, অগ্নিষ্টোম দীক্ষণীয় ইষ্টি ইত্যাদি। শেষে প্রায়শ্চিত্তের কথা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে আরণ্যক তাহার নাম "ঐতরেয় আরণ্যক।" বেদে ও তন্ত্রে যে ভেদ নাই, ইহা পাঠে বেশ বুঝা যায়। সে গুহ্য কথা তুলিতে পারি না। ইহার পাঁচ অধ্যায়ে। মূল রোয়ার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় (এসিয়াটিক সোসাইটীর "বিবলিওথেকা")। মোক্ষমূলর পাঁচ অধ্যায়ের মধ্যে একটির অনুবাদ করিয়াছেন (Sacred Books of East) 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' একটি উপাখ্যান হইতে য়ুরোপীয়েরা বলেন, প্রাচীন ভারতে নরবলি প্রচলিত ছিল।

(২) কৌষীতকীব্রাহ্মণ—মোক্ষমূলরের (S.B.E.) অনুবাদ আছে। কাউয়েল সাহেবের অনুবাদ (Bibliotheca Indica) এই ব্রাহ্মণের দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য (ক) ইন্দ্র ও প্রতর্দন (খ) অজাতশত্রু ও বালাকী। কৌষীতকীতে যাগ যজ্ঞ হোমের কথা ত আছেই। যাঁহারা বলেন বেদে শিবের উল্লেখ নাই, তাঁহারা কৌষীতকী ব্রাহ্মণ দেখিবেন। ঈশান মহাদেব রুদ্র কাহার নাম? কাহারও কাহারও মতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নামই অশ্বালয়ন ব্রাহ্মণ এবং কৌষীতকী ব্রাহ্মণের নামই শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণ। 'ইতর' নাম হইতে ঐতরেয় হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদ। শুক্ল যজুর্ব্বেদের (বাজসনেয়ী সংহিতা) ব্রাহ্মণ হইতেছে শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৮৫৫ সালে বার্লিন সহরে ওয়েবার সাহেব সম্পাদক হইয়া মূল প্রকাশ করেন। প্রথমে মোক্ষমূলরের Sacred Book of East গ্রন্থে এগেলীং কৃত খানিকটা (সপ্তম কাণ্ড পর্য্যন্ত) অনুবাদ প্রকাশ হয়। পরে কয়েক খণ্ডে শেষাংশের অনুবাদ প্রকাশ হয়। এই ব্রাহ্মণ এক শতটি 'পথে' (পরিচ্ছেদে) বিভক্ত। প্রত্যেক পথের নামও 'ব্রাহ্মণ', তাই নাম

শতপথ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণেরই বহুল প্রচার ও য়ুরোপীয়দিগের নিকট বিশেষ আদর। তাঁহারা ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিকও বলেন। ইঁহাদের মতে প্রথম নয় কাণ্ড শুক্ল যজুর্ব্বেদের সংহিতার টীকা স্বরূপ। যজ্ঞ প্রধানত তিন প্রকার সোমযাগ, পশুমেধ এবং হবির্যজ্ঞ।

প্রথম কাণ্ড। পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় যে যজ্ঞ হয় তদ্বিবরণ। ইহা হবির্যজ্ঞ।

দ্বিতীয় কাণ্ড। অগ্নি সংস্থান ও পূজা।

তৃতীয় ও চতুর্থ কাণ্ড। সোমযাগ অগ্নিহোত্র এবং অগ্নিউপস্থান।

পঞ্চম কাণ্ড। বাজপেয় যজ্ঞ ও রাজসূয় যজ্ঞ।

ষষ্ঠ ও সপ্তম। অগ্নিবেদী সংস্থান। ইত্যাদি।

দ্বাদশ কাণ্ড। সৌত্রামণি নাম। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

ত্রয়োদশ কাণ্ড। অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই কাণ্ডেরই শেষ ছয় পরিচ্ছেদ বৃহদ্ আরণ্যক (উপনিষদ) বলিয়া খ্যাত। এই কাণ্ডে মহাদেবের উল্লেখ আছে।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড। বিষ্ণুর কথা। যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের বিবরণ আছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ হইতেছে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সম্পাদকতা করিয়া "বিবলিওথেকা ইন্‌ডিকা"য় প্রকাশ করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং তৈত্তিরীয় উপনিষৎ এই ব্রাহ্মণ সংলগ্ন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ খানি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে "কাণ্ড" বলে। প্রথম কাণ্ড আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার অনেকগুলি করিয়া অনুবাক আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাণ্ডে কেবল মাত্র নয়টি করিয়া অনুবাক আছে। প্রথম কান্‌ডে গৃহে অগ্নি রক্ষা করিবার বিধিব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি, সোমরস প্রস্তুতের বিধি, এবং রাজাভিষেকের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় কান্‌ডের প্রথমে ঐ অভিষেকের ব্যবস্থা, তারপর অগ্নিহোত্র যাগের ব্যাপার, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে বিশেষ বিশেষ দেবতার আহ্বান, মনুষ্য, সৃষ্টিরহস্য ও "স্বাহা" রহস্য। তৃতীয় কান্‌ডে আছে নক্ষত্রের বিবরণ, শুক্ল পক্ষের ও কৃষ্ণ পক্ষের ক্রিয়াকান্‌ড, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ক্রিয়াকলাপ, এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞকালে দোষ ঘটিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

সামবেদের ব্রাহ্মণ—আট খানি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (১) তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। ইহারই নামান্তর, 'মহা ব্রাহ্মণ,' 'প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ,' 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ'। 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকায়' সায়নের টীকা সহ প্রকাশ হয়। সম্পাদক পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সোমযাগের বিবরণ এই ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। খৃষ্টধর্ম্মের মূলসূত্র—জীবের উপকারার্থ তাহাদের পাপের জন্য ভগবানের আত্মদেহ বলিস্বরূপ দান—এই ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ইংরেজীটি তুলিয়া দিলাম।

"The Lord of creatures offered himself a Sacrifice for the benefit of the *devas*. The *devas* were mortals who thus became divine or glorified."

(2) "O thou animal limb, now being consigned to the fire, thou art the anulment of sins committed by gods. Thou art the anulment of sins committed by men. Thou art the anulment of sins committed by ourselves. Whatever sins we have committed by day or night, thou art the anulment there of. Whatever sins we have committed sleeping or awake, thou art the anulment there of. Whatever sins we have committed knowing or unknowing, thou art the anulment there of. Thou art the amulment of Sin."

অর্থাৎ—দেবগণের উপকারার্থ প্রজাপতি স্বীয় দেহ বলিস্বরূপ দান করিলেন। দেবগণ পূর্ব্বে অমর ছিলেন না। প্রজাপতির এই কার্য্য দ্বারা তাঁহারা এক্ষণে অমর ও জয়যুক্ত হইলেন।

(২) জীব-দেহ তোমাকে আমি অগ্নিতে প্রদান করিতেছি। তুমি দেবগণের কৃত পাপের, মানবগণের কৃত পাপের, আমাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হও। আমরা দিবাভাগে বা রজনীতে, নিদ্রাবস্থায় বা জাগ্রদবস্থায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, যে সকল পাপ করিয়াছি তুমি তাহার খণ্ডন স্বরূপ হও। তুমিই পাপের প্রায়শ্চিত্ত—পাপের খণ্ডন।

(২) ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ—পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কেবল মাত্র মূল

ও সায়নের টীকা প্রকাশ করিয়াছেন, মূল্য এক টাকা। এই ব্রাহ্মণের শেষাংশের নাম "অদ্ভুত অধ্যায়"। জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ওয়েবর মূল ও জার্ম্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে। বর্ণেল সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আজিও প্রকাশিত হয় নাই। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ও অনেক অধ্যায়ে বিভক্ত। য়ুরোপীয়গণের মতে এই ব্রাহ্মণ তাণ্ড্যব্রাহ্মণেরই উত্তর ভাগ, প্রায়শ্চিত্তের কথাই বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুযাত্রা কুযাত্রা ও অভিশাপের কথাও আছে।

(৩) মন্ত্র ব্রাহ্মণ—দশটি অধ্যায়। কেহ কেহ বলেন মন্ত্র ব্রাহ্মণের আর একটি নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। এই মন্ত্র ব্রাহ্মণের আটটি অধ্যায় স্বতন্ত্র ভাবে "ছান্দোগ্য উপনিষদ" নামে, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকায় প্রকাশিত হয়। রোয়ার ছিলেন সম্পাদক আর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন অনুবাদক। এই আট অধ্যায়ই উপনিষদ নামে "সেকরেড বুক অব্ ইষ্ট" পুস্তকে অনুবাদিত হইয়াছিল। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বাকি দুইটি অধ্যায় মূল অনুবাদ ও টীকা সহিত কলিকাতায় প্রকাশিত করেন। মূল্য চারি টাকা। মন্ত্র ব্রাহ্মণটি দুইটি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রপাঠকে আবার আটটি করিয়া খণ্ড বা অধ্যায় আছে। মন্ত্রব্রাহ্মণ কবিতাময়ী ও ছন্দোময়ী—বেদের মন্ত্র ভাগের ন্যায়, তাই ইহার নাম মন্ত্র। প্রথম প্রপাঠকে বিবাহের মন্ত্র আছে, আরও আছে দ্বিরাগমন, গর্ভাধান, পুংসবন, বালকের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে গমন, দণ্ডগ্রহণ। য়ুরোপীয়দিগের মতে ইহাতে অনেক অশ্লীল কথা আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকেও মন্ত্র আছে—বায়ুকীয় উদ্দেশে, পৃথিবীর উদ্দেশে, রুদ্র, ইন্দ্র, উষা, যম, পিতৃগণ, পরব্রহ্ম, ইত্যাদি। নিত্যকর্ম্মের ব্যাপারও আছে, নিত্যপূজাদির ব্যবস্থাও আছে। শেষে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা আছে যে আর্য্যগণ যেন গো-হত্যা না করেন।

(৪) সামবিধান ব্রাহ্মণ—মূল, সায়নের টীকা, ও বঙ্গানুবাদ, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতায় প্রকাশিত, মূল্য পাঁচ টাকা, পাঁচ শত শ্লোক। ১৮৭৩ সালে লণ্ডন সহরে বর্ণেল সাহেব (A.C. Burnell Ph. D.) মূল ও সায়নের টীকা, উপক্রমণিকাসহ প্রকাশ করেন। প্রথম বালম (খণ্ড) মাত্র প্রকাশ হয়। কথা ছিল ১৮৭৭ সালে এই ব্রাহ্মণ ও ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ তিনি ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করিবেন; তাহা

হইয়াছে কি না জানি না। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে ইহা পূঃ খৃঃ ৬০০ অব্দে রচিত হয়। কাঁহারও কাঁহারও মতে খৃঃ অঃ ৫০০। এই ব্রাহ্মণের প্রথমেই তপঃ ও প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ। ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। পরে কাম্যক্রিয়ার ব্যবস্থা। পাপের নাম ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কিছু সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। গোহত্যা পাপ বলা হইয়াছে। কবজ আদি প্রস্তুত বিধিও আছে। শত্রু সংহারের মন্ত্রাদিও আছে। জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ সংগ্রহ ও এই ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রজালের ব্যাপারও আছে। য়ুরোপে মধ্যযুগে যে সকল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রচলিত ছিল, সেই সমস্তই এই ব্রাহ্মণে দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা চমৎকৃত হইয়াছেন। এখনও য়ুরোপের স্থানে স্থানে শত্রু সংহার করিতে হইলে লোকে মোমের পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া দগ্ধ করে। এই ব্রাহ্মণেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে মোমের পরিবর্ত্তে ময়দা ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ব্রাহ্মণে আরও পিতৃপূজা আছে। রাক্ষস গন্ধর্ব্ব অপ্সর প্রভৃতি দেবযোনীদিগের ব্যাপার আছে। এই ব্রাহ্মণে "দেবকীপুত্র কৃষ্ণের" বিবরণও আছে। এই ব্রাহ্মণেই জন্মান্তরবাদ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রহণকালে রাহু কর্ত্তৃক যে সূর্য্য গ্রাস হয়, সে কথাও আছে।

(৫) দৈবত ব্রাহ্মণ—আর একটি নাম "দেবতাধ্যায়"। বর্ণেল ১৮৭৩ সালে মাঙ্গালোরে মূল ও সায়নের টীকা সমেত প্রকাশ করেন। কলিকাতায় সত্যব্রত সামশ্রমী মূল, সায়নের টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন, মূল্য এক টাকা। প্রথমাংশে সামবেদ ছন্দাধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্ণয়ের সঙ্কেত ও সামগান উচ্চারণ সঙ্কেত। প্রকৃত উচ্চারণের উপরই যে দেবতার আবির্ভাব নির্ভর করে। য়ুরোপীয়দিগের নৌকা এই খানে বানচাল্ হইয়াছে। তাঁহারা একথা কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই ও পারেন না। এখানে তাঁহাদের যদিও একটুকু আশা থাকে দ্বিতীয়াংশে সে আশা একেবারে নৈরাশ্যে পরিণত হইয়াছে, কেন না এই দৈবত ব্রাহ্মণের দ্বিতীয়াংশে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের রূপ ও বর্ণের কথা আছে। তৃতীয়াংশে চারি যুগ ও ব্রহ্মার দিনের কথা।

(৬) আর্ষেয় ব্রাহ্মণ—১৮৭৬ সালে মাঙ্গালোর নগরে বর্ণেল সাহেব মূল ও সায়নের টীকা প্রকাশ করেন। কলিকাতায় পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী

মূল ও সায়নের টীকা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩০০ শ্লোক, মূল্য পাঁচ টাকা। এই ব্রাহ্মণ খানিকে অনেকে সামবেদের সূচী বলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বেদের সূচীর নাম অনুক্রমনি।

(৭) সংহিতা ব্রাহ্মণ—১৮৭৭ সালে মূল ও সায়নের টীকা মাঙ্গালোর সহরে বর্ণেল প্রকাশ করেন। প্রথম অধ্যায়—পাঁচটি শ্লোক। আবৃত্তির ফলের কথা। শব্দ ও সামের সম্বন্ধ বিচার, ইত্যাদি।

(৮) বংশ ব্রাহ্মণ—আচার্য্য ওয়েবর জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি মূল ও জার্ম্মান-অনুবাদ প্রকাশ করেন। বর্ণেলও ১৮৭৩ সালে মাঙ্গালোরে মূল ও সায়নের টীকা প্রকাশ করেন। কলিকাতায় পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মূল, সায়নের টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। মূল্য এক টাকা, ৪০ শ্লোক। সামবেদের ঋষিগণের ও আচার্য্যগণের বংশ বিবরণ আছে। তিনটি বিভিন্ন প্রথায় নামগুলি আছে। প্রথমটিতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পঁয়ত্রিশটি নাম আছে। অমাবস্ব ও রাধায় শেষ। অমাবস্ব হইতে অংশু সম্প্রদায় ও রাধা হইতে গোভিল সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে সাতাইসটি নাম। অংশু হইতে আরম্ভ এবং সর্ব্বদত্তে শেষ। তৃতীয়টিতে চৌদ্দটি নাম গোভিল হইতে আরম্ভ ও নয়নে শেষ।

কুমারিল ভট্ট সামবেদের আট খানি ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে কুমারিল ভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। উক্ত মতানুসারেই খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সায়নাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তিনিও আট খানি ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

এ স্থানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত "জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ" বা "তলবকার ব্রাহ্মণকে" সামবেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারই অংশ "কেনোপনিষৎ"। রাজা রামমোহন রায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে ব্রহ্ম-বিচার। দ্বিতীয়াংশে উমা-হৈমবতীর বিবরণ।

অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ।—একখানি ব্রাহ্মণ, নাম—গোপথ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ। ১৮৭২ সালে "বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা" য় প্রকাশ হয়। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি বিবরণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রৌত ক্রিয়া। সকামক্রিয়া সাফল্যের জন্য নানাবিধ বিধি ব্যবস্থা কবচাদি ও মন্ত্রাদি আছে। যজ্ঞকালে ত্রুটি হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। (মাকডোনাল্ড)

ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? ব্রাহ্মণে ছয়টি বিষয় থাকিবে। বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, শংসা, পুরাকল্প, পরকৃতি। বিধি অর্থাৎ নিয়ম, ব্যবস্থা। অর্থবাদ—মন্ত্রের ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যা। নিন্দা—অর্থাৎ এই এই কার্য্য করা উচিৎ নয়। শংসা—অর্থাৎ কার্য্যের প্রশংসা, এই এই কার্য্য করা উচিৎ, করিলে মঙ্গল হয়, পুণ্য হয়। পুরাকল্প—পুরাকালে কিরূপে যজ্ঞ ও ক্রিয়া হইত তাহার বিবরণ। পরকৃতি—অর্থাৎ অপরের কীর্ত্তিকলাপ; অর্থাৎ অমুক এই কার্য্য করিয়া এইরূপে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ব্রাহ্মণের ও বেদের রচয়িতা মনুষ্য। এক একটি পুরোহিত-পরিবার এক এক খানি ব্রাহ্মণ রচনা করেন। আমাদের পক্ষে এ কথার আলোচনা না করাই ভাল।

ব্রাহ্মণে বহুবিধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; পুরুষমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় ইত্যাদি। এই সকল যজ্ঞের ব্যাপার য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াই বলেন, বৈদিক সময়ে নরবলি প্রচলিত ছিল, গোমাংস ও অশ্বমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। বলিদানের অর্থ বিশদরূপে না বুঝিলে এই সকল কথা বুঝা যাইবে না। বলিদানের কথা পরে বলিব।

ব্রাহ্মণের অনেক স্থলে যে তন্ত্রদত্ত শিক্ষা স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেকে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সম্যক্‌রূপে আলোচনাও করিয়াছেন। বর্ণেল তন্মধ্যে একজন।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ সৃষ্টিরহস্য বুঝিতে পারেন নাই। তবে শতপথ ব্রাহ্মণে "জলপ্লাবনের" কথা পাইয়া মিশনরীগণ আনন্দিত হইয়াছেন।

আত্মার অমরত্বের, পরলোক ও জন্মান্তরবাদের, ব্রাহ্মণে, স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ আছে। দেবগণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়কে বেদ-ব্রাহ্মণের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপহার দিলাম। ইহা কিছুই নহে। যদি প্রকৃত বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয় তবে প্রকৃত জ্ঞানী হিন্দুর কাছে তত্ত্ব করিবেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সম্পাদিত পুস্তকে বা তাহার অনুবাদে কেবল মাত্র কুজ্ঝটিকা প্রাপ্ত হইবেন। সতর্ক করিবার প্রয়োজন আছে।

কেহ কেহ আবার বেদকে ইতিহাস মনে করিয়া, আধুনিক ইতিহাসের ব্যাপার উহাতে না পাইয়া বিরক্ত হইয়াছেন। আধুনিক প্রথার ইতিহাস হিন্দুরা লেখেন নাই—লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। মৃত্যুর পর পৃথিবীর সহিত যাহাতে কোনওরূপ সংশ্রব না থাকে সেই চেষ্টাই ঋষিরা করিতেন। তবে পরকীর্ত্তি কীর্ত্তনের কিছু প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই "পুরাণ" আছে। শাস্ত্রে পুরাণের এইরূপ লক্ষণ আছে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণং॥

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ। সূক্ষ্ম সৃষ্টি, (অর্থাৎ ভগবানের সূক্ষ্ম সৃষ্টি—রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি), স্থূল সৃষ্টি (অর্থাৎ সূক্ষ্ম সৃষ্টির পর দক্ষাদির সৃষ্টি), বংশ, বংশানুচরিত এবং মন্বন্তর। ব্যাসাদি মুনি রচিত এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থকে পুরাণ বলে। পুরাণ অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত। পাঠক মহাশয় দেখিবেন যে ইহা আধুনিক প্রথার ইতিহাস নহে। পুরাণ আঠারখানি। ব্রাহ্ম, পাদ্ম, শৈব, ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ড, অগ্নি, নারদ, বিষ্ণু, গরুড়, স্কন্দ, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, বামন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। ইহা ব্যতীত উপপুরাণ আছে। পুরাণাদির বৃত্তান্তাদি যদি দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা হয়, তবে পরে দিব।

বেদব্যাস যেমন বেদের মর্ম্ম জানেন, এমন আর কেহই জানেন না। তিনি বেদের যথার্থ মর্ম্ম কি, যখনই অবসর পাইয়াছেন, বলিয়াছেন। তিনিই অধ্যাত্ম রামায়ণে, সমগ্র শ্রুতির সার সংগ্রহ করিয়া "রামগীতা" প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের এক স্থলে তিনি রঘুবর রামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলিয়াছেন "জীবের জীবন অগ্নিসন্তপ্ত লৌহের উপরিভাগে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং তাহাদিগের ভোগসুখও মেঘবিতান সংস্থিত চপলা-বিলাসবৎ চঞ্চল। ভেক যেরূপ বিষধরের মুখবিবরবর্ত্তী হইয়াও সেই সর্পের মাংস দংশনের অভিলাষ করে, তদ্রূপ কালভুজঙ্গ জীবকে আক্রমণ করিলেও সেই জীব বিনশ্বর বিষয়বাসনা পরিহার করিতে সমর্থ হয় না। হায়! নর-নিকর শরীর ভোগার্থ দিবানিশি নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ধনার্জ্জনাদি ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু একবারও ভাবে না যে দেহ আত্মা হইতে পৃথক সেই আত্মাই বা কি সুখ উপভোগ করেন। পিতা মাতা ভ্রাতা এবং পুত্রকলত্র ও বন্ধুবর্গ প্রভৃতির সহিত প্রাণিগণের একত্র

সম্মিলন জলছত্রে লোকসমাগম অথবা বেগবতী স্রোতঃস্বতীর বিশালগর্ভে ঊর্ম্মিমালা বা কাষ্ঠপুঞ্জের ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল। কমলা ছায়ার ন্যায় চপলা, যৌবন জলতরঙ্গের ন্যায় অস্থির, স্ত্রীসুখ স্বপ্নসদৃশ এবং পরমায়ু ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু হায় ইহা জানিয়াও জীবের এত অভিমান!! মূর্খেরাই নিরন্তর রোগাদি দ্বারা পরিপূর্ণ ও স্বপ্নসদৃশ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় সংসারকে সুখের স্থান বিবেচনা করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়। আদিত্যদেব প্রতিদিন গমনাগমন করিতে-ছেন, সেই সঙ্গে পরমায়ুও অবিরত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু এই ভাব এত লোকের জরামৃত্যু সন্দর্শন করিয়াও জীবের মনোমধ্যে কিছুতেই উদিত হয় না।" (বলইচাঁদ গোস্বামী) শ্রীভগবান স্বয়ং মহাভারতে—গীতার অনেক স্থলেই বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। বেদের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হওয়া সুতরাং আয়াস সাধ্য নহে। গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

বেদ সকল সকাম বিষয়ক, হে অর্জ্জুন তুমি নিষ্কাম হও। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৩। শ্রুতি বিপ্রতিপন্না ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়। ১৫।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

বেদ হইতে কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম হইতে বেদের উদ্ভব হয় অতএব যজ্ঞে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সদাকাল প্রতিষ্ঠা জানিবে।

চতুর্থ অধ্যায় ১২।২৮।৩২। সপ্তম অধ্যায় ৮।২৩। অষ্টম অধ্যায় ১১।২৮। নবম অধ্যায় ১৬।১৭।২০।২১। দশম অধ্যায় ২২।২৫।৬৫। একাদশ ৪৮।৫৩। ত্রয়োদশ অধ্যায় ৫। সপ্তদশ অধ্যায় ২৩। অষ্টাদশ অধ্যায় ২৪।

শ্রীভগবান আরো বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্মকৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩-৯

বিষ্ণুর প্রীতিসাধন কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্মে লোক কর্ম্মবদ্ধ হইয়া থাকে, অত-এব হে কৌন্তেয়, তুমি কামনা রহিত হইয়া সেই বিষ্ণুর প্রীতির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ৫-১২

নিষ্কাম কর্ম্মী কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন, আর সকাম কর্ম্মী কামনা বশত ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম বদ্ধ হয়।

যজ্জুহোষি যদশ্নাসি যৎ করোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণং॥ ৯-২৭

হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, এবং যাহা তপস্যা কর, তাহা আমাতে অর্পণ কর।

এই সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন,

'ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে।
প্রবৃত্তং কর্ম্মসংসেব্য দেবানামেতি সাষ্টিতাং
নিবৃত্তং সেব্যমানন্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥

ভোগ নিমিত্ত শরীর গ্রহণের প্রবর্ত্তক বলিয়া সকাম কর্ম্মকে 'প্রবৃত্ত' বলে। সেই কর্ম্মই কামনা রহিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা কর্ম্ম বন্ধনচ্ছেদক হওয়ায় সংসার নিবৃত্তির কারণ বলিয়া উহাকে নিবৃত্ত বলা যায়। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সেবা দ্বারা (কর্ম্মফল বদ্ধ) দেবতাদিগের সমান গতি অর্থাৎ ভোগদেহ লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মের সেবা দ্বারা পঞ্চভূত অতিক্রান্ত হইয়া মুক্তিলাভ হয়।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া শ্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনং॥
উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আশক্তোমনসো মর্ত্যা আত্মনোঽনর্থ হেতুষু॥
ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি
কথং যুঞ্জাৎ পুনস্তেষু তাং স্তমো বিশতো বুধঃ॥
এবং ব্যবসিতং কেচিৎ অবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥

অর্থাৎ বেদে যে সকল ধনধান্য ভোগাদিরূপ ফলশ্রুতি আছে, তাহা কেবল কর্ম্ম বহির্ম্মুখ মনুষ্যদিগকে মুক্তি কথনেচ্ছায় আনুষঙ্গিক ফল দ্বারা কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য পরমার্থ লাভের জন্য নহে। যেমন পিতা মিষ্ট দ্রব্যের

লোভ দেখাইয়া পীড়িত বালককে নিম্ব ভোজন করিতে বলেন, বালকও প্রলুব্ধ হইয়া নিম্ব ভোজন করিয়া থাকেন। এখানে যেমন মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করান পিতার প্রয়োজন নহে, পুত্রের আতুরাগ্যই বাঞ্ছনীয় তদ্রূপ (অনর্থের কারণ মোক্ষ-বিরোধী পদার্থ) আয়ু বল বীর্য্য ও পশ্বাদিতে, প্রাণাদিতে ও পুত্রদারাদিতে যে সকল মনুষ্যদিগের স্বাভাবিকই অনুরাগ আছে, মোক্ষ-সুখানভিজ্ঞ অথচ বেদবিশ্বাসী (অর্থাৎ বেদ যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রেয় বলিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন)। সেই সকল ব্যক্তিদিগকে কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া বেদ কখনই অনাত্মীয়ের কার্য্য করেন না। বেদের এই সদভিপ্রায় কোন কুবুদ্ধি কর্ম্মমীমাংসকেরা না জানিয়াই অবান্তর ফল প্ররোচনা দ্বারা রমণীয় সামান্য ফলোদ্দেশে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ তাৎপর্য্য জ্ঞানী ব্যাসদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কখন সেরূপ বলেন নাই।

প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কর্ম্মে কেবল পাপক্ষয় হয়, স্বর্গাদি ফল না থাকায় উহা বন্ধনের হেতু নহে। অতএব পাপক্ষয়জনক প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম নিষ্কামী ব্যক্তিগণ অনায়াসে করিতে পারেন। মোক্ষবিরোধী পাপরূপ মেঘের ক্ষয় ব্যতীত কখনই জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ পাইতে পারেন না।

ভাগবতে বলিয়াছেন,

অময়েব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ
কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নেহ দৃশ্যতে।

অর্থাৎ কর্ম্মই জ্ঞানের সাধক, কর্ম্মযোগ ব্যতীত কাহারই জ্ঞান হইতে দেখা যায় না।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, বেদবাক্য, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা দান যজ্ঞ ও উপবাস ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমশ ব্রাহ্মণগণ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য কৃত হিন্দু সৎকর্ম্ম-মালা হইতে শেষোক্ত বিষয়টি সংগ্রহ করিলাম। ভরসা করি স্মৃতিরত্ন মহাশয় আমাকে বাল-সুলভ ক্ষমা গুণে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়

চামেলী।

নবম পরিচ্ছেদ।

দম্পতিযুগল।

"কি হইতেছে" এই বলিয়া একটি যুবক নিকটস্থ ষোড়শীর রক্তিম কপোলে একটি চুম্বন করিলেন, ষোড়শীও তাহা তদ্দণ্ডে প্রত্যার্পণ করিল। এইরূপে যুবক যুবতী দ্বয়ের শিষ্টাচার সমাধা হইলে, যুবতী কহিলেন, "একটা কবিতা লিখছি"।

যুবক। কবিতা রচনা মন্দ নহে, ইহাতে চিত্তে বেশ এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হয়, সময় কাটাইবার পক্ষেও ইহা একটা বেশ সদুপায়। কিন্তু কবিতা কাহাকে বলে কিছু জান কি?

যুবতী। যা জানি তাই লিখ্‌ছি—তোমার ভাল না লাগে পড়ো না।

যুবক। রাগের কথা বলছি না, বাস্তবিক কবিতা লেখা বড় শক্ত ব্যাপার। কবিতা কথাটা শুনিতে যত সহজ, লেখা তত সহজ নয়।

যুবতী। কেন?—একটু ভাবিলেই ত কবিতা লেখা যায়!

যুবক। চিন্তাশক্তি যে কবিত্বের সোপান তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাবিয়া লেখা, কবিতা অনেক সময় কষ্ট কল্পনা প্রসূত হইয়া পড়ে।

যুবতী। সে কিরূপ?

যুবক। যে কবিতা পাঠ করিয়া আনন্দ পাওয়া যায় না, কেমন এক প্রকার কটমট বোধ হয়, তাহাকেই কষ্ট কল্পনা বলে।

যুবতী। আজ কাল ত অনেকেই কবিতা লিখ্‌ছেন, তুমি কি বলিতে চাও তাঁদের সকলেরই কষ্টকল্পনা প্রসূত কবিতা?

যুবক। সকলের না হোক অনেকের বটে, দুই ছত্র মিলাইয়া লিখিতে পারিলেই আজকাল কবিতা তৈয়ারি হয়, আর সম্পাদকগণের অনুগ্রহে তাহা মাসিক পত্র সকলে স্থান লাভ করিয়া সাহিত্যভাণ্ডারে কেবল কতক গুলা আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করা হইতেছে। এই সকল "হঠাৎ কবি"দের জ্বালায় আজকাল নূতন কাব্যের সৃষ্টি হওয়া দূরে থাক্, কেবল কবিতার শ্রাদ্ধ হইতেছে।

যুবতী। কবিতা বলে কাহাকে?

যুবক। সেই জন্যই আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কবিতা কাকে বলে

জান"? কবিতা রচনা করিয়া সেই কবিতাকে সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ করিতে হইলে সুরুচির দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহাদের রুচি মার্জ্জিত অর্থাৎ যে সকল কবিতায় স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, একতা, প্রীতি, সহানুভূতি, দয়া ও মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিস্ফূরণ হয়, তাহাই বিশুদ্ধ কবিতা। কুরুচি পূর্ণ অর্থাৎ যে সকল কবিতা পাঠে ঘৃণিতভাব উদ্দিপ্ত হইয়া চিত্ত বিকৃত করে বা পাঠককে লজ্জায় ম্রিয়মান করে, তাহা অশ্লীলাত্মক কবিদিগকে সর্ব্বথা এরূপ ঘৃণিত রুচি পরিত্যাগ করিতে হয়।

যুবতী। আর?

যুবক। ভাষা ও ভাবের দিকেও লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। ভাষা কবিতার দেহ, ভাব কবিতার প্রাণ। আজকাল অনেকের কবিতাতেই ভাষার বাঁধুনী নাই—ভাবে ভরা, আবার কোনও কবির কবিতা কেবল বাক্যচ্ছটায় পূর্ণ—সারবত্তা কিছুই পাওয়া যায় না। এই উভয়বিধ রচনাকেই কবিতা বলা যাইতে পারে না, যে কবিতার ভাষা আছে ভাব নাই—তাহা মৃত, মৃত কখনই আদরণীয় নহে। আবার যাহার ভাব আছে, ভাষা নাই, তাহার প্রাণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু দেহ নাই। দেহ ছাড়া প্রাণ আমাদের ভাল লাগে না, উহাও ভূতযোনীর ন্যায় উপেক্ষনীয়ই বোধ হয়। তারপর জ্যোতি ও মিলের ঠিক থাকিলে দেহ ও প্রাণের সহিত মিলিয়া গুণের সৃষ্টি হয়। যখন কবিতায় এই ভাবটুকু স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয় তখনই কবিতার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যুবতী। কবিতার কার্য্য কি?

যুবক। কবি নিজে কোনরূপ সৌন্দর্য্য বা গুণাবলী বা কোন বিষয় দর্শন করিয়া কবিতা দ্বারা সেই চিত্র পাঠকের নিকট প্রতিফলিত করিবেন এবং পাঠক যখন সেই কবিতা পাঠে কবির বর্ণিত চিত্র দর্পণের ন্যায় সম্মুখে দেখিতে পান তখনই কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে বলিতে হইবে। যে কবিতা পাঠে হৃদয় (বর্ণিত বিষয়ানুযায়ী) প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সৎবৃত্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে তাহাই প্রকৃত কবিতা। অন্যের হৃদয়ে আনন্দ ও প্রেম ভক্তি প্রভৃতির উদ্রেক করাই কবিতার কার্য্য। শ্রীমতী গীরিন্দ্র মোহিনীর "অশ্রুকণা" পড়েছ?

যুবতী। পড়েছি।

যুবক। তাহার একটা কোন কবিতা মনে আছে কি ?

যুবতী। আছে।

যুবক। বল দেখি,—কবিতা কাহাকে বলে তোমাকে বুঝাইয়া দিই।

যুবতী। "যা দিবে আমারে দাও সুখ কি যাতনা ভার
ব্যথিত সে সখা মম যেন নাহি দহে আর।"

যুবক। কেমন কবিতা বল দেখি ?

যুবতী। অতি সুন্দর।

যুবক। কেন ?

যুবতী। বড় মিষ্ট।

যুবক। মিষ্ট ত বটেই কিন্তু শুধু মিষ্ট বলিয়াই যে ঐ কবিতা প্রশংসনীয় তাহা নহে, কবি প্রাণের আবেগে প্রিয়জনের জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছেন, সেই প্রার্থনা কবির প্রাণের কথা, কবির প্রাণ আলোড়িত করিয়া তাহা অন্যের প্রাণ স্পর্শ করিতেছে, ঐ কবিতার প্রাণস্পর্শী শক্তি আছে বলিয়াই ঐ কবিতা এত মধুর। যে কবিতা প্রাণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় তাহাই দেহ ও প্রাণ এবং গুণময়ী।

যুবতী। তবে ত কবিতা লেখা বড়ই কঠিন ?

যুবক। তা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আজকাল কবি সকলেই কিন্তু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু, নবীন বাবু ও হেম বাবু ব্যতীত কবি কয় জন ? এখন স্ত্রী-কবিও অনেক দেখা দিয়াছেন কিন্তু এতগুলি স্ত্রীকবির মধ্যে বাছাই করিয়া লইলে চার পাঁচ জন মাত্র কবিনামের যোগ্য। তোমার বেশ প্রতিভা আছে, একটু লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে, তাহলে তুমিও কালে একজন কবি নামের যোগ্য হইতে পারিবে।

হঠাৎ যুবকের বদনমণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল, তদ্দৃষ্টে যুবতী ব্যথিত হইয়া বলিলেন এ কি—হঠাৎ তোমার মুখ এমন বিবর্ণ হলো কেন ? অসুখ হচ্ছে না ত ?—

যুবক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না ও কিছু নয়" অনন্তর যুবক বলিলেন "কুসুম আমি যদি তোমাকে পরিত্যাগ করি" ?

যুবতীর নাম কুসুম। কুসুমের চক্ষে জল আসিল বলিলেন, "ছিঃ ও কি কথা ?"

যুবক। আমি যদি উদাসীন ব্রত লইয়া সংসার ত্যাগ করি তবে তুমি কি কর ?

কুসুম। স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মপথের সহায়, স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীকে ধর্ম্ম প্রণোদিত করা, তুমি যদি ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ কর, আমি বাধা দিব না, আমরণ তোমার চরণ চিন্তা করিয়া ভগবচ্চরণে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।

যুবকের চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল, বলিলেন "কুসুম তুমি ধন্যা, তোমার মত রমণীরত্ন পাইয়া আমার জীবন ধন্য কিন্তু আমি তোমার অযোগ্য—কুসুম স্বামীর মুখে হস্ত প্রদান করিয়া তাঁহার আরব্ধ বাক্যাংশ সমাধা করিতে দিলেন না। এই দম্পতি যুগলের পরিচয় পরে জ্ঞাতব্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

শিবমন্দির।

আষাঢ় মাস। তাহাতে আজ অমাবস্যানিশি। ঝমঝম রবে বৃষ্টি পড়িতেছে, মাঝে মাঝে অশনি কড়নাদে পথিকের চিত্তে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। অদ্যকার রজনী বড়ই ভয়াবহ।

এ হেন রজনীতে প্রায় দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময় এক নিবিড় অরণ্যস্থিত একটি ভগ্ন শিবমন্দিরে স্বামী জীবনানন্দ ধ্যানে নিমগ্ন। সম্মুখে একটি যুবক উপবিষ্ট। বহুক্ষণ পরে স্বামীজির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি যুবকের দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "বৎস! তুমি ব্যাকুল হইও না, পরমাত্মা তোমার মঙ্গল করিবেন কিন্তু এখন তুমি বালক মাত্র, পবিত্র যোগধর্ম্ম কি অটুটভাবে রক্ষা করিতে পারিবে ?

যুবক। আপনার কৃপা থাকিলে অবশ্যই পারিব। গুরুবলে জীবের অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা হয়।

স্বামী। তোমার চিত্ত হইতে সেই রমণীমূর্ত্তি বিদূরিত হইয়াছে, সত্য বল আমাকে বঞ্চনা করিও না।

যুবক। —বিদূরিত,—এ জীবনে বিদূরিত হইবে কি না জানি না, যদি সে মূর্ত্তি আমার চিত্ত হইতে বিদূরিত হইত তবে বোধ হয় প্রাণ জুড়াইবার জন্য এই দুর্গম নিশীথে আপনার চরণতলে উপস্থিত হইতাম না।

স্বামি। মানবজীবন অমূল্য, মোহে ডুবিয়া থাকিবার জন্য মানবজীবন

নহে, আত্মার মধ্যে যিনি পরমাত্মার সম্মিলন লাভ করেন তাঁহারই জীবন সার্থক।

যুবক। দাসের প্রতি কিরূপ আদেশ হয়? আপনি কৃপা দান না করিলে কিরূপে এ মোহডোর ছিন্ন করিব। মহৎ কৃপা ব্যতীত কদাচ আত্মার মঙ্গল হয় না। আপনি কি আমাকে মোহবদ্ধ জীব বলিয়া ঘৃণা করিবেন, চরণে কি স্থান পাইব না?

স্বামী। ঘৃণা—কাহাকে ঘৃণা করিব? সর্ব্বভূতে পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন, একটি জীব বা একটি তৃণকণা মাত্রকেও ঘৃণা করিলে পরমাত্মাকেই ঘৃণা করা হয়। ভরসা করি এ দাস কর্ত্তৃক তাহা কদাচ হইবে না। জীব অহং সেই অহং শক্তি লঙ্ঘন করা হইলে সেই পরব্রহ্মকে লঙ্ঘন করা হয়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।

যুবক। দেব! এ দাসের চিত্তে একটি সন্দেহের উদয় হইয়াছে, আজ্ঞা পাইলে নিবেদন করি।

স্বামী। সন্দেহ পোষণ করা কর্ত্তব্য নহে—অভিপ্রায় প্রকাশ কর।

যুবক। আপনি বলিতেছেন "জীব অহং" কথাটি বড় জটিল বোধ হইতেছে। ভগবান ও জীব পৃথক তত্ত্ব ইহাই এ দাসের ধারনা।

স্বামী। সাধারণের তাহাই ধারণা বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, জীব ও ভগবান অভেদ তত্ত্ব, মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় কিছু দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে মাত্র কিন্তু সে দূরত্ব কোন কার্য্যকর নহে, এ দূরত্ব স্বপ্নলব্ধ রাজ্য প্রায়। নিদ্রাভঙ্গে যেমন স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের চিহ্ন মাত্র থাকে না, জীব তদ্রূপ মায়া মুক্ত হইলেই তচ্চরণে বিলয় প্রাপ্ত হয়, পৃথক সত্বা থাকে না। "আমি" "তুমি" এ সমস্তই মায়িক শব্দ এই জগতও মায়াময়। বস্তুতঃ ইহা স্বপ্নরাজ্য যখন তুমি মায়ামুক্ত হইবে, তখন দেখিবে জগত শব্দটাই মিথ্যা ইহা কেবল মহা শূন্যস্তর মাত্র তখন কিছুই দেখিতে পাইবে না, কেবল দেখিবে একমাত্র "অহং"।

যুবক তবুও স্বামীর বাক্যের জটিলতা উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না কিন্তু কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। যন্ত্র চালিত পুত্তলিকাবৎ বলিলেন "কবে কৃপা লাভ করিব"?

স্বামী। দীক্ষা মুখের কথা নহে, অগ্রে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

যুবক। কিরূপ আদেশ করুন।

স্বামী। এক পক্ষকাল অতি অল্প মাত্র আহার গ্রহণপূর্ব্বক নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া পরমাত্মার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে।

যুবক। জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি সম্যক বুঝিলাম না।

স্বামী। জ্যোতিঃ অর্থে প্রভা বা তেজ, সেই তেজ স্মরণ করিতে করিতে জীবের মায়িক বন্ধন বিদূরিত হইয়া পরমাত্মা লাভ ঘটে।

যুবক। পরমাত্মার স্বরূপ কি কেবল জ্যোতিঃ মাত্র। হিন্দুশাস্ত্রে ভগবানের দ্বিভূজ চতুর্ভূজ মূর্ত্তি সকল বর্ণিত হইয়াছে তাহা কি ভুল?

স্বামী। সে সমস্তই মূর্খের কল্পিত বর্ণনা। পরব্রহ্ম হস্তপদ বিশিষ্ট জীবাকৃতি নহেন।

যুবক। যিনি হস্তপদ প্রভৃতি দিয়া সুন্দর জীব সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কেবল তেজময় হস্তপদ শূন্য কথাটা বোধগম্য হইতেছে না।

স্বামীজি সহাস্যে কহিলেন "পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি এখনও বালক মাত্র পবিত্র যোগধর্ম্মের অধিকার জন্মাইতে এখনও বিলম্ব আছে।"

যুবক কিঞ্চিৎ ভীতিব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "অজ্ঞ আমরা আপনার কৃপা লাভ করিতে পারিলেই এ রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিব, অনুগ্রহপূর্ব্বক এক্ষণে ব্রহ্মের স্বরূপটি বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হই।"

স্বামীজি মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন "পাগল! ব্রহ্মের স্বরূপ ভাষায় বর্ণন করা যায় না। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বেশ একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এই যে "সর্ব্ব দেবতা উচ্ছিষ্ট হইয়াছেন কিন্তু ব্রহ্ম এখনও উচ্ছিষ্ট হন নাই" অর্থাৎ অন্য দেবতার মুখের ভাষায় স্বরূপ নিরূপিত করিতে পারা যায়, মুখোচ্চারিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে উচ্ছিষ্ট বলা হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্ম যে কি বস্তু তাহা বুঝান যায় না সুতরাং তিনি উচ্ছিষ্ট হন নাই। ব্রহ্ম হৃদয়ের বস্তু।

যুবক আর কিছু না বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই যুবক আমাদের পরিচিত প্রভাস। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত দম্পতী যুগল ইহারাই পতিপত্নী।

ক্রমশঃ।

গীত।

"জয় মা ভারতেশ্বরী" গাওরে ভারতীগণ।
যাঁর শিক্ষা কৃপা বলে, ভারত মরম তলে,
ফুটেছে বিজ্ঞান জ্ঞান গুণ অতুলন।
(সুখে আজি তাঁর জয় গাওরে জগত জন)
প্রজার মঙ্গল তরে, সদা প্রাণ পণ ক'রে,
করিছেন মা মোদের কত আয়োজন।
(ভারত গৌরব ভরা তাঁহারি কারণ)
উদার সরল প্রাণ, নাহিক স্বার্থের টান,
প্রজার সুখের তরে ঢালা সদা প্রাণ মন।
নাহিক অশান্তি ভোগ, পুরেছে সকল ক্ষোভ,
তখনি পেতেছি তাই যা হ'তেছে প্রয়োজন।
আমাদের মহারাণী, রূপে লক্ষ্মী গুণে রাণী,
রামরাজ্যে ত্রেতা যুগে ছিল যথা প্রজাগণ,
আমরা ভারতবুকে, তেমনি র'য়েছি সুখে,
(কোন ব্যথা নাই প্রাণে)
প্রীতির সুধায় ভরা ভারত জীবন।
মা মোদের সিন্ধু পারে, আমরা অনেক দূরে,
তবু যেন কাছাকাছি নিতি পাই দরশন।
(তাঁর সে স্নেহের ভাতি মরি কিবা অতুলন)
আজি তাঁর আশিবর্ষ, ভারতে অতুল হর্ষ,
আনন্দে উঠেছে মাতি ভারতের প্রাণ মন।
দলাদলি দূর ক'রে, আজি সবে সমস্বরে,—
গাও তাঁর যশোগীতি মিলিয়া ভারত জন।
এমন সুদিন কবে, আর বা ভারতে হবে,
সুখে এ আনন্দ-গীতি গাও রাজ ভক্তগণ।
বিংশ কোটি নরনারী, যাঁর রাজ্যে বাস করি,

সুখসিন্ধু মাঝে নিতি হইতেছে নিমগণ,—
(গাও তাঁর গীতি আজি মিলি ভ্রাতা ভগ্নীগণ)
আজি যে আনন্দে চিত, হইতেছে তরঙ্গিত,
প্রাণের ভাষায় তাহা কর তাঁরে নিবেদন।
(গাও রে মঙ্গলগীতি থেক না ক অচেতন)
চাও হে মঙ্গল তাঁর, বিভুপদে অনিবার,
দীর্ঘ আয়ু পুণ্য যশ করিয়া অর্জ্জন,
সুখ শান্তি প্রীতি সহ, প্রজাহিতে অহরহ,
এমনি অর্পিত যেন রহে তাঁর প্রাণ মন।
প্রেম ভক্তি মাখি, এস ভাই বোন সবে,
"ভারতেশ্বরীর জয়" কর সঙ্কীর্ত্তণ।
আজি এ সুখের দিনে, সাজে কি আনন্দ বিনে,
"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই সাজে কি কখন!
পরিয়া একতামালা, ভুলে হিংসা দ্বেষ জ্বালা,
"ভারতেশ্বরীর জয়" গাও সুখে ভ্রাতৃগণ।*

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

যজ্ঞ।

(২)

দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা যায় তাহাকে দেব-যজ্ঞ বলে। বেদে দেব যজ্ঞের বিধি আছে।

যেমন মনুষ্য শৈশব, কৌমার, যৌবন ইত্যাদি অবস্থায় ক্রমশিক্ষা ও ক্রমউন্নতি লাভ করে, সেইরূপ মনুষ্য জাতিও পর পর অবস্থায় বুদ্ধির ক্রম-বিকাশ লাভ করে।

যেমন মনুষ্য একজন্মে স্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অসভ্য জাতি একেবারে সভ্য হইতে পারে না।

যেমন মনুষ্য এক দেহ ত্যাগ করিয়া, অন্য দেহ ধারণ করে, এবং দেহ ও দেহগত উপাধির পরিবর্ত্তন দ্বারা উন্নতির প্রবাহে নীয়মান হয়, সেইরূপ

*শ্রদ্ধেয়া শ্রীল শ্রীযুক্তা ভারতেশ্বরীর আশী বৎসর বয়ঃক্রম উপলক্ষে লিখিত। লেখিকা—

এক মনুষ্যজাতি বিলুপ্ত হইয়া অন্য মনুষ্যজাতিতে পরিণত হয়, এবং জাতির পরিবর্ত্তন দ্বারা সভ্যতার পদবী অনুসরণ করে। কত অসভ্য জাতি ক্রমশঃ আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। আবার তাহারা নূতন নামে আবির্ভূত হইয়া নূতন উদ্যমে নবীন অনুরাগে উন্নতির পথে ধাবমান হইবে।

যে সময়ে কোন জাতি পশুভাব ত্যাগ করিয়া দেব ভাব অবলম্বনের উপযোগী হয়, সেই সময়ে সেই জাতির উপদেষ্টা ঋষি সকল, সেই জাতির জন্য সনাতন বেদের আবিষ্কার করেন।

বেদের ধ্বনি অনাদি ও নিত্য। এই আবহমান পরিবর্ত্তনশীল সংসার কেবল বেদ দ্বারা চালিত হইতেছে। বেদের ধ্বনি সর্ব্বদাই উচ্চারিত হইতেছে। সমগ্র ধর্ম্মই বেদ, সমগ্র জ্ঞান বেদ প্রসূত। মনুষ্য উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। এই জন্য মনুষ্যের জ্ঞান সসীম। মনুষ্য একবারে সমগ্র বিশ্ব জানিতে পারে না। এই জন্য যে ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কার্য্য প্রতিনিয়ত অনাদি ও অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে, তাহার কিছুই জানিতে পারে না। যে ধর্ম্ম বলে সংসার মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র নহে, কি দেব, কি মনুষ্য, কি কীট, কি পতঙ্গ, সকলেরই আপন আপন কর্ম্ম আছে, যে ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া জীব কেবল মাত্র দুঃখভাগী হয়, এবং যে ধর্ম্ম অনুসরণ করিলে, উন্নতির পথ অবাধে উন্মুক্ত হয়, যে ধর্ম্মের অপর নাম যজ্ঞ, কেবল একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সেই ধর্ম্মের সম্যক্ বেত্তা।

ঋষিগণ আপন আপন শক্তি অনুসারে সেই ধর্ম্ম অনুভব করিয়া প্রচার করেন। শিষ্য পরম্পরায় এই ধর্ম্মশিক্ষা বেদ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বেদের ভাষা ঋষি প্রণীত ও ঋষি কথিত। বেদের জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত। বেদ অলৌকিক ও ঈশ্বর প্রাপ্ত।

আপৌদেব।

নহি বেদঃ পুরুষনির্ম্মিতঃ। বেদস্যাধ্যয়নং সর্ব্বং গুর্ব্বধ্যয়ন পূর্ব্বকং বেদাধ্যয়ন সামান্যা দধুনাধ্যয়নং যথেত্যাদিনা বেদাপৌরুষেয়ত্বস্য সাধিতত্বাৎ যঃ কল্পঃ স কল্পপূর্ব্ব ইতি ন্যায়েন সংসারস্যা নাদিত্বাদীশ্বরস্য চ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরো গতকল্পীয়ং বেদ অস্মিন্ কল্পে স্মৃত্বা উপদিশতি ইত্যেতাবতৈরোপ পত্তৌ প্রমাণাগুরেণ অর্থ যুপলভ্য রচিতত্ব কল্পনানুপপত্তেশ্চ ততশ্চ পুরুষাভাবাচ্ছব্দ নিষ্টৈব সা অতএব শব্দি। ভাবনা ইতি ব্যপদিশন্তি।" আপোদেব।

কোন মনুষ্য বেদ রচনা করে নাই। প্রসিদ্ধ আছে যে বেদ কেবল গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াই অধ্যয়ন করা হয়। এইরূপ অধ্যয়নের প্রথা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। যদি কোন মনুষ্য দ্বারা বেদ রচিত হইত, তাহা হইলে কেবল মাত্র গুরুমুখ দ্বারা বেদ অধ্যয়নের প্রথা প্রচলিত থাকিত না। বেদ যদি অপৌরুষেয়, তাহা হইলে বেদের প্রচার কিরূপে হইল। কল্পের প্রথমে যখন জীব সৃষ্টি হইল, তখন সেই জীব বেদ কিরূপে জানিতে পারিল। যখন আমরা কল্প এই কথা বলিতেছি, তখন ইহার পূর্ব্বে অন্য কল্প ছিল। তাহার পূর্ব্বে আবার অন্য কল্প ছিল। এই জন্য সংসার অনাদি। অনাদি-কাল হইতে সৃষ্টির প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। যিনি কল্পের ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সেই ঈশ্বর পূর্ব্ব কল্প প্রচলিত বেদ স্মরণ করিয়া শিষ্য পরম্পরায় ঐ বেদ প্রচলিত করেন। আর ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, যে বেদের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া অন্য শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, কিন্তু বেদ স্বতঃ সিদ্ধ। বেদের অন্য প্রমাণ নাই। এই জন্য বেদ অপৌরুষেয়।

পূর্ব্ব কল্পীয় জীবন্মুক্ত ঋষিগণ বর্ত্তমান কল্পের উপকার সাধনার্থ ঈশ্বরের নিকট বেদ গ্রহণ করেন এবং অধিকারী শিষ্যদিগের মধ্যে সেই বেদ প্রচারিত করেন। কিন্তু সকল কালের সকল অধিকারী সমান হয় না। কেহ বেদের অংশ গ্রহণ করে, কেহ সেই অংশ অসম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। কালের গতি অনুসারে সেই বেদ লুপ্ত হয়। কলির অধিকারে মনুষ্য কামনা কলুষিত ও ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া ধর্ম্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত হয় এবং যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেদের স্থান অধিকার করে। বেদের অধ্যয়ন তখন লুপ্ত হয়। কাযে কাযে বেদও লুপ্ত হয়। আবার যখন সত্যযুগের আবির্ভাবে মনুষ্যের চিত্ত স্বচ্ছ হইতে আরম্ভ হয়, তখন বেদের পুনঃ প্রচার আবশ্যক হয়। তখন ঋষিগণ তপঃ প্রভাবে কালগ্রস্ত শ্রুতি সকল মনোমধ্যে দর্শন করেন এবং যথা-সাধ্য সেই সকল শ্রুতির প্রকাশ করেন।

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

ভাগবত পুরাণ ৮-১৪-৪

আমাদের এই বরাহ কল্পে সপ্তবিংশতি মহাযুগ বিগত হইয়াছে। এই অষ্টাবিংশতি মহাযুগে ত্রেতার আরম্ভে আমরা যাহাকে বেদ বলিয়া জানি, তাহাই

প্রকাশিত হইয়াছে। যে ঋষি যে শ্রুতি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পরম্পরা জ্ঞানে সকলেই অবগত আছেন।

সত্যযুগে কর্ম্মবিভাগের আবশ্যকতা ছিল না। তখন বর্ণের ভেদ ছিল না। সকলেই নারায়ণের ধ্যান পরায়ণ ছিলেন। এক মাত্র প্রণবের উচ্চারণ সত্ব প্রধান মনুষ্যের বেদ ছিল। প্রণবের জ্ঞান ও প্রণব উচ্চারণ দ্বারা নারায়ণের ধ্যান—সকল মনুষ্যেরই এই এক ধর্ম্ম ছিল। ক্রমে রজোগুণের আবির্ভাবে মনুষ্য বিভিন্ন প্রকৃতি হইতে আরম্ভ হইল।

রাজা পুররবা উর্ব্বশীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বনমধ্যে অগ্নিস্থালী স্থাপন করিয়া নিত্য উর্ব্বশীর চিন্তা করিতেন। সেই নিত্যধ্যান প্রযুক্ত তাঁহার মনোমধ্যে কর্ম্মবোধক ত্রয়ীবেদের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি এব্যবর্ত্তত। ভাঃ পুঃ ৯-১৪-৪৩

ত্রেতাযুগের আবির্ভাবে পুরূরবার মনোমধ্যে ত্রয়ীবেদের আবির্ভাব হইয়াছিল। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের প্রচার হইয়াছিল।

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্যঃ একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ৯-১৪-৪৮
পুরূরবস একসীৎ ত্রয়ী ত্রেতাযুগে নৃপ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমযিবান্॥ ৯-১৪-৪৯

সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল। নারায়ণই একমাত্র দেবতা, লৌকিক অগ্নিই একমাত্র অগ্নি এবং হংসই একমাত্র বর্ণ। ত্রেতার আরম্ভে রাজা পুরূরবা হইতে ত্রয়ীবেদের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি অগ্নি দ্বারা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীধর স্বামী বলেন "অয়ং ভাবঃ কৃতযুগে সত্বপ্রধানাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বেঽপি-ধ্যাননিষ্ঠাঃ। রজঃপ্রধানে তু ত্রেতাযুগে বেদাদিবিভাগেন কর্ম্মমার্গ প্রকটেব বভূব।" তাৎপর্য্য এই যে সত্যযুগে মনুষ্য সত্বপ্রধান। তখন প্রায় সকলে ধ্যান নিষ্ঠ। রজঃ প্রধান ত্রেতাযুগে বেদাদি বিভাগ দ্বারা কর্ম্মমার্গ প্রকটিত হইয়াছিল।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ে বিশ্বামিত্র আদি ঋষিগণ কিরূপে বেদের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণে বর্ণিত আছে। দ্বাপরের শেষে ভগবান্ বেদব্যাস দেখিলেন, যে কেবল কর্ম্মকাণ্ড লইয়া মনুষ্য কর্ম্মপরায়ণ হইবে। তিনি কর্ম্ম-

কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই কাণ্ডের ভেদ করিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় মনুষ্য কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বন করিল।

এখন আমরা কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই বৈদিক যজ্ঞের বিচার করিব।

বেদের সম্বন্ধে আমাদের এত ভ্রমজ্ঞান আছে, যে সেই ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য এই প্রবন্ধে কিয়দংশ চেষ্টা করা গেল। সেই জন্য মূল প্রবন্ধের বিষয় ইহাতে অল্পমাত্রই থাকিল। কিন্তু যজ্ঞ জানিবার জন্য বেদের যথার্থ তত্ত্ব জানা আবশ্যক। বেদের জ্ঞানই যজ্ঞের জ্ঞান। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ডকেই আমরা বেদ বলিয়া অধিকতররূপে জানি। এবং দেব-যজ্ঞই আমাদের ভ্রমজ্ঞান বশতঃ একমাত্র যজ্ঞ।

দেশ কাল পাত্র অনুসারে বেদের প্রচার হইয়া থাকে। এবং বৈখরী বাণী দ্বারা সেই বেদ প্রকাশিত হয়। যে বাণীর জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ হয়, সেই বাণীই "বৈখরী" বাণী। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে, আমরা মনে মনে সেই বাণীর উচ্চারণ করি। তাহাই আমাদের "মধ্যমা" বাণী। উচ্চারণ শূন্য মনের অনুভবই "পশ্যন্তী" বাণী। এবং সকল অনুভবের মূল, শুদ্ধ, উপাধি শূন্য পরম ও চরম বাণীর নাম "পরা"।

পরা বাণীর স্থান আধার চক্রে বেদ যথার্থরূপে অনুভূত হয়। মণিপুর ও বিশুদ্ধি চক্রে পশ্যন্তী ও মধ্যমারূপে বেদের মনোময় অনুভব হয়। বৈখরী বাণীতে বেদের যে প্রকাশ হয়, তাহা স্থূল প্রকাশ।

চত্বারি বাক্ পরিমিতানি পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। শ্রুতিঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

পন্থা, ফাল্গুন। ইহাতে এই বিষয়গুলি আছে—মা, চণ্ডীদাস (পদ্য), চতুর্ব্যূহ উপাসনা, স্বপ্নে দীক্ষা (ক্রমশ চলিতেছে), পৌরাণিক কথা, প্রাচীন শিক্ষার আধুনিক চেষ্টা, দোল-সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা। 'মা' প্রবন্ধ হইতে খানিকটা পাঠক মহাশয়কে দেখাইবার প্রয়োজন, নহিলে তিনি আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন না। 'মা' মন্ত্রকে শক্তিহীন করিও না। যাঁহাকে একবার 'মা' বলিয়া ডাকিবে তাঁহার সহিত রমণেচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে, হিন্দু সমাজের এই শিক্ষা কুসংস্কার মনে করিও না।

এত গেল সমাজের কথা; বাহিরের কথা। ভিতরের কথা দুটা এইখানে বলি। সাধক, যদি মা আনন্দময়ীকে চাও তবে নিজের ইন্দ্রিয়গুলাকে কদাচ বিশ্বাস করিও না; তাহারা দিনকতক তোমার অধীনে থাকিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিবে যে তুমি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হইয়াছ; আর যাই তোমার ঐ অহঙ্কারটুকু উপস্থিত হইবে, তখন উহারা ছদ্মবেশী কামকে ডাকিয়া আনিয়া তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তোমার নিজের ক্ষমতায় সে শত্রুকে সংহার করিতে পারিবে না সুতরাং প্রথম হইতেই একখানি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখ। "মা" নাম সেই অস্ত্র। এই অস্ত্র দেখিলেই শত্রুগণ ভয়ে পলাইবে।

মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা। কুণ্ডলী সূত্রে গ্রথিত মালার অনুলোমে ৪, ৬, ১০, ১২, ১৬, ২ ক্রমে মা নাম জপ; আবার বিলোমে জপ, মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা। দুই ষোল বার দশ ছয় চারি। সাবধান সাবধান যেন মাতৃযোনি লঙ্ঘন না হয় জপ জনিত সমস্ত তেজ নষ্ট হইবে। মহা অন্ধকার মধ্যে যে আলোটুকু খুঁজিতেছ তাহা পাইবে না।

মাতৃযোনি বা আত্মযোনি কি তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। যাহা শুনিয়াছি তাহারই দুই এক কথা বলি। শক্তির উদ্ভব ও লয় স্থানের নাম মাতৃযোনি। এই শক্তি অর্থ কুণ্ডলিনী শক্তি। শিবলিঙ্গ যে যোনিপীঠ

উপরে আছেন উঁহার উত্তরাগ্রভাগ মাতৃযোনি দ্বার। ইহার অপর নাম মেরু। ইহা জপের মালা থুবনী। এই মাতৃযোনি বা মেরু কদাচ লঙ্ঘন করিও না। ইহা স্বরের বিরাম স্থল। প্রণবধ্বনি এই স্থল হইতে উদ্ভূত হইয়া এই স্থলেই লয় হয়। এই লয় স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আনন্দ স্রোত স্বরূপ প্রণবধ্বনি শুনিতে থাক এবং গুরুকে বল তিনি ডমরু বাজাইয়া তাল দিতে থাকুন। তা হলে কি আনন্দময়ী মা আর লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন। মা স্নেহ দানে সংসারের সব জ্বালা ঘুচাইয়া দিবেন।

এই শিবলিঙ্গ ও যোনি পীঠ চিদাকাশে আছেন। নিজের হৃদয় মধ্যে উহা খুজিয়া লও। আবার মাথার মধ্যে খুজিয়া লও। আবার চক্রে চক্রে খুজিয়া লও।

মাথার মধ্যে তালু মূলের উপর মাথার যে অস্থি আছে যাহাকে সেলাটর্সিকা বলে, উহার উপর পিটুটারী বডি বল্লে একটি পদার্থ আছে; জপন দ্বারা তন্নিহিত তেজের প্রসারণ হইলে ঐ তেজ পিনিয়াল গ্লাণ্ড নামক একটি যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। তখন সাধক দিব্য নেত্র লাভ করিয়া লিঙ্গযোনি দর্শনে কৃতার্থ হন। মাথার মধ্যের পন্স ভ্যারোলি শিবলিঙ্গের স্থূল প্রতিমা। এই পন্স ভ্যারোলির উপর গোল গোল মাদুলির মত চারিটি জিনিষ আছে, ইহাদের বলে করপসা কয়াড্রা জেমিনা। উহাদের সুমুখ দিগের দুটির উপরে ঐ পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডটি আছে। এই পাঁচটি বুঝি শিবলিঙ্গ প্রতিমার ৫টি মুখ। জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে পাঁচটি নক্ষত্র লইয়া রাধা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্র হইয়াছে। Corposa quadra gemina ও Penial gland এই পাঁচটি বুঝি সেই পাঁচটি নক্ষত্রের স্থূল প্রতিমা। হাঃ হাঃ হাঃ আমার শিব আমার রাধা। মা আমার কৃষ্ণ। বল হরি হরি হরিবোল। আমি যখন রাধা হব মা তখন কৃষ্ণ হবেন তখন দুজনে স্বামী স্ত্রী ভাবে দাঁড়াব। মধুর ভাবে সাধনা ইহার পূর্ব্বে নহে। আগে "মা" বলা চাই তার পর ফুল ফুটলে রাধাকৃষ্ণ বলিতে হয়। যিনি ঊর্দ্ধলিঙ্গ, যিনি অনঙ্গবিজয়ী তিনি ভিন্ন অন্য কেহ স্ত্রী ও জননী শব্দ এক আধারে প্রয়োগ করিতে অধিকারী নহেন। ওঁ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণধন বাবুর এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি ও সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার গুরুর বিনা আদেশে এ কথা

কালি কলমে লিখিয়া ছাপাইতেছেন, একথা মনেও করিতে পারি না কেন না তাহা হইলে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে বিদ্যা গুহ্যাতিগুহ্য, যাহা চিরকাল গুরুমুখী, শাস্ত্র যাহা চাপা দিয়া গুরুর নিকট শিখিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার এরূপ প্রকাশ দেখিয়া আমরা অস্থির হইয়াছি। মা জগদম্বার কিরূপ ইচ্ছা বলিতে পারি না—তাহা তিনিই জানেন।

পন্থার অপর প্রবন্ধগুলির মধ্যে চতুর্ব্যূহ উপাসনাই উল্লেখযোগ্য। "প্রাচীন শিক্ষার আধুনিক চেষ্টা" নামটা কিছু ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। ইহার অর্থ আনি বিশান্তার বারাণসীর কালেজ। পন্থা একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা হইয়াছে। রাম দত্তের দোল-সঙ্গীতও বেশ।

দোল-সঙ্গীত।

ভৈরবী। একতালা।

কিবা দুলিছে ভুবন মোহন। দ্বাদশ দল কমলদোলায় কমলিনীসনে কমল নয়ন।
প্রেম পবনে দোলাইছে দোলা, দেখরে মানস অপরূপ লীলা,
(যেন) অচলা চপলা কোলে করি করে খেলা নবীন নীরদ প্রেমে নিমগন।
দ্বিদলে ত্রিবেণী মহাতীর্থধামে, শশাঙ্ক শেখর গৌরী লয়ে বামে,
নিরখি নয়নে সেই রাধা শ্যামে, আনন্দ সলিলে ভাসে অনুক্ষণ;
প্রেমাবেশে দিগম্বর দিগম্বরী, নাচিছে বলিছে হরি হরি হরি,
শ্রীরাধে গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী জয় যদুপতি লক্ষ্মী নারায়ণ।
মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মোপরে, সাপিনি নিদ্রিতা ছিল নত শিরে,
দোলের গোলেতে জাগরি শিহরে, ঊর্দ্ধমুখে প্রেমে করে নিরীক্ষণ;
দীনরাম বলে, পূর্ণিমার দিনে, যতনে গোপনে অন্তর নয়নে,
হেরিলে এ দোল জনম মরণে, অনাসে জিনিতে পারে সর্ব্বজন॥

পন্থা, চৈত্র। এবারকার বিষয়গুলি এই—আদর্শ দর্শনে (পদ্য); সাধক প্রার্থনা (পদ্য); মুক্তি ও মুক্ত; নির্ব্বাণ ও কৃষ্ণসেবা; জ্ঞান ও ভক্তি; স্বপ্নে দীক্ষা; পূর্ব্বস্মৃতি; উত্তরাখণ্ডে। স্বপ্নে দীক্ষা প্রবন্ধেও অনেক গুহ্য কথা প্রকাশ হইতেছে। "মানব যখন ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, তখনই লিঙ্গরূপী মহাপুরুষগণের মুখনিঃসৃত ব্রহ্মতেজ অর্থাৎ মন্ত্রবীজ গ্রহণ করিবার অধিকারী হয়েন।" আবার "উচ্চ পর্ব্বতনিঃসৃত নির্ঝরের ন্যায় মহাপুরুষগণের কৃপাবারি প্রবাহিত হইতেছে; যিনি উহা ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন তিনি

হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া রাখুন, তাহা হইলেই ধরিতে পারিবেন। হৃদয় যখন জগতের মঙ্গল জন্য কাঁদে, স্বার্থভাব যখন হৃদয় হইতে অপসারিত হয় তখনই হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে বুঝিও। * * হৃদয়ের মধ্যে অহঙ্কার নামে একটি সুবৃহৎ বৃক্ষ আছে; উহাই হৃদয়ের সমস্ত ভূমি অধিকার করিয়া রাখিয়াছে; এই গাছটি সমূলে উপড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই হৃদয়ভূমি গুরুকৃপাবারি ধারণের উপযুক্ত গহ্বরে পরিণত হইবে।"

হিন্দুপত্রিকা, ফাল্গুণ। বিষয়গুলি এই—সম্পাদকীয় লাঞ্ছনা, আমিত্বের প্রসার, জীবনীশক্তি, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, গীতাভাস, গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। প্রথম প্রস্তাবে সম্পাদক গ্রাহকগণের ব্যবহারে অর্থাৎ পত্রিকা লইয়া মূল্য না দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অমিত্বের প্রসারের তিনটি শত্রু কাম, ক্রোধ, লোভ। "জীবনীশক্তি"র স্থান কেন হিন্দু পত্রিকায় হইল বুঝিতে পারিলাম না। "গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন" প্রবন্ধে দেখান হইতেছে, জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি। "তোমার শিরোপরে, তারকময় ধনুকাকৃতি যে নক্ষত্র দেখিতেছ, উহার নাম পুনর্ব্বসু। ঐ বসু নক্ষত্র বা বসুদেবের ক্রোড়ে ঐ দৈবকী বিরাজিত। ঐ বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্তে যে বিন্দু দেখিতেছ, ঐ বিন্দুর নাম কর্কট ক্রান্তি, ঐ বিন্দু উত্তরায়ণের চরম সীমান্তে অবস্থিত। ঐ বিন্দু স্পর্শ হইলে সূর্য্যদেবের অয়ন গতির শেষ হয়। এবং ঐ বিন্দুতে নববর্ষের বালার্ক উদয় হয়। ঐ বিন্দু বালকৃষ্ণের জন্মস্থান। অতএব কর্কট ক্রান্তিতে, বসুদেবের গৃহে, দৈবকীর অঙ্কে আদিদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। কল্পনা নহে। নবছুর্ব্বাদলশ্যাম (Castor star অর্থাৎ বিষ্ণুনামক পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের ষট তারকের সর্ব্বোত্তরস্থ তারকা) তোমার সম্মুখে জাজ্বল্যমান।" লেখক কালীনাথ মুখোপাধ্যায় কেবল মাত্র একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে অনভিজ্ঞ পাঠকের হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাস আসিতে পারে। কথাটা খুলিয়া বলা উচিত ছিল। আমরা পূর্ণিমাতে অনেক দিন হইল এই কথা বলিয়াছি। ১৩০৪ সালের আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় ভূমিকম্প প্রবন্ধে (১১৪ পৃঃ) এই কথা বলা হইয়াছে। "উত্তানপাদের ঔরসে, সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম। ধ্রুব ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন পাইয়াছিলেন, ধ্রুবলোকে বাস করিতেছেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—ইহারা ধ্রুবকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করেন, ইত্যাদি কথার তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়।"

১। পৌরাণিক বা আধিদৈবিক। এই ব্যাখ্যায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বুঝেন যে পুরাকালে বাস্তবিকই ধ্রুব নামে এক মহাশয় জন্ম-গ্রহণ করেন, তিনি সত্য সত্যই ভক্তি বলে দেবতার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করেন এবং এখনও ধ্রুবলোকে বাস করিতেছেন। ঋষিরা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতার্থ হন।

২। দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক। উত্তানপাদ-কিনা কঠোর তপশ্চর্য্যা। সুনীতি কিনা উত্তম নীতি অর্থাৎ তপস্যা ও নীতি হইতে—কি না যম নিয়ম ইত্যাদি হইতে—ধ্রুব, কি না, নিষ্ঠা যোগের উৎপত্তি হয়। সেই যোগে সমাধি লাভ করা যায়।

৩। আধিভৌতিক বা জড়বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। ভারতবর্ষ বিশেষত আর্য্যাবর্ত্ত বিষুবরেখার অনেক উত্তরে, সেই জন্য মেরু রেখা বা পৃথিবীর অক্ষ রেখা (Axis of the Earth) উত্তানপাদ বলিয়া মনে হয়; এই উত্তান-পাদ অক্ষরেখা যেখানে খগোল স্পর্শ করে, সেইখানকার নক্ষত্রটি স্থির বা ধ্রুব বলিয়াই বোধ হয়। মরীচি অত্রি অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডল এই উত্তর মেরুগত ধ্রুবকে কাযেই প্রত্যহ পরিবেষ্টন করে।

যিনি ধ্রুবোপাখ্যান শুনিয়া ঐ তিন প্রকার ব্যাখ্যাই সমানভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, যিনি না পারেন, তিনি প্রকৃত হিন্দু নহেন। যিনি কোন একটিতে বা দুইটিতে বিশ্বাস করিয়া অপর ব্যাখ্যায় বা অন্য দুইটি ব্যাখ্যায় উপহাস করেন, তিনি পাষণ্ড।

সেইরূপ সূর্য্য দেবতা—পুত্র যম, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কর্ণ। যদ্দ্বারা বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরিত বা পরিচালিত হয় তিনিও সূর্য্য বা সবিতা, তিনি আধ্যাত্মিক জগতের কর্ত্তা। আবার ঐ জলন্ত জড়পিণ্ড হীরার থালার ন্যায় ধ্বক্ ধ্বক্ ঝক্ মক্ ঝক্ মক্ করিতেছে, উনিও সূর্য্য, এই জড় জগতের তাপদাতা, গতিশক্তি বিধাতা। জড় সূর্য্য, আধ্যাত্মিক সূর্য্য, দেবতা সূর্য্য—এক সূর্য্যে আমরা তিন সূর্য্যই বিশ্বাস করি। ইহারই নাম হিন্দুর প্রকৃত বিশ্বাস।

ঋষি, বৈশাখ। বিষয়গুলি এই—পতি-দেবতা, আদর্শ, মদন-গোপাল, লক্ষ টাকার কথা, দ্রব্যগুণ বিচার, বিদুর পত্নী ও শ্রীকৃষ্ণ, পাত্র ও পাত্রী।

ঋষি ক্রমশই ভাল হইতেছে। প্রবন্ধগুলি বেশ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ডে শ্রীমতী রাধা রাণী স্বয়ং আদর্শ পতির কথা বলিয়াছেন। মদন-

গোপাল—দেবতাভক্তির কথা। সময় বুঝিয়া ঋষি পাকা আমের গুণাগুণ দিয়াছেন। আমরা একটু তুলিয়া দিলাম। কেবল যে ঋষির পাঠক দুধের বাটী ও আমের টুক্‌রি কাছে লইয়া ঋষি পড়িবেন আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না।

পক্কাম্রের রস—মধুর; কষায়ানুরস অর্থাৎ ঈষৎ কষায় রসের আমেজও আছে; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বায়ুনাশক, হৃদ্য (সুস্থ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের বলদায়ক), অপিত্তল অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক নহে, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, শুক্রবৃদ্ধিকর। প্রভাব—বর্ণপ্রসাদক (আমের সময় সুমিষ্ট আম্র প্রতিদিন খাইলে, কিয়দ্দিন পরে রং ফরসা হয়, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়), বহ্নি বর্দ্ধক।

আম গাছপাকা হইলে তাহা গুরু, অত্যন্ত বাতহর, মধুরাম্ল এবং কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

আম কৃত্রিমপক্ক অর্থাৎ কৌশলে পাকান হইলে তাহা পিত্তনাশক হয়।

গাছ-পাকা আম উষিত অর্থাৎ বাসী করিয়া লইলে, উহা অম্লরসের হ্রাস ও মাধুর্য্য বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত রুচিকর, বলবর্দ্ধক, বীর্য্যকর, লঘু, শীতল, শীঘ্র-পাকি, বাতপিত্তঘ্ন ও সারক হইয়া থাকে।

তদ্রসো গালিতো বল্যোঽগুরু র্বাতহরঃ সরঃ।
অহৃদ্য স্তর্পণোঽতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ॥

পক্ক আম্রের গালিত রস বলকর, গুরু, বাতহর, সারক, পূর্ব্বোক্তবৎ হৃৎপিণ্ডে উপকারী নহে, অতীব তৃপ্তিকর, শরীরের স্থূলতা সম্পাদক, এবং কফবর্দ্ধক।

স চ দুগ্ধেন সংযুক্তঃ কান্তিদঃ স্বাদদঃ স্মৃতঃ।
বৃষ্য শ্চান্যে গুণা শ্চোক্তা রসেন সদৃশাঃ স্মৃতাঃ॥

আমের রস দুগ্ধ-সংযুক্ত হইলে, দেহকান্তি বর্দ্ধক, স্বাদপ্রদ অর্থাৎ অন্নাদিতে রুচি জনক, রতিশক্তি বর্দ্ধক, পূর্ব্বোক্ত পক্কাম্রের সমস্ত গুণযুক্ত এবং অতি মধুর হইয়া থাকে।

চোষিতাম্রং বল-রুচি-বীর্য্য-বৃদ্ধিকরং পরং।
শীতলং শীঘ্রপাকি চ গ্রাহি চ বাতপিত্তনুৎ॥

চুষিয়া ভক্ষণে আম্র অত্যন্ত বল রুচি ও বীর্য্য বৃদ্ধিকর, শীতল, লঘুপাক, ঈষদ্-ধারক ও বাতপিত্তনাশক হয়।

স্বাস্থ্য, ফাল্গুণ। এবারকার স্বাস্থ্য আগাগোড়া প্লেগ। সাময়িক বটে, সুরাপানের অবৈধতা উপলক্ষে ওরেলডন্ সাহেব (লর্ড বিসপ) যে বক্তৃতা করেন তাহারও সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। ক্রমেই উন্নতি হইতেছে।

ঋষি, জ্যৈষ্ঠ। "বিশ্বাসের বল" নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

কোনও পবিত্রনামা পীঠ-স্থানে এক সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। দিগ্-দিগন্ত হইতে ছাত্রেরা আসিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যোগ ও মন্ত্রাদি শিক্ষা করিত। কোনও সময়ে এক নিরক্ষর গোপালক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব লাভের অভিলাষে সাতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রার্থনা করিল। গুরু কিছুতেই সেই শিক্ষালোলুপ মূর্খকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এমন নিবিড়-অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষাদান বড়ই দুষ্কর বুঝিয়া গুরুদেব শিষ্যকে জিজ্ঞাসিলেন—বৎস! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা এ জগতে কাহাকে ভালবাস?—কোন্ বিষয়ের চিন্তা তোমার মানসে সর্ব্বসময় উদিত হয়? শিষ্য বলিল "আমাদের একটা বড় দুর্দ্দান্ত মহিষ আছে, তাহারই কথা আমার মনে অহর্নিশ জাগরূগ"। তচ্ছ্রবণে গুরু বলিলেন, আচ্ছা তবে তোমার সেই মহিষটীকে মনে মনে ভাবিয়া এই মন্ত্র মনঃপ্রাণের সহিত জপ কর। শিষ্য উক্ত পদ্ধতি অনুসারে প্রতিদিন যথা সময়ে ধ্যানস্থ হইতে লাগিল। এইরূপ কিছুদিন যায়, একদিন বেলা উপস্থিত, অন্যান্য ছাত্রেরা আহার করিতে উদ্যুক্ত হইল; কিন্তু সেই মূর্খ আর উঠে না, শিষ্যদিগের পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও কথা কহে না, ক্রমে অধিক বেলা হইতে লাগিল। পাছে অনাহারে মরে এই আশঙ্কায় গুরু আসিয়া স্বয়ং ঐ শিষ্যটীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন বৎস! উঠ, আহার করগে। শিষ্য বলিল "গুরো উঠিতে পারিতেছি না; এই যে সেই মহিষ' প্রকাণ্ড দুটী শিং দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, আমাকে ছাড়াইয়া দিন্, নতুবা আমি নড়িতেও পারিতেছি না।" তখন গুরু বলিলেন—বৎস! তুমি ধন্য! তুমি মহিষরূপে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছ, তুমিই আমার যথার্থ শিষ্য। বলিহারি তোমার বিশ্বাসের বল! এ বলে তুমি তোমার গুরু অপেক্ষাও বলীয়ান্।

ভক্তিপরায়ণ মূঢ়বিশ্বাসী অজ্ঞব্যক্তি, সন্দিহান তর্ক নিপুণ পণ্ডিত অপেক্ষা কত সুখী! একজন ভক্তির অমৃত হ্রদে এক ডুবে অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পায়, অপর ব্যক্তি সন্দেহের অকূল উদ্বেগ সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া মারা যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে শিশুর অন্ধ আশু-বিশ্বাস চাই, প্রাপ্তবয়স্কের বিবেক-বিচারে কিছুমাত্র ফল হয় না। ভক্তিতে মিলয় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর!

ভারতী, ফাল্গুণ ও চৈত্র। এবারকার ভারতী সম্পূর্ণ সরস গাছপাকা

হিমসাগর কেবল বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম এবং পিশাচরূপ একটু আঠা লাগিয়া আছে। রবি ঠাকুর অস্তাচলচূড়াবলম্বী ভগবান মরীচিমালীর ন্যায় একবার মেঘমুক্ত নিজরশ্মিজালে নিসর্গসুন্দরীকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া, অভিমানে রাঙ্গা হইয়া, আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। অতি দুঃখের বিষয় যে তিনি ভারতীর সম্পাদকতা ত্যাগ করিলেন। আশা আছে ভগবান ভাস্করের ন্যায় তাঁহার উদয় অবশ্যম্ভাবী হইবে। "ভারতী" ত্যাগ তাঁহার পক্ষে কেবল মুখ-ভারতীতে পর্য্যবসিত হইবে। ভারতী ত্যাগ করিতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম।

মনে করিয়াছিলাম এই কথা বলিয়াই শেষ করিব কিন্তু তাহা হইলে নিতান্ত স্বার্থপরতা হয়—পাঠক মহাশয়কে সুখস্বাদে বঞ্চিত করা হয়। তাই দুই এক কথার প্রয়োজন। "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" (পদ্য) কল্পনা রাজ্যের একটি চিত্র। "নিমন্ত্রণ-সভা" পাঠ করিতে করিতে আমাদের বার বার 'গৃহকোণ' মনে পড়িতে লাগিল। প্রবন্ধ সফল হইয়াছে আশা করি গৃহিণীদের একটু সুদৃষ্টি পড়িবে, অন্নদা অন্নপূর্ণা নামের সার্থকতা যে তাঁদেরই হাতে। কিন্তু এবারকার প্রবন্ধ হইতেছে "গ্রাম্য সাহিত্য"। গ্রাম্য সাহিত্যে (ছড়া) হর-গৌরীর কথা আর রাধাকৃষ্ণের কথা আছে, বলিয়া, কবি ভাব বিশ্লেষণ করিতেছেন। স্থানাভাব বলিয়া কবির ওস্তাদী কত দেখাইবার জন্য প্রয়োজন মত প্রবন্ধ উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

"নরনারীর প্রেমের এই যে একটি মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তি বলে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে জগতের সমস্ত চন্দ্র সূর্য্য তারা পুষ্প কানন নদ নদীকে এক সূত্রে টানিয়া মধুরভাবে উজ্জ্বলভাবে আপনার চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া আনে, আপন আকস্মিক অনির্ব্বচনীয় আবির্ভাবের দ্বারা এতদিনকার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জীর্ণ উপেক্ষিত বিশ্বজগতকে চক্ষের পলকে সম্পূর্ণরূপ কৃতকৃতার্থ করিয়া তুলে, সেই শক্তিকে যুগে যুগে দেশে দেশে মনুষ্য অধ্যাত্মশক্তির রূপক বলিয়া অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছে। তাহার প্রমাণ সলোমন্, হাফেজ, এবং বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী। দুইটি মনুষ্যের প্রেমের মধ্যে এমন একটি বিরাট্ বিশ্বব্যাপকতা আছে যে আধ্যাত্মিক ভাবুকদের মনে হয়, সেই প্রেমের সম্পূর্ণ অর্থ সেই দুইটি মনুষ্যের মধ্যেই পর্য্যাপ্ত নহে; তাহা ইঙ্গিতে জগৎ ও জগদীশ্বরের মধ্যবর্ত্তী অনন্তকালের সম্বন্ধ ও অপরিসীম ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিতেছে।" নিজে ও কথা যিনি লিখিতে পারেন, তাঁহার প্রতিভা সর্ব্ববাদী সম্মত, এ

ভাব যার মূল ভাব, ইহা যিনি উপভোগ করিতে পারেন তিনি দেবতা। কিন্তু আমরা জানি হিন্দু মতে গুরুকরণ না হইলে (সদ্‌গুরু হওয়া চাই) এ ভাবের প্রকৃত উপভোগ হয় না। রবীন্দ্রনাথ অমর হোন।

"ডেলি প্যাসেঞ্জার" ও "মহারাষ্ট্র কথা" এক ধরণের। বেশ। ভারতীয় অপর প্রবন্ধগুলি সবই ভাল। বর্ষ শেষে—বর্ষের শেষ দিনে মধ্যে আকাশে ঝড়ের মেঘ দেখিয়া নানা কথায় কবি বলিতেছেন—

"যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখ মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তর!
শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ক কুণ্ড হতে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে!"

প্রকৃত হিন্দুর এ আশারও চরিতার্থতা হয়। সদ্‌গুরু তাহা করেন। মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের প্রাণ একদিন এমনি করিয়া কাঁদিয়াছিল, আর সকলেই জানেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপায় সে ক্রন্দন বিফল হয় নাই।

সাহিত্য, চৈত্র। কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার নভেল "ভানুমতী" শেষ করিয়াছেন। ইহার দুই এক ছত্রে সমালোচনা হইতে পারে না, সবিস্তার সমালোচনের ইহা স্থানও নয় সময়ও নয়। অথচ বলিবার অনেক কথা আছে। "মৌর্য্য সম্রাট অশোক"ও শেষ হইয়াছে, অশোকের লিপি অনুসারে এই ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। লিপিকুশল লেখকের পরিশ্রম সফল হইবে। গিরি লিপির ন্যায় ইহা স্থায়ী হইবে। "ভারতযুদ্ধকাল ও সপ্তর্ষির গতি" লেখা জটিল, মীমাংসাও ঠিক নহে। শেষে "বিশ্বাস" ও "অনুমান" ঠেকিয়াছে তাহাও য়ুরোপীয়দিগের ভ্রমের চর্ব্বিত চর্ব্বণ "উক্ত আদি কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া থাকিবেন; যেমন বর্ত্তমান কোন কোন বঙ্গ কবির কাব্য হইতে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অন্য আকার দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাস আদি যুদ্ধের কতখানি রাখিয়াছিলেন, কবি কল্পনায় কতখানি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করা অতীব দুরূহ।" ইহা ছেলেমানুষীর পিণ্ডাণ্ড পিণ্ড। অতীব দুরূহ ব্যাপারে

হাত দেওয়া ভাল হয় নাই। লেখক বলিতেছেন "ভারত যুদ্ধকাল দুইটি পাওয়া যায়, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী এবং ২২শ কি ২৩শ শতাব্দী। ইহার মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? আমাদের অনুমানে, যদি ভারতযুদ্ধ হইয়া থাকে, (বাহবা), তাহা শেষোক্ত সময়েই হইয়াছিল। সেই সময়ে, যে সময়ে বেদের কতিপয় মণ্ডল রচিত হইয়াছিল, বেদের না হইলেও যে সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল; ইত্যাদি।" একজনকে বয়স কত জিজ্ঞাসা করায় খপ্ করিয়া বলিয়াছিল 'তের কি বিরাশী'। আবার শুনিতেছি লেখকের 'এই প্রবন্ধের অনেক যুক্তি মৎপ্রণীত এবং সম্প্রতি যন্ত্রস্থ। "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইল; বস্তুত প্রবন্ধটি ঐ পুস্তকের অংশ বিশেষ"। সাধু সাবধান!

"মহারাষ্ট্র-সাহিত্য" শিক্ষা প্রণালীর আদর্শ, "সুবিচার সমাগম" পড়ে শ্রীযুক্ত বাসুদেব গোবিন্দ আপ্টে 'শিক্ষা পদ্ধতির আদর্শ' প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। য়ুরোপের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী যে প্রাচীন গ্রীক পদ্ধতির পরিণাম ফল তাহা এ প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়"। বর্ত্তমান লেখক তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। অনেক সংবাদ আছে। লেখক এক স্থানে বলিয়াছেন, গ্রীকগণ পারসীকগণের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন ও তাহাদের অনুকরণ করেন। পারসীকেরা যে আবার ভারতের হিন্দুদের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন, প্রবন্ধে সে কথা নাই। "সাক্ষীগোপাল"। 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'ভক্তমাল' অবলম্বনে শ্রীমতী অম্বজাসুন্দরী দাস গুপ্তা এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভক্ত ও ভক্তির কথা লেখা ভাল। তারপর 'সহযোগী সাহিত্যের' আদর। এবার 'কবি শেলি ও তাঁহার মৃত্যু' এবং 'কুশীনগরের অবিষ্কার', দুইই ভাল।

পুণ্য, অগ্রহায়ণ। শ্রেয়াংশি বহুবিঘ্নানি তাই বিলম্ব ধর্ত্তব্য নহে। 'জনষ্টুয়ার্ট মিল ও স্ত্রী স্বাধীনতা', নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস (সচিত্র)', 'প্রীতি ও স্বার্থপরতা' এই তিনটি প্রবন্ধ, খাদ্যপাকের মধ্যে নারিকেলের ছাঁচ, নিমকি, ডিমের মুলুক্তানি সুপ। গীতিকুঞ্জের কবিতা (ক) কি হয়েছে, (খ) ফাঁকি, (গ) যাও, (ঘ) মা, একটুতে এত (গল্প-ক্রমশ) আর শ্রাবণের পূর্ণিমার সমালোচনা। ইহা ছাড়া একটি রঙ্গিন গান (সাংখ্য স্বরলিপি) আছে। জনষ্টুয়ার্ট মিল ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়টি নূতন নহে। বাঙ্গালা মাসিক পত্রেই পূর্ব্বে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। লেখক যে বাঙ্গালা

করিয়া দুকথা বলিতে পারিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার ধন্যবাদ দিতে হয়। "তাঁহারা যে অতিমাত্র স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া অপরিণামদর্শীর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, তাহা হয় বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না অথবা অনুকরণের ভার মস্তিষ্কে বহন করিয়া বাস্তবিকই স্থূল বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন।"

"এই দুর্ব্বল ভারতবর্ষে বৃদ্ধ ঋষিরা নিজেদের দেবত্ব হইতেই এবং ভারতের যোগবিদ্যায় অসিদ্ধ কর্ম্মকোলাহলে লালিত পালিত পাশ্চাত্য জাতির অনভিগম্য ও শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাপেক্ষা সহস্র গুণে কমনীয় রমণীর দেবভাব রক্ষা করিবার জন্যই স্ত্রীজাতির অবরোধ দৃষ্টি (?) করিয়াছিলেন।" 'নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস' বা পীড়ী দর্ পাঁড়ী বা দিল্লী রাজবংশাবলী। "ধুন্দার রাজ্যের অন্তর্গত সবাই জয়পুর সদৃশ সবাই মাধোপুর নামক এক নগর আছে, তত্রত্য জনৈক কর্ম্মচারী একটি প্রাচীন হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা লেখকের হস্তগত হইয়াছে। এই পুঁথিটি জয়পুরী হিন্দীভাষায় লিখিত ভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বর্ত্তমানের প্রচলিত ইতিহাস লিখিত আখ্যান ও ঘটনাবলীর সহিত মিলে না। এখানি হিন্দু ঐতিহাসিকের লিখিত।" ভরসা করি ভারতের ইতিহাস লেখকগণে এখানি সযতনে পাঠ করিবেন। প্রবন্ধে তিমুর শাহ, বাবর শাহ, আকবর শাহ, শাজাহান, দ্বিতীয় আকবর শাহ ও বাহাদুর শাহের চিত্র আছে। ছবি গুলি বেশ। এবার গ্লাডষ্টোনেরও একটি প্রতিকৃতি আছে। আমরা জানি না তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি পেঁয়াজ না দিলে কি ডিমের সুপ হয় না? "একটুতে এত" গল্পটি মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। গীতিকুঞ্জে আকাশ ভঙ্গ হইল। প্রীতি ও স্বার্থপরতা—"যে আপনাকেই" জেয়াদা দেখে (?) তাহাকে স্বার্থপর বলে। যে লোকের ভাল করে, আপনাকে দেখে কম, তাহাকেই উদার বলে। কিন্তু যখন সুন্দর বস্তুতে মানুষের প্রীতি যায়, তখন মানুষ আপনাকে ভুলিবেই। কেন না প্রীতিটা স্বার্থপরতার ঠিক উল্টা।" কে বলিল? স্বার্থপরতার ঠিক উল্টা হইতেছে, 'পরার্থপরতা'। প্রীতি বা ভালবাসায় স্বার্থপরতা আছে বলিয়াই "নিস্বার্থ ভালবাসা" বলিয়া একটা ভাবের কথা আছে। পুণ্য এবার শ্রাবণের পূর্ণিমা সমালোচনে একটু জ্ঞানকৃত পাপ করিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি শ্রাবণের পূর্ণিমার সমালোচনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

সুখশান্তি।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, তাহার সীমা নির্দ্ধারণও সহজ নহে। সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য আমরা লালায়িত। অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে সুখশান্তির পথে সে আকাঙ্ক্ষার স্রোত না বহিলে কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না সুতরাং সুখশান্তিই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

এমন উপাদেয় আলোচ্য বিষয় আর কি আছে? মানুষ চিরদিন যাহা চাহিয়া আসিতেছে, যাহা পাইলে আর চাহিবার কিছুই থাকে না—তল্লাভের উপায় যিনি বলিয়া দিতে পারেন তিনি মনুষ্য সমাজের প্রকৃত বন্ধু। বন্ধু বলিতেছি কেন তিনি আমাদের পরমারাধ্য গুরু। সৌভাগ্যক্রমে হিন্দুর তাদৃশ গুরুর অভাব নাই। কত ঋষি তপস্বী সাধনার উচ্চ মঞ্চে বসিয়া এ বিষয়ে কতই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ভারতের গিরিগুহা ও তপোবন হইতে কত সময়ে কতই আলোচনা হইয়াছে এবং অদ্যাপি অবিরাম চলিতেছে। এই জন্য সুখশান্তির পথ হিন্দু যেমন বুঝিয়াছেন ও চিনিয়াছেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ পারেন নাই।

কোন বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অগ্রে কি কি অন্তরায় আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার উৎসেদ করিতে হয়। সুখশান্তির পথে কি কি বাধাবিঘ্ন আছে তাহা অনুধাবন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

আলোকের পশ্চাতে আঁধার, তেমনি সুখের পশ্চাতে দুঃখ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই দুঃখের আঁধার আসিয়া সুখের আলোককে গ্রাস করিতে পারে। এরূপ অনিশ্চিত সুখের উপর কিরূপে নির্ভর করা যাইতে পারে? দুঃখ থাকিতে সুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কিরূপে দুঃখের তিরোধান হয় ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

শরীর, মন, আত্মা ও বহির্জগৎ—এই চারি দিক হইতে দুঃখের স্রোত আসিয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। শরীরে রোগের উৎপত্তি হয়, মনে দুর্ব্বলতা আসিয়া অবসাদ জন্মায় এবং আত্মার বিকারে পরিতাপের

সে দেব মূরতি মোরে ডাকে কত মমতায়,
নবীন উচ্ছ্বাসে তাহে প্রাণখানি উথলায়।
অভাগীর সে সুঁখেতে কেন এত বাধা দেও ?
ভেঙনা স্বপন-ঘোর পায়ে পড়ি মাথা খাও।

মাত্রাশিক্ষা, অর্থাৎ বৃটীশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় গৃহীত ঔষধ সকলের মাত্রা (dose) অভ্যাস করিবার সহজ উপায়, পদ্যাকারে লিখিত। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ।০ আনা। মুর্শিদাবাদ পাঁচথুপী গ্রামে প্রাপ্তব্য। পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে কম্পাউণ্ডিং ও ডিস্পেন্সিং সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। মাত্রাশিক্ষা পদ্যে লিখিত, কাজেই বারকতক পড়িলেই মনে থাকা সম্ভব। কম্পাউণ্ডার ও পল্লীগ্রামের চিকিৎসকদের নিকট এ পুস্তকের আদর হইবে বলিয়া বোধ হয়। আমরা চিকিৎসা ব্যবসায়ী নহি সুতরাং পুস্তকের ভিতর কোনও ভ্রমপ্রমাদ আছে কি না তাহা বলিতে পারিলাম না।

ডাইরেক্টারি অব্ ইণ্ডিয়া, ১৮৯৯ বা ১৩০৬ সাল। কলিকাতা ৩৮।১নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে পি, এম, বাকৃচি এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ টাকা। ভারতবর্ষের জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয়ই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, এরূপ সুবৃহৎ পুস্তক কি প্রকারে এত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। থ্যাকার স্পীঙ্ক্ কোম্পানীর প্রকাশিত ২৪৲ টাকা মূল্যের ডাইরেক্টারীতে যাহা আছে, এই ১৷০ মূল্যের পুস্তকে প্রায় সেই সকল বিষয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ সুলভ মূল্যের ডাইরেক্টারী প্রকাশ করিয়া বাকৃচি কোম্পানী সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, ১৩০৬ সাল। শ্রীজগজ্জ্যোতি গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার নূতন করিয়া আর কি পরিচয় দিব? ইহা আজ কালকার প্রচলিত পঞ্জিকার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বুধগণ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত* হইতে উৎপন্ন সুখদুঃখের নিদানভূত, কর্ম্মসমূহের ভোগনিকেতন জন্মবিনাশের অধীন ও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত মায়াময় শরীরকে জীবাত্মার স্থূল শরীর এবং মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ, এই সপ্তদশ অবয়বের গঠিত, অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, সুতরাং চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন আর পরলোকে বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য চিদাভাস† স্বরূপ ভোক্তা জীবের সুখদুঃখাদির সাধনস্বরূপ শরীরকে জীবাত্মার সূক্ষ্মশরীর বলিয়া অবগত আছেন। এতদ্ভিন্ন সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চের কারণ, অনাদি অনির্ব্বচনীয় আর একটি উৎকৃষ্ট শরীর আছে, তাহার নাম কারণ-শরীর‡, এই কারণ শরীর সমষ্টিরূপে ঈশ্বরের উপাধি এবং ব্যষ্টিরূপে প্রাজ্ঞের উপাধি। অতএব যখন দেখা যাইতেছে যে একই চৈতন্য উপাধিভেদে ভেদবিশিষ্ট হইয়াছেন, তখন লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা উপাধিভাগ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধ আত্মার মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ কূটস্থ আত্মাকে§ অভেদরূপে অবধারণ করিতে হইবে। স্ফটিকরত্ন যেরূপ নীল

---

*সূক্ষ্ম তন্মাত্রসমূহ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; এই পাঁচটি। ইহাদের নামান্তর সূক্ষ্মভূত ও পরমাণু। এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তিক্রম এইরূপ তামস অহঙ্কার হইতে প্রথমত শব্দ বা সূক্ষ্ম আকাশ, সূক্ষ্ম আকাশে সূক্ষ্ম বায়ুর বীজ নিহিত থাকায় তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্মবায়ু, সূক্ষ্মবায়ু মধ্যে সূক্ষ্মতেজের বীজ নিহিত থাকায় তাহা হইতে সূক্ষ্মতেজ, সূক্ষ্মতেজে সূক্ষ্মজলের বীজ নিহিত থাকায় তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্মজল এবং সূক্ষ্মজলে সূক্ষ্মপৃথিবীর বীজ নিহিত থাকায় তাহা হইতে সূক্ষ্ম পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ প্রথমোৎপন্ন এবং তাহার গুণ শব্দ। তাহার আর অন্যভূত কারণ নাই সুতরাং শব্দই একমাত্র গুণ। বায়ু আকাশের কার্য্য এবং তাহার আপনার গুণ স্পর্শ কিন্তু আকাশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাতে আকাশ গুণ শব্দও বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে তেজের গুণ—শব্দ স্পর্শ ও রূপ; জলের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; পৃথিবীর শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। সূক্ষ্মভূত পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্মভূত সকল জগৎ নির্ম্মাণের উপযুক্ত নহে। ভগবান সূক্ষ্ম আকাশাদি সূক্ষ্ম-পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চীকৃত করেন, অর্থাৎ পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া থাকেন।

লোহিতাদি বর্ণযুক্ত পদার্থের সন্নিকর্ষে সেই সেই পদার্থের বর্ণে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এক কূটস্থ আত্মা পঞ্চকোষের আসঙ্গ বশে তত্তৎকোষের আকারে প্রতীয়মান হন। কিন্তু পঞ্চকোষতত্ত্ব বিশেষরূপে বিচারিত হইলে পরিজ্ঞাত

ঐ পঞ্চীকরণ কি প্রকার?—সূক্ষ্ম আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের প্রত্যেককে প্রথমত সমান দুই দুই অংশে বিভাগ করত সেই দুই দুই অংশের এক এক অংশেতে সমান চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে সকল ভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ হইল। ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে—

সূক্ষ্ম আকাশ	॥০	সূক্ষ্ম বায়ু	॥০	সূক্ষ্ম তেজ	॥০
ঐ বায়ু	৵০	ঐ আকাশ	৵০	ঐ আকাশ	৵০
ঐ তেজ	৵০	ঐ তেজ	৵০	ঐ বায়ু	৵০
ঐ জল	৵০	ঐ জল	৵০	ঐ জল	৵০
ঐ পৃথিবী	৵০	ঐ পৃথিবী	৵০	ঐ পৃথিবী	৵০
স্থূল আকাশ	১৲	স্থূল বায়ু	১৲	স্থূল তেজ	১৲

সূক্ষ্ম জল	॥০	সূক্ষ্ম পৃথিবী	॥০
ঐ আকাশ	৵০	ঐ আকাশ	৵০
ঐ বায়ু	৵০	ঐ বায়ু	৵০
ঐ তেজ	৵০	ঐ তেজ	৵০
ঐ পৃথিবী	৵০	ঐ জল	৵০
স্থূল জল	১৲	স্থূল পৃথিবী	১৲

এখন আমরা যে আকাশ বায়ু জল ও মৃত্তিকা উপভোগ করিতেছি তাহা পঞ্চীকৃত। এই জন্যই জলে আমরা আর ৩৫ পদার্থের ভাগ উপলব্ধি করিয়া থাকি।

†চিদাভাস—বুদ্ধি পদার্থ স্বভাবতই স্বচ্ছ। তাহাতে আত্মার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিবিম্বকে বেদান্তশাস্ত্রে চিদাভাস বলে।

‡সমষ্টি কারণ শরীরাভিমানী সুষুপ্তিসাক্ষী চৈতন্যের নাম ঈশ্বর; ব্যষ্টি কারণ শরীরাভিমানী সুষুপ্তি সাক্ষী চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ; সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী স্বপ্নসাক্ষী চৈতন্যের নাম হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা বা প্রাণ; ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী স্বপ্নসাক্ষী চৈতন্যের নাম তৈজস। সমষ্টি স্থূলশরীরাভিমানী জাগ্রৎসাক্ষী চৈতন্যের নাম বৈশ্বানর বা বিরাট্; ব্যষ্টি স্থূলশরীরাভিমানী জাগ্রৎ সাক্ষী চৈতন্যের নাম বিশ্ব।

§এক চৈতন্য কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্ম চৈতন্য, জীব চৈতন্য এবং ঈশ্বর চৈতন্য এই চতুর্ব্বিধ। যথা, আকাশ ঘটাকাশ মহাকাশ জলাকাশ দেহাকাশ।

[পঞ্চকোষ—অসিকোষ যেমন অসির আচ্ছাদক, তদ্রূপ মন বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার আচ্ছাদক এই জন্য শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে কোষস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। (পঞ্চদশী দেখুন) পঞ্চকোষ যথা; অন্নময়, প্রাণময়, বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী পঞ্চকোষ শব্দে অভিহিত হয়। কোষ-কারকীট (গুটিপোকা) যেমন কোষ মধ্যে আবদ্ধ হইয়া দুঃখভোগ করে তদ্রূপ স্বস্বরূপ আত্মা এই পঞ্চকোষে আবৃত হইয়া স্বরূপের বিস্মৃতি বশত সংসারগতি প্রাপ্ত হন। পঞ্চকোষ এইভাবে অবস্থিত। স্থূলদেহ অর্থাৎ অন্নময়কোষ অপেক্ষা অভ্যন্তরে প্রাণময়কোষ তদপেক্ষা অভ্যন্তরে মনোময়কোষ, তদপেক্ষা অভ্যন্তরে কর্ত্তা বা বিজ্ঞানময় তাহা হইতেও অভ্যন্তরে ভোক্তা অর্থাৎ আনন্দ-ময়কোষ পর পর এই পঞ্চ কোষকে "গুহা"ও বলে। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে স্থূলদেহ তাহাকে অন্নময় কোষ বলে। পিতৃমাতৃভুক্ত অন্ন হইতে যে বীর্য্য জন্মে তাহা হইতে উৎপন্ন এবং অন্নরস দ্বারা পরিবর্দ্ধিত যে স্থূলশরীর তাহাই অন্নময়। ইহা আত্মা নহে কারণ উৎপত্তির পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পর ইহার অভাব হয়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ এই চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীরকে অন্নের বিকার বলিয়া অন্নময় কোষ বলে। প্রাণময়—লিঙ্গন্তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ। পঞ্চদশী ১।৩০

লিঙ্গশরীর মধ্যে বর্ত্তমান ও রজোগুণের কার্য্যীভূত যে প্রাণ অপাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু এবং ঐরূপ রাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটি মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ। আপাদমস্তক ব্যাপ্ত থাকিয়া দেহে বলাধান করত যে বায়ু ইন্দ্রিয়-গণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতেছে তাহার নাম প্রাণময়কোষ, প্রাণময়-কোষ আত্মা নহে। কারণ ইহার চৈতন্য নাই, ইহা জড়।

মনোময়কোষ—সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ। সত্ত্ব-গুণের কার্য্য চক্ষু প্রভৃতি যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার সহিত সংশয়াত্মক মনকে মনোময়কোষ বলা যায়। কিন্তু বেদান্তসারের মতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে মনোময়কোষ বলে। যে, দেহ ও পুত্রাদির প্রতি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞান করিতেছে, তাহাকেই মনোময়কোষ বলে। ইহা আত্মা নহে। কারণ কাম ক্রোধাদি অবস্থা দ্বারা ইহার স্বভাবের স্থিরতা নাই।

বিজ্ঞানময়কোষ—"তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা।" পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে জ্ঞানময় কোষ বলে। চিচ্ছায়া-

বিশিষ্ট যে বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে লীন হয় এবং জাগ্রদবস্থায় নখাগ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব-শরীর ব্যাপিয়া থাকে তাহার নাম বিজ্ঞানময়কোষ। ইহা আত্মা নহে, কারণ ইহার বিলয়াদি অবস্থা আছে। বেদান্তসার মতে এই বিজ্ঞানময় কোষকেই ইহার "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এইরূপ অভিমান বশত ইহলোক পরলোকগামী জীব বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বেদান্তসার ইহাও বলেন—জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তৃস্বরূপ, ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট মনোময় কোষ কারণ স্বরূপ এবং ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট প্রাণময়কোষ কার্য্যস্বরূপ। এই কোষত্রয় মিলিত হইয়া সূক্ষ্মশরীর নাম ধারণ করে।

আনন্দময়কোষ—কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ। কারণ শরীর অবিদ্যায় যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা ইষ্টলাভ ও ইষ্টদর্শনাদিজনিত মোদাদিবৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময়কোষ নামে অভিহিত হয়। পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগকালে কোন বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া আত্মস্বরূপ আনন্দের প্রতিবিম্ব লাভ করে এবং ভোগাবসানে নিদ্রারূপে বিলীন হয়, তাহাই আনন্দময়কোষ। ইহাও আত্মা নহে কারণ আনন্দ নিত্য নহে, কদাচিৎ প্রাদুর্ভূত হয়। এই পঞ্চকোষ মধ্যে যখন যাহাতে আত্মার তাদাত্ম্য প্রতীতি হয়, তখন আত্মা তত্তৎশব্দের বাচ্য হন। বস্তুত আত্মা পঞ্চকোষ হইতে পৃথক এই জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হয়।]

হওয়া যায়, আত্মা অজ, অদ্বয় ও অসঙ্গরূপী। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভেদে বুদ্ধির যে ত্রিবিধ বৃত্তি, তাহা ত্রিগুণাত্মক পঞ্চকোষেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আত্মায় নহে। কারণ ঐ অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারী*, আর আত্মা গুণাতীত, নিত্য, সর্ব্বব্যাপক, অসঙ্গ ও আনন্দস্বরূপ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও চিদাত্মা, ইহাদিগের পরস্পর নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাসবশত বুদ্ধিবৃত্তি যাবৎকাল তমোমূলতা নিবন্ধন‡ অজ্ঞস্বরূপা হইয়া পরিবর্ত্তিত হয়, তাবৎকাল দৃশ্যমান সংসারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যেরূপ নারিকেলাদি

*অবস্থাত্রয়…ব্যভিচারী। অর্থাৎ জাগ্রৎকালে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অভাব, স্বপ্নকালে জাগ্রদ্দশা ও সুষুপ্তির অভাব, এবং সুষুপ্তিকালে জাগ্রদ্দশা ও স্বপ্নাবস্থার অভাব হয়।

‡তমোমূলতানিবন্ধন—যাহা এক বস্তুকে প্রতিপাদন করিয়া অন্য বস্তুকেও প্রতিপাদন করে, তাহার নাম উপলক্ষণ। যেমন, 'বায়স হইতে দধি রক্ষা

ফলের অভ্যন্তরস্থ মাধুর্য্যরসময় জলপান করিয়া সেই ফলকে পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ মোক্ষাভিলাষী "ইহা নয়" এই শ্রুতি প্রতিপাদিত প্রমাণ বাক্য দ্বারা নিখিল জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণ ও হৃদয়ে চিৎ স্বরূপ ঘনামৃত সম্যক্ আস্বাদন করিয়া জগতের সত্তারূপ সারাংশ মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক উহাকে পরিত্যাগ করিবেন।† আত্মা কদাপি জন্মগ্রহণ করেন না, কখনও মৃত্যুগ্রস্ত হন না, কখনও বৃদ্ধি লাভ করেন না, কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হন না এবং তিনি অভিনবও নহেন।‡ তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সকল পদার্থেরই উৎকর্ষ দূরীকৃত করিয়াছেন। তিনি সুখস্বরূপ সর্ব্বগত স্বয়ম্প্রভ ও অদ্বয়। যদি বল এতাদৃশ জ্ঞানময় ও সুখস্বরূপ আত্মায় কিরূপে দুঃখময় সংসারের প্রতীতি হইয়া থাকে? ইহার উত্তর এই যে, অজ্ঞানমূলক অধ্যাস বশতই সংসারের প্রকাশ। অতএব জ্ঞানোদয় হইলে সেই সংসার প্রতীতি ক্ষণমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেন না, জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। এক বস্তুকে ভ্রম বশত যে আর এক বস্তু বলিয়া বোধ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই অধ্যাস বলিয়া থাকেন। রজ্জু প্রভৃতি সর্প নহে, কিন্তু তাহাতে যেরূপ সর্পজ্ঞান হয়, ঈশ্বরেও তদ্রূপ জগতের জ্ঞান হইতেছে। যাবতীয় বিকল্পের কারণ স্বরূপা মায়ার সঙ্গশূন্য, নিখিলনিদান, নিরাময়, সর্ব্বব্যাপক, জড়াতীত, এক ও অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ আত্মায় প্রথমে অহঙ্কাররূপ অধ্যাস প্রকল্পিত হইয়া থাকে। ইচ্ছা ও উপেক্ষা, রাগ ও দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব যাহার ধর্ম্ম সেই বুদ্ধিই সর্ব্বসাক্ষী আত্মায়

কর' এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বায়সকে এবং দধির অন্যান্য-উপঘাতক পদার্থ বা প্রাণীগণকেও পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং বায়স শব্দটি অন্যান্য দধিনাশকের উপলক্ষণ। তদ্রূপ তমঃ পদটি এ স্থলে রজোগুণের উপলক্ষণ, অর্থাৎ তমো দ্বারা রজোগুণকেও পাওয়া যাইতেছে, বুদ্ধি পদার্থটি স্বভাবত বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান, যতদিন তাহা প্রাণাদির অধ্যাসবশে রজস্তমপ্রধানা থাকে, ততদিনই সংসারদুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব রজস্তমপ্রধানা বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

†অর্থাৎ জগতে উদাসীন হইবেন।

‡উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই যে বর্ত্তমান থাকা তাহাকে নূতনত্ব বলে। যাহার নূতনত্ব নাই তাহার পুরাতনত্বও সম্ভাবিত নহে! নূতন জিনিস পুরাতন হইলেই তাহার অবস্থান্তর হইল। সুতরাং 'আত্মা অভিনব নহেন' এতদ্দ্বারা আত্মার অস্তিত্বরূপ বিকার ও পরিণামরূপ বিকার নাই সূচিত হইয়াছে।

সর্ব্বদা সংসারভান উৎপাদন করে। যেহেতু সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিবৃত্তির অভাব হয় বলিয়াই আমরা আত্মার সুখস্বরূপ অনুভব করিতে পারি। অনাদি অবিদ্যা হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি, সেই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্যের প্রকাশ তাঁহাকেই জীব বলা যায়। কিন্তু পরমাত্মা অন্তঃকরণের সাক্ষীরূপে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত, সুতরাং অন্তঃকরণ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না এবং তজ্জন্যই তিনি 'পর' শব্দে অভিহিত। ইহা অবগত হইলেই জীব পরমাত্মস্বরূপ লাভ করেন। চিত্ত জড় নহে চিদাত্মাই জড়, চিদাত্মা ও চিত্তের পরস্পর অধ্যাস বশত এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। লৌহ যখন অনলে উত্তপ্ত হয়, তখন লৌহ ও অগ্নি পরস্পর একত্র থাকে বলিয়া যেরূপ লৌহের বর্ত্তুলত্বাদি ধর্ম্ম অগ্নিতে এবং অগ্নির দাহকত্বাদিধর্ম্ম লৌহে আরোপিত হয়, তদ্রূপ চিৎ প্রতিবিম্ব এবং ইন্দ্রিয়গণসমন্বিত মন ও বুদ্ধি, ইহাদিগের অতিমাত্র সন্নিকর্ষেই ঐ অধ্যাসের উৎপত্তি। গুরুসকাশে বেদবাক্য শ্রবণ করিয়া মনন দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার অনুভব উৎপন্ন হইলে, সেই স্ব স্বরূপ আত্মাকে উপাধি রহিত ও হৃদয়দেশে অবস্থিত দর্শন করিয়া আত্মচৈতন্যে ভাসমান যাবতীয় দৃশ্য জড়পদার্থ পরিত্যাগ করিবে। আমি প্রকাশস্বরূপ, অন্য কেহ কদাপি আমাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, আমি অজ, অদ্বয়, আমি নিরতিশয় নির্ম্মল, আমি আনন্দময়, আমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন, আমি নিরাময়, আমি সম্পূর্ণ, আমি নিষ্ক্রিয়, আমি সর্ব্বদাই মুক্ত, আমি অচিন্ত্যশক্তিমান, আমি অতীন্দ্রিয়জ্ঞানস্বরূপ, আমি অপরিণামী, আমি অপার ও অনন্ত এবং বেদবাদী পণ্ডিতগণ হৃদয়মধ্যে দিবানিশি আমারই চিন্তা করিয়া থাকেন; যিনি নিরন্তর অখণ্ডিতচিত্তে এইরূপে আত্মতত্ত্ববিচার করিতে থাকেন, তাঁহার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভাবনার উদয় হয়। যেরূপ রসায়ন নামক ঔষধের সেবা করিলে, সেই রসায়ন রোগ সমূহকে বিনষ্ট করিয়া দেয়, তদ্রূপ ঐ বিশুদ্ধ ভাবনাই* দেহান্তর প্রাপক কর্ম্মকলাপের সহিত অচিরাৎ অবিদ্যাকে উন্মূলিত করে।

নির্জ্জনে পদ্মাসন† স্বস্তিকাসন প্রভৃতির অন্যতম কোন প্রকার সুখসেব্য

*ব্রহ্মের আকারে আকারিত অন্তঃকরণবৃত্তি।

†পদ্মাসন—উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরু সংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
দক্ষিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণম্।

আসনে উপবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিরুদ্ধ ও প্রাণায়ামাদির দ্বারা অন্তঃকরণকে বিনির্জ্জিত করিয়া, অন্তরাশয় সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, সাধনান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং আত্মাতেই অবস্থিত হইয়া অসঙ্গভাবে সেই অদ্বয় আত্মাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবনা করিবে। এই যে বিশ্ব, পরমাত্মা যাহার প্রকাশক, ইহাকে যিনি সর্ব্বকারণস্বরূপ সেই পরমাত্মায় লয় করেন†, তিনি পূর্ণকাম ও পরমানন্দময় হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন, তাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন পদার্থেরই স্ফূর্ত্তি হয় না। সমাধিসিদ্ধির পূর্ব্বে চরাচরাত্মক সমগ্র জগৎকে ওঁকার মাত্র বলিয়া বিশেষরূপে চিন্তা করিবে। কিন্তু জগৎই বাচ্য এবং ওঁকার তাহার বাচক, এই যে প্রসিদ্ধি আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা অজ্ঞান বশতই বিভাবিত হইয়া থাকে। কারণ জ্ঞান হইলে বাচ্য ও বাচকের বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। ওঁকার শব্দটি অকার, উকার ও মকার এই ত্রিবর্ণাত্মক। তন্মধ্যে অকার বাচীপুরুষ বিশ্ব ও উকার বাচ্যপুরুষ তৈজস বলিয়া যথাক্রমে অভিহিত হন, আর নিখিল বেদই মকার বাচ্য পুরুষকে প্রাজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কিন্তু সমাধির পূর্ব্বেই এই ত্রিবিধ অবস্থার উপলব্ধি হয়, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে আর হয় না। কারণ তৎকালে সকলই ব্রহ্মপদার্থে বিলীন হইয়া যায়। স্থূলদেহনিবন্ধন নানা প্রকারে স্থূলভোগাভিমানী জাগ্রৎ সাক্ষী বিশ্বপুরুষ ও তাঁহার বাচক অকারকে উকারে লয় করিয়া, তৎপরে লিঙ্গদেহাভিমানী স্বপ্নসাক্ষী

উরু মধ্যে তথোত্তানৌ প্রাণী পদ্মাসনং ভবেৎ॥

পদদ্বয় উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া বাম পদ দক্ষিণ উরুতে এবং দক্ষিণ পদ বাম উরুতে রাখিয়া তৎপরে হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া উরু মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে, তাহা পদ্মাসন হইবে।

স্বস্তিকাসন। জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্‌কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

পদদ্বয়, জানু এবং উরুদেশের মধ্যভাগে রাখিয়া ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিলে, সেই উপবেশন প্রণালী স্বস্তিকাসন বলিয়া কথিত হয়। অন্যান্য আসনের বিবরণ ঘেরণ্ড সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

†পরমাত্মায় লয়। মায়ার সন্নিধান সম্পর্কে পরমাত্মাই সকলের উপাদান, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যিনি উপাদানের সত্তা ভিন্ন আর কার্য্যের সত্তা অবলোকন না করেন।

তৈজসপুরুষ ও তাঁহার বাচক ওঁকারের দ্বিতীয় বর্ণ উকারকে ওঁকারের অন্তিম বর্ণ মকারে লয় করিবে। পরিশেষে কারণ শরীরাভিমানী সুষুপ্তি সাক্ষী প্রাজ্ঞ পুরুষ ও তাঁহার বাচক মকারকেও চিদ্ঘন পরমাত্মায় লয় করিয়া, "আমিই সেই বিজ্ঞানচক্ষুঃ ও উপাধিশূন্য, নিত্যমুক্ত ও নির্ম্মল পরব্রহ্ম" এইরূপ ভাবনা করিবে। এই প্রকারে যাঁহার ভাবনাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত পরমাত্মার প্রতি প্রবাহিত হইতে থাকে, তিনি পুত্রদেহাদি সকলই সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যান এবং আত্মানন্দ পরিতৃপ্ত, সাক্ষাৎ অখণ্ড-আনন্দ-স্বরূপ ও বিমুক্ত হইয়া নিশ্চলবারি বারিধির ন্যায় প্রশান্তভাবে বিরাজ করেন। দেখ লক্ষ্মণ! আমি এতাদৃশ যোগীপুরুষকেই সর্ব্বদা দর্শন দান করিয়া থাকি। সমাধি ইঁহার অভ্যস্ত হইয়াছে, ইনি জিতষড়্গুণাত্মা*, ইনি সমগ্র রিপুগণকে জয় করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি যাবতীয় বিষয় ইঁহার নিকট হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছে। এই মননশীল যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দিবানিশি আত্মারই ধ্যানযোগে নিখিল বন্ধন হইতে নিত্যমুক্ত হইয়া অবস্থান করেন এবং অভিমানশূন্য হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে পরিশেষে সাক্ষাৎ আমাতেই বিলীন হইয়া যান। সংসারকে—আদি, মধ্য, অন্তসর্ব্বত্রই শোক ও ভয়ের কারণ জানিয়া বিধিবাদবোধিত সমুদায় কর্ম্মমার্গ পরিহার পূর্ব্বক আমার ভজনা করিবে। আমি অখিল জীবের আত্মা ও সমগ্র জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ। জীব দৃশ্যমান জগতকে আমার সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করিতে করিতে সমুদ্রে নদী প্রভৃতির জলের ন্যায়, অধিক পরিমাণ দুগ্ধে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধের ন্যায়, মহাকাশে ঘটাকাশের ন্যায়, মহা বায়ুতে ভস্ত্রাদি যন্ত্রোত্থিত বায়ুর ন্যায় আমার সহিত অভিন্ন হইয়া যান। অনন্তর এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়া যোগী যদিও লোক মধ্যে অবস্থিত ও প্রারব্ধবশে লোক ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া জগৎকে দর্শন করিতে বাধ্য হন, তথাপি তিনি উহাকে মিথ্যা বলিয়াই বিবেচনা করেন, কারণ তিনি দেখিতে পান, শ্রুতি ও যুক্তি উভয়বিধ প্রমাণেই উহার সত্তা নিরাকৃত হইতেছে। দিকে যেরূপ

*জিতষড়গুণাত্মা—সর্ব্বজ্ঞত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যতৃপ্তত্ব, বোধরূপত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, ও নিত্য অলুপ্তশক্তিকত্ব যে আত্মার এই ছয়টি আনন্দময় গুণ আছে, তাদৃশ আত্মা, অর্থাৎ ঈশ্বরকে যিনি জয় করিয়াছেন অর্থাৎ বশীভূত করিয়াছেন।

দিগ্‌ভ্রমাদি* এবং এক চন্দ্রে যেরূপ দুই চন্দ্রের ভ্রম, তদ্রূপ এই জগৎ তাঁহার নিকট ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বৎস! অখিল বিশ্বসংসারকে যাবৎকাল, আমার স্বরূপভূত দর্শন না করে, তাবৎকাল জীব মদীয় আরাধনায় তৎপর থাকিবে। যিনি শ্রদ্ধাবান্ এবং যাঁহার শরীরে অত্যুর্জ্জিত ভক্তি সততই দেদীপ্যমানা, আমি তাঁহার হৃদয়ে দিবানিশি সমুদিত হইয়া থাকি।

প্রিয়তম! আমি সমুদায় শ্রুতির সারসংগ্রহ অবধারণ করিয়া এই পরম নিগূঢ়তত্ত্ব তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার আলোচনা করিবেন, তিনি ক্ষণ মধ্যে পাতকরাশি হইতে বিমুক্ত হইবেন। ভ্রাতঃ! এই যে জগৎ দেখিতেছ, সমস্তই মায়া; অতএব বুদ্ধিসহযোগে ইহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার সহিত অভিন্নরূপে ভাবনা করিয়া শুদ্ধচিত্ত লাভ করত নিরাময় ও সুখী হইয়া স্বীয় আনন্দস্বরূপে অবস্থান কর। যিনি আমার নির্গুণ ও গুণাতীত মূর্ত্তির সেবা করেন, তিনিও আমার স্বরূপভূত; আর যিনি সময়বিশেষে† আমার গুণাত্মিকা মূর্ত্তির আরাধনা করেন, তিনিও আমার স্বরূপভূত। সূর্য্যদেব যেরূপ স্বকীয় কিরণজালে জগতের অন্ধকার রাশি বিদূরিত করেন, তদ্রূপ আমার এই উভয়বিধ উপাসকই স্বীয় চরণ সংলগ্ন রজঃকণার সংস্পর্শে অজ্ঞানান্ধকার নিরাকরণ করিয়া ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন। যে আমার চরণারবিন্দ বেদান্তবচনের বেদনীয়, সাক্ষাৎ সেই আমিই সমগ্র বেদের সারভূত এই অদ্বিতীয়‡ বিজ্ঞানগীতা গান করিলাম। অতএব যাঁহার ইহা আলোচনা করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহার যদি আমার বচনে অবিচলিত বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তিনি ইহা শ্রদ্ধাসহকারে কেবল মাত্র পাঠ করিয়াও, গুরুভক্তির অধিকারী হইয়া অন্তিমে আমার সাযুজ্য লাভ করিবেন।"

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে উত্তরকাণ্ডে রামগীতা।

(—পূজ্যপাদ শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী কর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

*দিগ্‌ভ্রমাদি—আদি শব্দ দ্বারা দিকের চলনাদি ভ্রম বুঝিতে হইবে অর্থাৎ আমি কোন যানারোহণে চলিয়া যাইতেছি কিন্তু বোধ হইতেছে দিক্‌ই যেন চলিতেছে, এইরূপ ভ্রম।

†সময় বিশেষে অর্থাৎ লীলাকালে। গুণাত্মিকা মূর্ত্তি অর্থাৎ অবতারমূর্ত্তি।

‡অদ্বিতীয় অর্থাৎ অতুল্য।

ভালবাসা।

শিক্ষক। এই জগতের পদার্থ সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত; চেতন জীব এবং জড় পদার্থ। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বশে জগৎচক্র ঘুরিতেছে তাহাদিগকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; যে শক্তিসূত্রে একটি জড় পদার্থ অন্য জড় পদার্থের সহিত বাঁধা থাকে তাহার নাম শক্তি; যে শক্তি নিবন্ধন চেতনজীব জড় বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহার নাম বিষয়াসক্তি এবং জীবের সহিত জীবের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহার নাম ভালবাসা।

যে ভাব নিবন্ধন আমরা সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি তাহাই চেতনভাব অর্থাৎ জীবভাব। আমার দেহ আছে, রক্ত আছে, অস্থি আছে, রূপ আছে, ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু ইহারা চেতন পদার্থ নহে। যে পদার্থের অস্তিত্বনিবন্ধন আমি সুখ দুঃখ বুঝিতে পারি সেই টুকুই আমার চেতনত্বের কারণ, হিন্দু দার্শনিকগণ এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। আমার রক্তের সহিত আর এক জনের রক্তের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহা জড় সম্বন্ধ; এক জনের রূপ শব্দ প্রভৃতির সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধমূলক যে অনুরাগ তাহার নাম বিষয়ানুরাগ; এক জনের সুখ দুঃখের সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধমূলক আকর্ষণের নাম ভালবাসা বা প্রণয়। যিনি অপর এক জনের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী তিনিই যথার্থ প্রণয়ী। সাংখ্যকার বলেন, যে প্রকৃতি ত্রিগুণাময়ী, এই গুণ কয়টির অর্থ বন্ধনরজ্জু—টীকাকারগণ এইরূপ অর্থ করেন। এই তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব রজ ও তম গুণ। চেতনের সহিত চেতনের যে সম্বন্ধ তাহা সাত্ত্বিক সম্বন্ধ, চেতন জীবের সহিত জড় পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহা রাজসিক সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত জড়ের যে সম্বন্ধ তাহা তামসিক সম্বন্ধ।

শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎগণ কেবল জড়জাতীয় শক্তিতত্ত্বই আলোচনা করিতেছেন এবং আর্য্যবিজ্ঞানে কেবল চেতনজাতীয় শক্তিতত্ত্বই সমালোচনা করা আছে। ইহাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। সাত্ত্বিক ও রাজসিক শক্তিকে চেতন জাতীয় শক্তি বলিতেছি।

জড় জগতে শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার লক্ষিত হয়, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। রাজসিক শক্তির ক্রিয়াও প্রধানতঃ দুই প্রকার দেখা যায়, রাগ ও দ্বেষ। এই রাগের অপর নাম কাম। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।" রজোগুণ সম্ভূত বিষয়াসক্তির নাম কাম এবং সত্ত্বগুণ সম্ভূত আসঙ্গ লিপ্সাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।

এইবারে সকাম কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বলি শুন। চিত্তে রজোভাব অর্থাৎ বিষয় সুখভোগেচ্ছা প্রবল হইলে যখন সেই সুখ প্রাপ্তি জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মকে সকাম কর্ম্ম বলা যায়; কিন্তু সাত্ত্বিকভাবের প্রাবল্যনিবন্ধন যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে।

চিত্তের সাত্ত্বিকভাব, রাজসিকভাব ও তামসিকভাব কিরূপ তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি শুন। চিত্তের যে অবস্থায় মনুষ্য এক জনের সুখ অন্বেষণেই ব্যস্ত, যাহাতে সেই অন্য ব্যক্তি সুখী হয়, সেই কার্য্য করিতেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার অন্তরে সাত্ত্বিকভাব উদয় হইয়াছে; অর্থাৎ যথার্থ যাহাকে ভালবাসা বলা যায় সেই ভালবাসার ভাব যাঁহার চিত্তে বিরাজমান তাঁহার চিত্তের অবস্থাকে সাত্ত্বিকভাব বলা যায়। আকর্ষণের চরমফল দুটিতে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া, ভালবাসারও চরম উদ্দেশ্য দুটি জীব মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ দুজনের সুখ দুঃখ মিশিয়া যাওয়া। সাত্ত্বিকভাব প্রবল হইলে মনুষ্য এমন একজনকে খুঁজিতে থাকে যাহার সুখ দুঃখের সহিত তিনি নিজের সুখ দুঃখ মিশাইতে পারেন, যাহার সুখ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে গিয়াই, যাহার সুখ সাধনোদ্দেশে কর্ম্ম করিয়াই তিনি সুখী হইতে পারেন। রাজসিকভাব প্রবল হইলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে; এই অবস্থায় যে বিষয় ভোগেচ্ছা জন্মে তাহার নাম কাম; যদি কেহ কাম্য বস্তু লাভের প্রতিকূলতাচরণ করে তবে তাহার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়।

চিত্তের যে অবস্থায় মনুষ্য জড়ভাব প্রাপ্ত হয় (যেমন আলস্য নিদ্রা অবস্থা) তাহাই চিত্তের তামসিক অবস্থা।

এইবার তুমি কাম ও প্রেম এই দুইটি কথার অর্থ বোধ হয়, অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ, এই দুইএর প্রভেদটি ঠিক বুঝিতে পারা বড় প্রয়োজনীয়

কেন না মনুষ্যজীবনে অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, যাহা প্রকৃত পক্ষে রাজসিকভাব যাহা কাম তাহাকেই আমরা বিশুদ্ধ প্রেম বলিয়া বুঝিয়া প্রকৃত প্রেমের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া পড়ি।

প্রকৃত প্রণয়ের সাহায্যে কাম দমন করিতে হয়, নচেৎ জোর জবরদস্তি করিয়া যাঁহারা কাম দমন করিতে চান তাঁহারা ভুল পথে চলিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণের আধিক্য উপস্থিত না হইলে রজোগুণের প্রাদুর্ভাব কমে না। যদি নিষ্কাম কর্ম্ম, কি তাহা বুঝিতে চাও তবে প্রকৃত ভালবাসা অভ্যাস করিতে শিখ। ক্রমাগত আত্মপরীক্ষা দ্বারা নিজের কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোনগুলি রজোগুণ সমুদ্ভব আর কোন্ গুলিই বা সত্ত্বগুণ সমুদ্ভব তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্য উপস্থিত হইলে চিত্তে যে ভাব উদয় হয়, স্মৃতিবৃত্তির সাহায্যে সেই ভাব চিত্তে সতত জাগরুক রাখিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপ ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা রাজসিকবৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়া যায়।

ভালবাসা তত্ত্ব সম্যক্ আলোচনা করিয়া ভালবাসিতে শিখিয়া জগৎশুদ্ধ সকলকে ভালবাসিতে শিখ তবেই ক্রমে ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। প্রথমে একজনকে ভাল বাসিতে শিখ তাহার পর পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য সমষ্টিকে তোমার ভালবাসার আধার পদার্থ বুঝিয়া সেই পদার্থে তোমার ভালবাসা ন্যস্ত করিতে শিখ।

ভালবাসা রহস্য আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারিবে যে জোর জবরদস্তি করিয়া ভালবাসা জন্মে না। যাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহারই সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইতে প্রবৃত্তি জন্মে। যে চিত্ত উন্নত তাহাই সুন্দর; যাহা যথার্থ সুন্দর নহে মোহবশতঃ তাহাকেই সুন্দর জ্ঞান করিয়া আপনা হারা হইও না, তাহা হইলে তোমার ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কেন না যাহাকে আজি ভ্রম বশতঃ সুন্দর বলিয়া বুঝিয়াছ, কিছুকাল মিলনের পর সেই মোহ ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া দারুন দুঃখে পতিত হইবে। মোহ বশতঃ যে ভালবাসা তাহা চিরস্থায়ী হয় না।

জ্ঞানালোকে মোহ দূর হয় সুতরাং জ্ঞানালোকের সাহায্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ভালবাসিতে শিখিবে। ভালবাসা রহস্য সম্বন্ধে আমার কোন উপদেষ্টা* এইরূপ কথা বলেন যে "প্রেম বুদ্ধিবৃত্তি

*পূজনীয় আমার পিতৃস্থানীয় বঙ্কিম বাবু।

মূলক"। কি ভাল, কি মন্দ, কি সুন্দর, কি সুন্দর নয় ইহা সম্যক্ বিচার করা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ কিন্তু মনুষ্যগণ মায়ার বশে থাকায় জ্ঞানের আলোক সম্যক্ প্রস্ফুরিত হয় না এবং সেই জন্যই এ পৃথিবীতে এত গোলমাল; যে সৌন্দর্য্যসূত্রে জীব সকল গাঁথা রহিয়াছে সেই সূতাগাছটিতে যেন জোট পড়িয়া রহিয়াছে; সূতাটির কুড় খুঁজে পাওয়া দায় হইয়া উঠিয়াছে।

'Tis distance lends enchantment to the view' ইংরাজী এই enchantment কথাটি আর আমাদের "মায়ার মোহ" কথাটি একার্থবোধক বলিয়া বুঝি। এই মায়ার মোহ বশে যাহাকে আজ সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিছু দিন মিলনের পর আর সেখানে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না, এই জন্যই পৃথিবীতে নূতনের আদর, পুরাতনের আদর নাই। কিন্তু যিনি যথার্থ প্রেমিক তাঁহার কাছে নূতন পুরাতন দুইই সমান। কেন না ভালবাসার আধারে কোন অংশটুকু প্রকৃত সুন্দর এবং কোন অংশ সুন্দর নয়, সেই সত্য পূর্ব্বে সম্যক্ বুঝিয়াই তিনি ভাল বাসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দুটি চিত্ত মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই ভালবাসার চরমফল কিন্তু মনের মতন সৌন্দর্য্য এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া মেলা ভার, সেই জন্য যিনি প্রকৃত ভালবাসা কি তাহা বুঝিয়াছেন তিনি মনের মতন সৌন্দর্য্য গড়িয়া সেই ভবিষ্যৎ সুন্দরের চিত্তে চিত্ত অর্পণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ সুন্দর চিত্তের সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিশাইবার অভিপ্রায়ে যিনি কোন এক আধার অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য গঠন কার্য্যে তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহার কর্ম্মকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলি।

যিনি ভালবাসা অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে কি কি অভ্যাস করিতে হইবে তাহা বলি শুন।

প্রথম। চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য যাহাতে জন্মে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমে চিত্তের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে যে অন্য একটি চেতন জীবের সুখ দুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশাইবার জন্য অন্তরে একটা ব্যগ্রতা উপস্থিত হইবে।

দ্বিতীয়। বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে প্রকৃত সুন্দর ও উন্নত চিত্তেরভাব কিরূপ ক্রমাগত চিন্তা দ্বারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিতে হইবে।

তৃতীয়। নিজের চিত্তে চিত্রিত সুন্দরের সৌন্দর্য্যে অপর একজনকে ভূষিত করিবার জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে।

চতুর্থ। এইরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকার সময় কোন কর্ম্মের কিরূপ ফল ফলে তাহা সবিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবে।

পঞ্চম। এই সুন্দর গঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই যে উদ্দেশ্য সফল হইবে এরূপ প্রত্যাশা করিও না। যদিও এই এক জন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল না হয়, এই সুন্দর গঠনকার্য্যে তোমার চিত্ত যে উন্নত দশা প্রাপ্ত হইবে পরজন্মে সেই উন্নত চিত্ত লইয়া তুমি জন্ম গ্রহণ করিবে এবং সে জন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুকর হইয়া উঠিবে।

ষষ্ঠ। যদি তোমার মনের মানুষ গড়িয়া লইতে সক্ষম হও তবে তাহার সুখদুঃখে নিজের সুখদুঃখ মিশাইয়া নিজের অহং জ্ঞান ঘুচাইতে শিখিবে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে তোমার ভালবাসার শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

সপ্তম। তাহার পর যেমন একজনকে সুন্দর করিয়াছ, সেইরূপ এই সমস্ত পৃথিবীকে তোমার ভালবাসার আধার বুঝিয়া মনুষ্য সমষ্টীকে সুন্দর ও উন্নত করিতে যত্নবান হইবে। যিনি এইরূপ কার্য্যে ব্রতী ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহাতে আবির্ভূতা হয়।

ছাত্র। কি উপায় অবলম্বনে চিত্তে সাত্ত্বিকভাবের আধিক্য জন্মে সে বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। মনে করুন একজন রূপের সৌন্দর্য্যগ্রাহী, যেখানে তিনি সেই রূপের সৌন্দর্য্য দেখেন তাঁহার ভালবাসা সেইখানেই গিয়া পড়ে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে রূপতৃষ্ণা দূর হইয়া অন্তরে সাত্ত্বিকভাবের আধিক্য জন্মিতে পারে?

শি। সুন্দরকে ভালবাসা আর সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা এ দুটি কথায় বড় প্রভেদ সেটি স্মরণ রাখিও। যাঁহার রূপ তৃষ্ণা প্রবল তিনি রূপ উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হন কিন্তু যিনি যথার্থ সুন্দররূপ ভালবাসেন তিনি সেই সৌন্দর্য্য-গ্রাহী হইয়াও রূপ উপভোগের কামনা করেন না। উপভোগে সুন্দরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় কিন্তু যিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্যগ্রাহী সুন্দরের সৌন্দর্য্য যাহাতে চিরস্থায়ী করা যাইতে পারে তিনি সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন।

"সোনার বিগ্রহ করি পূজ একদিন
সেও রে পরশদোষে হয়রে মলিন।" হেমচন্দ্র।

উপভোগে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় সুতরাং যিনি যথার্থ রূপের সৌন্দর্য্য ভালবাসেন তিনি কখনও সেই রূপ উপভোগ করিতে রূপবান বা রূপবতীর রূপ নষ্ট

করিতে চান না। যিনি রূপতৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি যেন রূপ ভালবাসিতে শিখেন। যিনি রূপতৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি রূপবান্ বা রূপবতীকে রূপের আভায় উজ্জ্বলতর করিতে যত্নবান হউন, যেখানে কেবল রূপের সৌন্দর্য্য আছে সেইখানে যাহাতে গুণের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়া মুখকান্তি অধিকতর দীপ্তিশালী হইতে পারে সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন এবং এইরূপ কর্ম্মেই তৃপ্তিলাভ করিতে শিখুন তবেই তাঁহার রূপভোগতৃষ্ণা ক্রমেই কমিয়া যাইবে।

চেতন জীব প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত পুরুষ ও স্ত্রী। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধটি কি তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া পুরুষ, স্ত্রী উপভোগের জন্য তৃষ্ণাতুর হইয়া বেড়ায়। এই তৃষ্ণা হইতে পৃথিবীতে দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ, বিবাদবিসম্বাদ প্রভৃতি যত কিছু অসুখের কারণ জন্মিয়াছে। পুরুষ যবে স্ত্রীলোককে এবং স্ত্রীলোক যবে পুরুষকে যথার্থ ভালবাসিতে শিখিবে সেই দিন এই পৃথিবী রম্যস্থান হইয়া উঠিবে। যে পুরুষ স্ত্রীকে উন্নত করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী জ্ঞান করেন তিনিই যথার্থ স্ত্রীকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোককে উন্নত করিবার অভিপ্রায় যাঁহার অন্তরে কখনও স্থান পায় না অথচ যিনি স্ত্রী সঙ্গ কামনা করেন তিনি কামুক, তাঁহার ভালবাসা এবং ব্যাঘ্রের হরিণশিশুকে ভালবাসা অনেকটা এক রকম।

মানুষ নিজে আপনার মুখ দেখিতে পায় না, সেই জন্য নিজের মুখ দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয়, মানুষ তাহার নিজের মন সুন্দর কি কুৎসিৎ সেইটি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু সেটি না বুঝিয়াও স্থির থাকিতে পারে না; যত দিন সেইটি বুঝিতে না পারে ততদিন এক একখানি দর্পণের প্রয়োজন হয়। স্ত্রী-চিত্ত পুরুষের পক্ষে এবং পুরুষের চিত্ত স্ত্রীর পক্ষে সেই দর্পণ।

দর্পণ নির্ম্মল না হইলে তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা সত্যের অনুরূপ হয় না; যে চিত্তে একেবারে কপটতা নাই তাহাই নির্ম্মল কিন্তু এরূপ নির্ম্মল দর্পণ সহজে খুঁজিয়া মেলে না। হীরক সুবর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য রত্ন যখন মাটির ভিতর থাকে তখন তাহারা সমল থাকে, পরে ঘসিয়া মাজিয়া, কাহাকে বা আগুনে পুড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ পুরুষরত্ন

বা স্ত্রীরত্ন হৃদয়ে ধারণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে উহাদিগকে ঘসিয়া মাজিয়া, প্রয়োজন মতে আগুণে পুড়াইয়া নির্ম্মল করিয়া লইতে হয়।

সমল চিত্তকে নির্ম্মল করিবার, কুৎসিৎকে সুন্দর করিবার আগ্রহকে প্রেম প্রণয় ভালবাসা ভক্তি বা স্নেহ নাম দেওয়া যায়। সমলকে নির্ম্মল করিবার অভিপ্রায় যদি না থাকে তবে পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পর যে সঙ্গ লালসা তাহাকে ভালবাসা বলিতে চাই না।

ভালবাসাভাব তিন প্রকার,—ভক্তিভাব, প্রেমভাব এবং স্নেহভাব। যিনি আমাকে উন্নত করিতে পারিলেই আনন্দিত হন তাঁহার প্রতি আমার যে ভাব তাহার নাম ভক্তি। এই ভক্তিনিবন্ধন ভক্ত ভক্তির পাত্রের আজ্ঞানুপালনে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। সৎপাত্র বুঝিয়া যাহাকে উন্নত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি তাহার প্রতি আমার যে ভাব দাঁড়ায় তাহার নাম স্নেহ। যেখানে পরস্পর পরস্পরকে উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট সেইখানকার ভাবের নাম প্রেম।

ভক্তির পাত্রে ভক্তি, স্নেহের পাত্রে স্নেহ এবং প্রেমের পাত্রে প্রেম ন্যস্ত করিয়া আনন্দের উদ্দেশ্যে সতত অগ্রসর হইতে শিখ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

উপসংহার।

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে উপরের লিখিত প্রবন্ধটি 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন ভালবাসা সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাই লিখিয়াছিলাম; এখন আবার চৌদ্দ বৎসর পরে ভালবাসা সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতে চাই। এখন বুঝি যে ভালবাসাই আদ্যাশক্তি; এই ভালবাসাই কর্ম্মের প্রবোধিকা-শক্তি। জগতে যতকিছু ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে সবই এই এক ভালবাসা শক্তির রূপান্তর মাত্র। জগতে অচেতন পদার্থ কিছুই নাই; এক চিন্ময়ের স্বত্বা নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক অণু পর্য্যন্ত সজীব পদার্থ। পৃথিবী সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রকে আমরা এখন জড় পদার্থ বুঝি, কিন্তু জ্ঞানী যোগীগণ দেখেন যে উহারা সকলেই এক একটি সজীব দেহ; সকলেরই এক এক জন চেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। আমি যেমন আমার দেহের সহিত স্ব স্বামীভাবে যুক্ত অর্থাৎ আমার এই দেহের সহিত 'মমত্ব' সম্বন্ধে যুক্ত, সেইরূপ প্রত্যেক দেহেরই অধিষ্ঠাতা দেহী এক এক জন আছেন।

সুতরাং অচেতন পদার্থ জগতে নাই। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, উহা সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে ভালবাসা আছে বলিয়া, নদী সমুদ্রে মিলিতে চায় ভালবাসে বলিয়া; অক্সিজনের অণু, হাইড্রোজনের অণু মিলিয়া জল হইয়া থাকে উহাদের মধ্যে ভালবাসা আছে বলিয়া। তোমরা যদি বেশ মন দিয়া কান পেতে বিশ্বের সঙ্গীত শুন, তবে শুনিতে পাইবে বিশ্ব গাইতেছেন "আমার স্বভাব এই ভালবাসা বই আর জানি না"। স্বভাব অর্থে প্রকৃতি। ভালবাসাই জগজ্জননীর স্বরূপ। বিশ্বের এই ভালবাসা স্বভাব যিনি বুঝিয়াছেন, যিনি এই আদ্যাশক্তির রহস্য বুঝিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভালবাসা কি তাহা বুঝিয়াছেন, আর সকলেই কামী। বিশ্বের এই বিশ্বব্যাপী ভালবাসা যিনি হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন তিনি বুঝেন যে এই আদ্যাশক্তিই পূর্ণা, ইনিই পরাপ্রীতি স্বরূপিণী ভক্তি; অন্য যা কিছু শক্তি সমস্তই ইঁহারই অংশ মাত্র, সেই জন্য তাহারা সমস্ত অপূর্ণা। এই বিশ্বব্যাপী ভালবাসাকে যিনি নিজের ভালবাসা বলিয়া বুঝেন তাঁহার ভালবাসাই নিষ্কাম, আর সকলের ভালবাসাই সকাম। "তারা আমার নিরাকারা"। যাহার সীমা আছে তাহাই সাকার, যাহা কোন সীমাবদ্ধ নহে তাহাই নিরাকার। এই আদ্যাশক্তি ভালবাসার কোন সীমা নাই, ইহা অসীম ও অনন্ত। যাঁহার ভালবাসার সীমা নাই, যাঁহার ভালবাসা কোন সীমাবদ্ধ নহে, তিনিই আদ্যাশক্তিকে জানিয়াছেন, তিনিই ভক্ত ও তিনিই মুক্ত। যাঁহার ভালবাসা সীমায় বদ্ধ তিনিই বদ্ধ জীব, এই বদ্ধ জীবের ভালবাসাই কাম। যাঁহার ভালবাসার সীমা মুছিয়া গিয়াছে, যিনি অসীম ভালবাসাকে হৃদয়ে ধরিয়া আছেন তিনিই মুক্ত পুরুষ; তিনিই আদ্যাশক্তিকে হৃদয়ে ধরিয়া শিবত্ব পাইয়াছেন। এইবারে প্রেম ও কামের পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি; শিবের ভালবাসা অর্থাৎ শিবের হৃদয়ের শক্তিই ভালবাসা এবং বদ্ধজীবের সসীম ভালবাসাই কাম।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এই কামকে কিরূপে জয় করিতে হইবে। জীবের হৃদয়ের শক্তি শিবের হৃদয়ের শক্তির সহিত মিলানই কামজয়ের এক মাত্র পন্থা; ইহারই নাম সাধনা।

শিবহৃদয়বাসিণী জগজ্জননী মা তোমাকে নমস্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা।

(শ্রীম)*

আজ রথযাত্রা। পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল। সকালে পরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুর্য্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার অতি কোমলাঙ্গ। অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি অতি বিনীতভাবে ভক্তিভাবে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই উৎসুক যে তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করেন। নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের

*ইহার কতকাংশ পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বয়ং লেখক পাঠাইয়াছেন ও পরমহংসের কথা বলিয়া পত্রস্থ করিলাম। অনেকের পক্ষে নূতন। আশা করি ভবিষ্যতে লেখক নূতন প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, বেশ! বেশ! পরে পণ্ডিতকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?

শশধর। মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

(কলিতে ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ নহে)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগী এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার।

(কলিযুগ ও বর্ণাশ্রমাচার।)

কর্ম্ম কর্‌তে যদি বল তো নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্যা' ওসব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে বল্‌তে পার।

(বিষয়ী লোক ও লেক্‌চার)

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মার্‌লে কুমীরের কি হবে?

সাধুর কমণ্ডলু (তুম্ব) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো। তাই বলি, তোমার লেক্‌চারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না।

তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পার্‌বে। বাচ্চুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়;—তবে তো দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার)

তুমি ভক্তদের ও বিষয়ী লোকদের চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠ্‌লে কোন্‌টা আম, কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, বোঝা যায় না।

(কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ)

এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যত দিন না ঈশ্বরের ধ্যানে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বল্‌তে যদি চক্ষে জল আসে, তা'হ'লে নিশ্চয় জেনো যে তোমার কর্ম্ম শেষ হয়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌তে হবে না।

ফল হইলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল; কর্ম্ম—ফুল।

গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে, বেশী কর্ম্ম করিতে পারে না। শ্বাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়্‌লে, শ্বাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম করিতে দেয় না। ছেলে হ'লে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম্ম করিতে হয় না।

(যোগ ও সমাধি)

সন্ধ্যা, গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী, প্রণবে লয় হয়। প্রণব, সমাধিতে লয় হয়।

যেমন ঘণ্টার শব্দ টং ট-অ-ম্। যোগী নাদভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদিকর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।

সমাধির কথা বলিতে বলিতে ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি বহির্গত হইতে লাগিল। আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটী কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগন্মাতাকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিলেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার বলেছিলাম, "মা! আমি আর এক জন পণ্ডিতকে দেখ্‌বো" তাই, তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

(পাণ্ডিত্য ও সাধন)

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও! আর কিছু দিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি? তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এসব কচ্ছো। (এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন।)

(পাণ্ডিত্য ও বিবেক-বৈরাগ্য)

ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, যখন প্রথমে লোকের মুখে তোমার কথা শুন্‌লাম, তখন আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত না বিবেক-বৈরাগ্য আছে?

যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

(আদেশ ও আচার্য্য)

যদি আদেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই।

আদেশ পেয়ে যদি কেহ লোক-শিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটী কিরণ আসে, তা হ'লে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

প্রদীপ জ্বাল্‌লে, বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না।

তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে 'আপনি কি লইবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি, আপনি কি লইবেন'? আমি সে সকল লোক্‌কে বলি, 'দূর কর—আমার ওসব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাহি না'।

চুম্বুক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বুক পাথরের টানে ছুটে আসে।

এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা ব'লে মনে কর না যে তাঁর জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

ওদেশে ধান মাপ্‌বার সময়, এক জন মাপে, আর একজন রাশ্ ঠেলে দেয়; তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোক-শিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা' হ'লে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না?

হাজরা। হাঁ অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না, আদেশ কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। না, আদেশ পান নাই বটে, তবে কর্ত্তব্যবোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চার কি হবে?

একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে বলেছিল "ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্ত্তুম, তেন কর্ত্তুম।" এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো, "শালা বলে কিরে! মদ খেত!" এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

বরিশালে বাড়ী এক জন সদরওয়ালা আমায় বলেছিল, "মহাশয়, আপনি প্রচার কর্‌তে আরম্ভ করুন। তা যদি করেন, তা' হ'লে আমিও কোমর বাঁধি। আমি বল্‌লাম ওগো, একটা গল্প শোন। ওদেশে হালদার পুকুর ব'লে একটী পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে কর্‌তো। আর সকালবেলা যারা পুকুরে আস্‌তো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না; আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখ্‌তো। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে যখন একজন চাপরাসী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে, তখন, কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাহ্যে করা বন্ধ হয়ে গেল।

তাই বল্‌ছি হেঁজিপেঁজি লোকে লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাক্‌লে তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কল্‌কেতায় অনেক হনুমানপুরী আছে,—তা'দের সঙ্গে তোমায় লড়্‌তে হবে। এরা তো (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা।

চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি রয়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই তা'র লেক্‌চারে কি উপকার হবে আর কি ফলই বা থাক্‌বে?

(কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল্‌ছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।

(গান)

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্ দিব্ দিব্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন।
কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুব্‌লে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

(নরেন্দ্র ও অমৃতের সাগর)

আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কি না বল। আচ্ছা মনে কর্ খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল? নরেন্দ্র বল্লে, আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'ব। কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে! তখন আমি বল্‌লাম, বাবা এ সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি কর্‌তে নাই। ঈশ্বর প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে?

তাই তোমায় বলি, সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হয়।

ঈশ্বর লাভ হ'লে আর ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোক-শিক্ষাও হবে।

(ঈশ্বরলাভের নানা পথ)

দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়্‌তে পার্‌লেই হ'ল।

মনে কর অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়্‌লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন কর্‌লেই তুমি অমর হ'বে।

(যোগ সম্বন্ধে প্রভুর কথা)

অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—"জ্ঞানযোগ," "কর্ম্মযোগ," আর "ভক্তি-যোগ"।

১। জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী, ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। নেতিনেতি বিচার করে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে, সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২ কর্ম্মযোগ—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্ম্মযোগ। তুমি যা শিখাচ্ছ।

অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়ায়, ধ্যানধারণাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁ'তে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ।

ঈশ্বর লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

৩। ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন এই সব ক'রে, তাঁ'তে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তি-যোগই যুগধর্ম্ম।

(কেন কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কলিযুগের পক্ষে কঠিন পথ)

কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ আমি আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম কর্‌তে বলেছে, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম।

তার পর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না ক'রে কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ না কর্‌লে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তার পর আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এ সকলের পার'।

যদি রোগ শোক, সুখ দুঃখ, এসব বোধ থাকে, তা'হ'লে তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এ দিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়্‌ছে, খুব লাগছে—অথচ বল্‌ছো, 'কৈ আমার হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে'?

(ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে)

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়াও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে; জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। মানে এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি-পথ ধরে যান, তা' হ'লেও সেই জ্ঞান লাভ কর্‌বেন। ভক্ত-বৎসল মনে কর্‌লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

(ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?)

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কল্‌কাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে; তা'হ'লে গড়ের মাঠ, সুসাইটী সবই দেখ্‌তে পায়।

কথাটা এই, এখন কল্‌কাতায় কেমন করে আসি।

জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব সমাধিতে রূপদর্শন হয়; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়, তখন অহং থাকে না, নামরূপ থাকে না।

(ভক্ত ও কর্ম্ম; ভক্তের প্রার্থনা।)

ভক্ত বলে, "মা সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে। সে কর্ম্ম কর্‌লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম কর্‌তে গেলে, তোমায় ভুলে যা'ব। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ কর্‌তে পারি, ততদিন

পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম কর্‌তে হবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে কর্‌তে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ কর্‌তে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ কর্‌বে, তখন তোমার কর্ম্ম করবো, নচেৎ নয়।"

(তীর্থযাত্রার প্রয়োজন)

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। হাজরা অনেক দূর গিছ্‌ল, আর খুব উঁচুতে উঠেছিল, হৃষীকেশ গিছ্‌ল। আমি অতদূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই।

চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। ভাগাড় কি জান ? কামিনী ও কাঞ্চন।

যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করিতে পার, তা' হ'লে তীর্থ যাবার কি দরকার ? কাশী গিয়ে দেখ্‌লাম সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'ল, তা' হ'লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, আর একমাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান ? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম কর্‌তে বলেছে, আমরা অনেক করেছি। এ দিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ এ সব নিয়ে ব্যস্ত।

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তভ মণি ফেলে অন্য হীরামাণিক খুঁজে বেড়ানও তা'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ'লে ফল হবে না।

ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বল্লে, 'মা! আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে বল্লেন, 'বাবা হাগাই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেব না।'

সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।

(আচার্য্যের তিন শ্রেণী)

তিন রকম বদ্যি আছে।

এক রকম আছে তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। কেবল মাত্র রোগীকে ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বদ্যি।

সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য আছে। তারা উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল, তা' দেখে না। তা'র জন্য ভাবে না।

কতকগুলি বদ্যি আছে তারা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তা'কে অনেক ক'রে বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বদ্যি। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক করে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

আবার উত্তম থাকের বদ্যি আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে তা' হ'লে তা'রা জোর পর্য্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।

পণ্ডিত। মহাশয় যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হলে জ্ঞান হয় না বল্‌লেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে। কিন্তু মনে কর ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা' হ'লে বদ্যি কি কর্‌বে ? উত্তম বদ্যিও কিছু কর্‌তে পারে না।

(পাত্রাপাত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাওনা। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে'। মনে কর বাপ নাই, হয়তো বাপের ঋণ আছে, তা' হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবে। শুনছো বাপু ?

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ আমি সব শুন্‌ছি।

(ঈশ্বরের দয়া)

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুরবাড়ীতে কতকগুলি শিখসিপাহী এসেছিল। মাকালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথার মধ্যে এক জন বল্‌লে, 'ঈশ্বর দয়াময়।' আমি বল্‌লাম, 'বটে ? সত্য নাকি ? কেমন ক'রে

জান্‌লে? তারা বল্‌লে, 'কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, দাওয়াচ্ছেন, এত যত্ন কর্‌ছেন।' আমি বল্‌লাম, 'সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখ্‌বে না ত কে দেখ্‌বে? তবে কি ও পাড়ার লোক এসে দেখ্‌বে না কি?'

নরেন্দ্র। তবে ঈশ্বরকে দয়াময় বল্‌বো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে কি আমি দয়াময় বল্‌তে বারণ কর্‌ছি? আমার বল্‌বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছিল। সে জল খাইতে পারিলেন না, আর এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন। পরে শুনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

(বিদায়)

পণ্ডিত। (হাজরাকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আজ আমার খুবদিন! আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখ্‌লাম। (সকলের হাস্য) দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বল্‌লুম জান?

সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'তুমি পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ।' রাবণ এর মানে বুঝ্‌তে পারে নাই, তাই ভারি খুসী হয়েছিল। সীতার বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হ'বার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। পণ্ডিত বন্ধুবান্ধবসঙ্গে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ভক্তগণ সমভিব্যাহার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আকাশকুসুম।

(২)

সরস্বতীর সহিত যিনি একটুকু সংস্রবও রাখেন তিনি জানেন রণ্টজেন রে কাহাকে বলে। একথাও সকলে জানেন যে রণ্টজেন সাহেবের আবিষ্কৃত কিরণমালার নাম X-rays (এক্‌স্ রেস্)। X বলিবার উদ্দেশ্য এই যে কিরণমালা মানবের স্থূল দৃষ্টিতে অদৃশ্য। একথাও জানা আছে যে দুই বৎসর হইল ঐ আবিক্রিয়া হইয়াছে আর উহার সাহায্যে চিকিৎসক মানবদেহের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে পারেন। আপনার উদরের অভ্যন্তরে ফোড়া হইয়াছে, ডাক্তার একবার কিরণমণ্ডিত একখানি চসমা চক্ষে দিলেন আর উদরের অভ্যন্তরের ফোড়াটি ত দেখিলেনই তা ছাড়া সমস্ত দেহটা ফোঁপরা, এফোড় ওফোড়, গল্ গল্ কচ্চে যাকিছু সব দেখিলেন। অনায়াসে অস্ত্র করিয়া তোমার যাতনা নিবারণ করিলেন। ঘরের প্রাচীর আর মানুষের দৃষ্টির ব্যবধান বা ব্যতিক্রম ঘটায় না। আপনি ছেলেকে উইলে ফাকি দিবার জন্য গুপ্ত মন্ত্রণা করিতেছেন। একজন গোয়েন্দা বা বাবাজী স্বয়ং এক যোড়া রণ্টজেন চসমা নাকে বা চোখে লাগাইয়া ব্যাপারটা সব দেখিতেছেন। আপনার ঘরে দোর দেওয়াই পণ্ড।

এই অদৃশ্যকিরণাবলী ও রণ্টজেনের নাম এতদিন আবিষ্কৃত পদার্থ নিচয়ের ও আবিষ্কর্ত্তাগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। লোকে জানিত যে আবিক্রিয়ার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ফয়শালা অটুট। কিন্তু নলিনীদলগতজলবৎতরলম্ তদ্বৎ আবিক্রিয়া অতিশয় চপলম্। এই জন্যই ত বাঙ্গালিরা ওদিকে মন দেন না, কি হবে বাপু, আজিকার আবিক্রিয়া কাল ত ছ্যা ছ্যা হইয়া যাইবে। সে যাহা হৌক দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ জগদীশ্বর ঘটক মহাশয় যে জলে চলিবার বাই-সাইকেল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বিলাতে পর্য্যন্ত যাহার সুখ্যাতি হইয়াছিল, তাহার কি হইল কেহ জানেন কি?

X নাম কেন? বীজগণিতে অজ্ঞাত সংখ্যার জন্য ইংরেজরা x y প্রভৃতি বিলাতী বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করেন। কিরণ অদৃশ্য বলিয়া তাই রণ্টজেন এক্‌স্ নাম দিয়াছেন। ঐরূপ আমাদের বীজগণিত অনুসারে "অকিরণ" নাম করিলে হয় না? ত্রিবেদী মহাশয় কোন নাম করিয়াছেন কি না

জানি না। নাম করার আর একটা কারণও আসিয়া পড়িয়াছে। আবার আকাশ কুসুম ফুটিয়াছে; আবার প্রকৃতি সতী একবার মানুষকে, জড়জীবকে, ধরা দিয়াছেন। আবার এক প্রকার অদৃশ্য কিরণাবলীর আবিষ্কার হইয়াছে। তাহার নাম হইয়াছে Y-rays.

এবারকার পুরুষসিংহ দূর সুদূর সুইডেনবাসী, বয়সে নবীন, কিন্তু বিজ্ঞ হইয়াছেন—জ্ঞানে। নামটি তাঁর একসেল অর্লিং। আমাদের ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে যে বাষ্পার্ণব আছে ইহা সকলেই জানেন। মহার্ণবে যেমন সর্ব্বদা তরঙ্গ উঠিতেছে পড়িতেছে বাষ্পার্ণবেও সেইরূপ অবিরত তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে। তাপ তাড়িত আলোকের মধ্যে এই বাষ্প তরঙ্গ সৃজনে ও সঞ্চালনে আলোক কিরণমালা কতটা শক্তি ধারণ করে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অর্লিং সাহেবের প্রয়োজন হয়। তিনি আলোক-কিরণমালা কিরূপে বাষ্পার্ণবে তরঙ্গকম্পন সম্পাদিত করে পরীক্ষা করিবার সময় এই ওয়াই কিরণের (মনে করুন যেন আমাদের ভাষায় নাম হইয়াছে "আ-কিরণ") অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে এই কিরণমালা অ-কিরণ নহে, ইহারা উহাদের অপেক্ষা তীব্রশক্তি সম্পন্না, এবং সম্পূর্ণরূপে নূতন এবং তীক্ষ্ণভেদ শক্তিবিশিষ্টা। অর্লিং সাহেব সুইডেন-রাজসভায় এই আবিক্রিয়ার সংবাদ দেন। রাজাও সাদরে তাঁহাকে সাহায্য দান করেন। অর্লিং সাহেব নদীতে টর্পিডো লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং পরীক্ষা সফল হইয়াছে।

অ-কিরণ শুধু চিকিৎসা-কার্য্যে নয় অনেক কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতেছিল। টর্পিডো সঞ্চালনেও ইহার ব্যবহার হইতেছিল। টর্পিডো কি? বিপক্ষ রণপোত ভগ্ন করিবার একরূপ যন্ত্র। জাহাজ বটে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র। আর আকার, মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি নানা আকারের। চালকের প্রেরণায় গুপ্তভাবে ইহা ডুব দিয়া বিপক্ষ জাহাজের তলায় গিয়া বোমের ন্যায় স্বীয় পিস্তল ছুটাইয়া দেয় আর বিপক্ষ জাহাজ চুরমার হইয়া যায় আর সহস্র লোক একেবারে ধ্বংস পুরীতে প্রেরিত হয়। এতদিন এই টর্পিডো এইরূপে সঞ্চালিত হইত। চালক কোন জাহাজে বা সমুদ্রতীরে কোন উচ্চ স্থানে বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার নিকট একটি যন্ত্র থাকিত আর টর্পিডোর উপরে একটি যন্ত্র থাকিত। উভয়ের মধ্যে তার প্রভৃতির দ্বারা একটা সংস্রব থাকিত। চালক আপন স্থানে বসিয়া যন্ত্র সাহায্যে শক্তি উদ্ভাবন করিয়া তার সাহায্যে

সেই শক্তি টর্পিডোতে সঞ্চালন করিয়া টর্পিডোর গতি প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিতেন। টর্পিডোচালক শক্তি উদ্ভাবনের জন্য অ-কিরণ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। তাড়িত অপেক্ষা অ-কিরণমালা প্রখরা শক্তিময়ী। কবি যে লিখিয়াছেন—

মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালা মৃত্যুর কিঙ্করী।

টর্পিডোর চঞ্চল সঞ্চালনে ও শত্রু সংহারে তাহা এতদিনে সফল হইয়াছে, আমরা ও পদের অর্থ বুঝিয়াছি। এক ছত্র বুঝিতে বাকি রহিল।

অর্লিং সাহেব রাজাদেশ ও রাজসাহায্য বলে বলীয়ান্ হইয়া সুইডেনের নদীসমূহে উৎসাহ সহকারে টর্পিডো লইয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার একটি যন্ত্র টর্পিডোআধারে রক্ষিত হইল আর যন্ত্রটি হয় অন্য জাহাজে বা তীরদেশে না হয় বেলুনে অবস্থিত হইল। তীরদেশে বসিয়াই তিনি স্বীয় যন্ত্রে এই ওয়াই-কিরণাবলীর উদ্ভব করিলেন। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরে অপর যন্ত্রসহ কতকগুলি টর্পিডো রক্ষিত হইল। পরিমাপ করিয়া জানা গিয়াছে উভয়ের মধ্যে আড়াই মাইল পথ ব্যবধান ছিল। এই আ-কিরণের সাহায্যে টর্পিডো গুলি তাঁহার শাসন মানিয়া চলিতে লাগিল। ডাইনে যাও, বামে যাও, সোজা যাও, বেঁকে যাও, ঠিক সুমুখে যাও, দশ হাত পিছনে এস, ডুব দিয়া দশ হাত নাম, আবার স্বস্থানে উঠে এস, এইরূপ, ইচ্ছায় তিনি যাহা বলিতে লাগিলেন টর্পিডো-ভায়ারা ঠিক তাই করিতে লাগিলেন। অর্লিংরূপী মাহুতের আদেশ টর্পিডো-মাতঙ্গ-মহাশয়েরা ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অঙ্কুশের প্রয়োজন নাই। টর্পিডোর পিস্তলটি পর্য্যন্ত কথা শুনে।

পাঠক মহাশয় একবার অর্লিং সাহেবের জয় দিন, কেন না তাঁহার তীর-ভূমির-মন্ত্র ও টর্পিডো-আধারের-যন্ত্রের মধ্যে কোন তার নাই—অপর কোন প্রকারের সংস্রব নাই!

শুধু যে একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে একখানি টর্পিডোতে এই শক্তির ক্রীড়া হইবে তাহা নহে। তীর ভূমি স্থাপিত যন্ত্র হইতে যে আ-কিরণাবলী টর্পিডোতে প্রেরিত হয় তাহারা "কোণ"(Cone) যন্ত্রাকৃতিতে ভ্রমণ করে। কোণ কি? মোচার মাথাটা কাটিয়া ফেলিলে কোণ হয়। সরু সূক্ষ্ম শীর্ষদেশ হইতে কিরণাবলী ছুটিয়া যে স্থানে গিয়া গতির শেষ করে সেখানে মোচার

গোল চিটাল দিকটার আকারে কিরণ পড়ে। এই গোলটার মধ্যে যে কোন টর্পিডো থাকিবে সে, চালকের হুকুমানুসারে উঠিবে পড়িবে আসিবে যাইবে থামিবে নাচিবে, স্বীয় পিস্তলটি হয় শান্তভাবে রাখিবে না হয় ছুড়িবে। প্রেরকের দুই মাইল দূরে 'কোণ' গোলটার ব্যাস এক শত গজ। এই এক শত গজ ব্যাসের পরিধিতে যতটা ভূভাগ আচ্ছন্ন করে তাহার মধ্যে যে কোন টর্পিডো থাকিবে সেই হুকুম শুনিবে। কিছুই দেখা যায় না অথচ কোথা হইতে কি করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। এই অর্লিং সাহেব বসিয়া, আর দূরে, ঐ দূরে চাহিয়া দেহ কিছুই নাই টর্পিডো আছে, আর মরীচীকা কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, যেন কোন মায়াবিনী আসিয়া অর্লিং সাহেবের হুকুমানুসারে কার্য্য করিয়া গেল। কবির আর ছত্রটি বুঝা গেল কি ?

মায়াবিনী মরীচীকা যার সহচরী ॥

বিনা তারের সাহায্যে টেলিগ্রাফ হইতেছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শুনিলাম শীঘ্রই ইষ্টইণ্ডিয়ারেলে এই ভাব-টেলিগ্রাফের প্রচলন হইবে। অর্লিং সাহেবের এই কাণ্ড ইচ্ছা টেলিগ্রাফ বলিলে ক্ষতি কি? পিয়ার্সন সাহেবের মাসিক পত্রিকায় জুন মাসে আর এন্ মিয়ার সাহেব অর্লিং সাহেবের এই আবিক্রিয়া সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের নাম "আলোক সাহায্যে টর্পিডো-সঞ্চালন"। ইচ্ছা-টেলিগ্রাফ আমাদের কথা নয়। একজন ইংরেজের কথা। তিনি বলিতেছেন, The description suggests that these y-rays are more like materialised will-power than anything else. বর্ণনায় এই আভাস পাওয়া যায়, এই ওয়াই কিরণগুলি আর কিছু নয়, যেন ইচ্ছাশক্তির জড়ত্বে পরিণতি হইয়াছে। পাঠক মহাশয় মনে রাখিবেন আজ বিংশ শতাব্দীর উষাকালে জড়বাদী য়ুরোপ ইচ্ছাশক্তির জড়ত্বে পরিণতি স্বীকার করিতেছেন।

তা ভাই আর একটা কথা মনে কর না কেন। ইচ্ছাশক্তির যদি জড়ের উপর এতটা আধিপত্য হয় তবে ইচ্ছাশক্তির, ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট আর একটি জীবের উপর কতটা আধিপত্য, কতটা শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে! আর তার ফলই বা কি ?

ষষ্ঠি সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে জলজ্জটাকলাপ ভ্রুকুটী কুটিলমুখ

অভিশাপোদ্যত দুর্ব্বাসা ঋষি আজ বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কুটীরে উপস্থিত, বিলম্ব সহে না, বলিলেন রাজন্ সশিষ্য উপবাসী আছি, স্নান করিয়া আসি সশিষ্য তোমার এখানে আজি পারণ করিব। বলিয়াই সর্ব্বদা-ক্রোধ-তাম্র দৃষ্টি দুর্ব্বাসা সশিষ্যে স্নানাহ্নিক উদ্দেশে গমন করিলেন। এদিকে দ্রৌপদীর ভোজনের পর আর পীপীলিকার পর্য্যন্ত আহারের কোন আশাই নাই। ভীম কাতর, অর্জ্জুন কাতর, নকুল প্রভৃতি সকলে কাতর, মুনির অভিশাপ ভয়ে ব্রহ্মশাপাগ্নি যেন নিরীক্ষণ করিয়াই যুধিষ্ঠির পাগল। তখন যদি দ্রৌপদী হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো বলিয়া ডাক দেন তাহা হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুনিতে পাইবেন কি না? অকারণ অ-কিরণ আ-কিরণের আবশ্যকতা আছে কি?

আবার দেখুন কুরুসভা মধ্যে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর বলে বস্ত্র হরণ করিতেছেন দুঃশাসন। পঞ্চ স্বামী আসীন, সভাস্থলে ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর আসীন, আসীন নয় কে? বিগলিতা বেণী যাজ্ঞসেনী কত করুণা করিলেন কত বুঝাইলেন, কত কাঁদিলেন কিছুতেই পাষণ্ডদের হৃদয় গলিল না, মন টলিল না। বিপরীতে, আবার রহস্য—শ্লেষ। তখন নিরুপায়; নারীধর্ম্ম লজ্জা ভয় মান স্ত্রীলোকের যাকিছু সব যায়; নিরুপায় হইয়া মা আমার ডাকিলেন কোথা হে অনাথের নাথ হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ, দীনবন্ধো একবার এস দাসীর লজ্জা রক্ষা কর। তখন কি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে টর্পিডোর প্রয়োজন ছিল? পাষণ্ড দলনকারী অনাথনাথ যখন আসিলেন তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বিলম্ব কেন, প্রাণ যে যায় দাসীকে এত কষ্ট দিতে হয়। দ্রৌপদী একটু তিরস্কার করিতেছেন বুঝিয়া ঠাকুরটি বলিলেন, তিনি ত কাহাকেও ছাড়িবার পাত্র নহেন—আমার আসিবার বিলম্বের কারণ তুমি, তুমি আমাকে দ্বারকানাথ বলিয়া ডাকিলে তাই আমাকে দ্বারকা হইতে আসিতে হইল, তুমি যদি হৃদয়নাথ বলিয়া ডাকিতে তাহা হইলে আমি একেবারেই দর্শন দিতাম।

ভাই পাঠক, আমরা এই হৃদয়নাথের কথা ভুলিয়া যাই, ভুলিয়া যাই তিনি এই হৃদয়েই আছেন, ভুলিয়া যাই তিনি হৃদয়নাথ বলিয়া ডাকিলেই উত্তর দেন। তাই বলি আমাদের কলকারখানায় কাজ কি? যে কল জগদম্বা আমাদের এই চৌদ্দ পোয়ায় দিয়াছেন তাই যথেষ্ট খুব যথেষ্ট। মা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত কর, গুরু কৃপায় তিনি xyz রেস্ হইয়া তোমার এমন কর্ণ দিবেন যে তুমি তাঁর কথা, মাভৈ, শুনিতে পাইবে; মুরলীধ্বনি শুনিতে

পাইবে। এমন চক্ষু দিবেন যে তুমি নিবিড় আঁধারে তাঁর চমকিত রূপরাশি দেখিয়া সদ্য প্রস্ফুটিত আকাশকুসুম দেখিয়া আনন্দে সোৎসাহে গাহিবে—

(সিন্ধু ভৈরভী—জৎ।)

হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥
নরকর কটিবেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ দিয়ে।
ত্যজি নরশিরমালা, পর গলে বনমালা,
(একবার) কালী ছেড়ে হও মা কালা, ওগো ও
পাষাণের মেয়ে।
হৃদ্‌কমলে কালশশী, দেখ্‌তে বড় ভালবাসি (আমি),
(একবার) ত্যজে অসি ধর মা বাঁশী, ভক্তবাঞ্ছা পুরাইয়ে॥

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

অন্তিমশয়ন।

প্রাণের অনন্ত গাথা ক্ষীণ কণ্ঠ গীতে
গাহিয়া ফুরা'ব কবে? পারিব ভুলিতে
অসীম বাসনা কবে সসীম জীবনে?
কবে শান্তি হবে মম অধীর পরাণে?
রবিকর তেজ সম সুতীব্র আবেগ,
হাসির বিজলি মাখা অভিমান মেঘ,
নেত্রহীন স্নেহ জ্যোতিঃ কবে কোন্ বেলা,
আঁধার জীবনে আর করিবে না খেলা?
শোক বাষ্পবারিসিক্ত "অন্তিম শয়নে",
আবেগ অশান্তি যবে মিশিবে স্বপনে,
স্নেহপ্রেম ভক্তিরূপে হেরিবে যখন,
অদূরে অমৃতসিক্ত পবিত্র চরণ,
তখনি ফুরাবে বুঝি অসীম বাসনা,
প্রাণের অনন্ত গাথা—ভবের ভাবনা।

দাদা।

ভানু ডুবে যায়, রাঙ্গা মে
সান্ধ্য-প্রকৃতি-গান;
ধরণীর মাঝে, কি যেন জেগেছে, শী-
সুন্দর, কি মহান!
ঝিকিমিকি বেলা, পাতা করে খেলা,
রত্ন মুকুট শীরে;—
তরুশাখে পাখী, উল্লাসে ডাকি
দ্রুত ঘরে যায় ফিরে।
বসি নদীকুলে, সন্ধ্যার কোলে
'শান্তি' কহিল ধীরে—
"দিন গেল বয়ে, পাখী গেল গেয়ে,
'দাদা'ত এল না ফিরে!
হেথা আমি একা, পথ গুলো বাঁকা,
ঘোর কানন বুকে;
আলো নিভে যায়; সান্ধ্য ছায়ায়
তাও যে ফেলিল ঢেকে!"
চাহি পথ পানে, চঞ্চল মনে,
উচ্চে ডাকিল "দাদা"!
কম্পিত সুরে, ঐ বুঝি দূরে
কে জানি কহিল দা—দা!
চমকিয়া ফেরে, কারে নাহি হেরে
কেবলি 'শান্তি' একা!
আঁধারের মাঝে, পথ ডুবে গেছে,
কিছু ত যায় না দেখা।
নদী পানে চায়, ধীরে বহে যায়;
শূন্যে তারকা চেয়ে!
বিটপীর সারে, আঁধারের পুরী—
মৃদু বায়ু যায় বয়ে।

...ন, অশ্রু নয়নে
পাইবে। এমন চক্ষু দি' শূন্যে ডাকিল "দাদা";
দেখিয়া সদা প্রস্কাথাকার সুর, কোথা ভেসে গেল—
মাঝে বায়ু দিল বাধা!

শন্ শন্ শন্, বহে সমীরণ,
কম্পিত তরুণীর।
কি জানি কি সুরে, গাহিল কে দূরে,
ঝরে অশ্রু—প্রকৃতির!
কি মহা সঙ্গীত, হইল উত্থিত,
বিশ্বে পড়িল সারা!
শান্তি সভয়ে, চারিদিকে চেয়ে
হইল আপনা হারা!
তালে তালে তালে, তটিনীর কোলে,
ঊর্ম্মি নাচিছে দুলে;
কুলু কুলু গান, ফুল্ল বয়ান
হর্ষে পড়িছে ঢলে।
নির আভরণ, শান্তি শয়ান,
মুদ্রিত দুটী আঁখি;
সঙ্গীত শুনে, শঙ্কিত প্রাণে
ক্ষুদ্র বদন ঢাকি।
বিদ্যুৎ বালা, করে গেল খেলা—
'শান্তি' দিল না সাড়া;
পাষাণ-নন্দিনী, নিল অনুমানি,
বুঝি কোন পথ হারা!
ধীরি ধীরি ধীরি লহরীর সারি
চুম্বিল তার করে;—
কথা ত কহে না, করে নাকো মানা;
নয়নে অশ্রু ঝরে!
সুন্দর হেরে, লহরীরা তারে
যত্নে লইল বুকে;
শুধু "দাদা" বলে, লহরীর কোলে
শান্তি উঠিল সুখে!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

পুণ্য, পৌষ ও মাঘ। পুণ্যে এবার অনেক গুলি চিত্র আছে। ৺কালী-প্রসন্ন সিংহের (মহাভারতের) চিত্রটি বেশ হইয়াছে। তাঁহার একটু জীবনী দিলে ভাল হইত। তিনি নাকি লাউ বদলে কাগজের তুম্বরু চালাইয়াছিলেন। খাদ্যপাকের মধ্যে আছে ঝালকাসুন্দি, দুধের হালুয়া, রুইমাছের দম্পক (দম্পোক্ত)। 'মঙ্গলসূত্র,' 'মানব শরীরে বহির্বায়ুর প্রভাব,' 'জড়ের সাধারণ গুণ' ও 'বাঙ্গালা ও আসামী ভাষা অভিন্ন নহে' উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রবন্ধটির শিরোবচন এক কিন্তু ভিতরে বিষয়টি অন্য প্রকার। আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ও আসামী মূলে ভিন্ন ভাষা নহে। তবে বহুকালের ব্যবহার বিকৃতি কে লোপ করিবে? আসামীরা যদি বাঙ্গালাভাষা না গ্রহণ করেন, স্বতন্ত্র চলেন, তবে আপনারা সাধ করিয়া দুঃখ পাইবেন। এই পর্য্যন্ত।

সৎসঙ্গ, মাঘ ও ফাল্গুণ। "প্রাচীন পদাবলী" কথাটা বৈষ্ণবকবিদিগের ...দাবলীই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাষায় শব্দ ব্যবহারের একটা দায়িত্ব আছে ...ান "এটিকেট" আছে। শুনিতেছি "শ্রীহরি" শাক্ত ছিলেন, আবার শুনি-...তি তিনি বৈষ্ণব হয়েন। কিন্তু লেখক যেটিকে শ্রীহরির শেষ গান বলিতে-...ন সেটি "শ্যামা আমারে দিও পদছায়া"। সুতরাং শব্দ ব্যবহারে প্রত্যবায় ...ছে। গানটি ছাড়া শ্রীহরির জীবনের ঘটনা কিছু নাই। বর্ত্তমান সময়ে ...রা এইরূপ শব্দ ব্যবহারের যথেচ্ছারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায়ই লক্ষ্য ...তেছি, সেই জন্য এই উপলক্ষে কথাটা বলিলাম। ভরসা করি সকলে ...গ্রহ করিয়া সাবধান হইবেন ও মনে রাখিবেন যে আইনের মর্য্যাদা ...ক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ভগবান যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করাইয়াছিলেন। ...ঙ্খলতা কখনই বীর্য্য-বিকাশ নহে। "সাঁওতাল" বিদ্রোহে তিনটি কথা ...ছে, (১) যতক্ষণ "আড়াইকাটি" বাজে ততক্ষণ সাঁওতাল উন্মত্ত ও রণ ...ড়িয়া পলাইতে জানে না। (২) বীরভূমের মাজিষ্ট্রেটের দোষে সাঁওতাল ...দ্রোহ শীঘ্র প্রশমিত হয় নাই। (৩) ১৮৫৫ সালের নবেম্বরে সামরিক ...াইন প্রচার করিতেও হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সালের শীতকালে বিদ্রোহ ...ান্তি হয়। গাজনে চঁচুড়ায় ৺ষণ্ডেশ্বরতলায় আড়াইকাটি বাজে। "রাধা

কে"?—লেখক চৈতন্য চরিতামৃত হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন "স্থূল কথায় ভগবান যেন একজন রাজা, মহামায়া তাঁহার বহির্ব্বাটীর তত্তাবধারিকা আর শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অন্তর্ব্বাটীর অধীশ্বরী।" এমন পার্টিসানের উপমায়ও হায় আমরা কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের "ধর্ম্ম প্রচারকে" "শ্রীরাধা" বলিয়া একটি প্রবন্ধ আছে। তাহাতেও কিছু পাইলাম না। শকুন্তলার 'কণ্ব' দীর্ঘ ডাউডেনী সমালোচন। এ ভারটা চন্দ্রনাথ বাবুর উপর দিলেই বেশ হইত। "ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালির যোগবল", শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী যোগশাস্ত্রী মহাশয়ের নিবাস কলিকাতা শ্যামপুকুর। রেবিনিউবোর্ডে চাকরি করেন। ইঁহার যোগনেত্র খুলিয়াছে। ইনি কলিকাতায় বসিয়া আমেরিকার চিকাগো সহরে মহামেলার ধর্ম্মবিভাগের সভাপতি স্মেল সাহেবের গৃহ দেখিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে ৯ই অক্টোবরে কলিকাতায় বসিয়া আমেরিকার National Spiritualist's Society নামক সভার অধিবেশন দেখিয়াছিলেন। একজন রাজার কোথায় গুপ্তধন আছে বলিয়া দিয়াছিলেন। World's Advanced thoughts নামক পত্রের সম্পাদকের কর্ণকুহরে কলিকাতায় বসিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি আমার চিত্রময়ী প্রতিকৃতি লণ্ডন সহরের ষ্টেড্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত Borderland নামক পত্রে দেখিতে পাইবেন।" সম্পাদক শুনিতে পাইয়াছিলেন। সৎসঙ্গের সঙ্গ সুখজনক বটে কিন্তু এখনও কাশীবাসের মত বলিতে পারি না।

ধর্ম্মপ্রচারক, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। এখানিও বেশ চলিতেছে। তবে ছাপা ও কাগজ বড় খারাপ। শিখদিগের দীক্ষামন্ত্রের নাম "সৎ-নাম"। তাহা এই। ১ওঁ সৎ নাম-কর্ত্তা পুরুষ নির্ভউ নির্বৈর অকাল-মূর্ত্তি অজুনী সৈভং গুরু প্রসাদি জপ। আদি সচ্, জুগাদি সচ্, হায়ভি সচ্, নানক হোসিভি সচ্। যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিখগণ "ওয়াগুরু কী ফতে" বলিয়া বীরদর্পে সমরানলে দেহ আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন—তাহা এই মন্ত্র। "বৈদিক প্রবন্ধ (দেবাসুর সংগ্রাম)" লেখক ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী আরম্ভে লিখিয়াছেন "মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবতে এবং অন্যান্য মহাপুরাণ বা উপপুরাণাদিতে দেবাসুরের সংগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের আলোচনার

দ্বারা সহসা দেবতা ও অসুর মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক্ বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু বেদ আলোচনা করিলে, পুরাণোক্তি রূপ কল্পনা মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। স্বয়ং পণ্ডিত মহাশয়ের মতে বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের সংগ্রামের অর্থ হইতেছে "মেঘ (বৃত্র) বিদ্যুৎ বিশিষ্ট বায়ুর দ্বারা (ইন্দ্রের দ্বারা) সর্ব্বতঃ তাড্যমান হইয়া জল হইতেছে।" স্বয়ং পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং এতটা কষ্ট স্বীকার না করিয়া স্বয়ং মোক্ষমূলারকে বা তদ্ভাবে স্বয়ং রমেশকে বরাৎ দিলেই পারিতেন। এইরূপ সৎসঙ্গের ফলস্বরূপ পণ্ডিত মহাশয় এক্ষণে স্বয়ং কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। আরও শুনিলাম বৈদিক প্রবন্ধ লিখিয়া "ধর্ম্ম প্রচারকের" কলেবর পুষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। আমরা ভীত হইয়াছি, জগদম্বার কি ইচ্ছা বলিতে পারি না। 'পুণ্য' ও 'হিন্দুপত্রিকা'তে ও (গোলকে সর্ব্ব দেব দর্শন) এইরূপ বিড়ম্বনার ভোগ হইতেছে। অতঃপর একজন লেখক লিখিবেন, বাল্মীক মণি একটা কাঁকড়াকে যমুনাতীরে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে দেখিয়াই দশরথের দিগ্বিজয় লিখিয়াছেন। রূপক কি না? "বিশুদ্ধানন্দ"—"স্বামী বিশুদ্ধানন্দ শাঙ্কর মঠের দণ্ডীসন্ন্যাসী এবং কাশীস্থ দণ্ডিস্বামীগণের মনোনীত আচার্য্য ছিলেন। ইঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য বিশ্বরূপ স্বামী এবং ইনি উভয়েই পূজ্যপাদ স্বামী তারক ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমান্বয়ে গুরুর স্থানে সমাসীন হইয়াছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় কাশীতে কয়েকটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যৌবনে হয়দরাবাদের নিজামের সামরিক বিভাগে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। গত ২৩শে বৈশাখ একাদশী তিথিতে, রাত্রি প্রায় ৩টার সময় মহাপুরুষ শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। দেহ পরদিন অহল্যা বাইয়ের ঘাটে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া যোগাসনে রক্ষিত হইয়াছিল। বেলা ১১টার সময় দেহ প্রস্তরময় পেটকের মধ্যে বন্ধ করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে জাহ্নবীক্রোড়ে সমর্পিত হইয়াছে। তৎপদে শ্রীমদ্ গঙ্গানন্দ সরস্বতী অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।" পাহাড়ী বাবা গেলেন, বিশুদ্ধানন্দ গেলেন, অদ্বৈত বংশের বিজয়কৃষ্ণ গেলেন, আবার ভাস্করানন্দ গেলেন। শীঘ্র কোন দুর্বিপাক ঘটিবে নাকি? সাধুরা পলাইতেছেন কেন? জগদম্বে এ কি মা?

গত ২৫শে আষাঢ় রথের দিন ৺কাশীধাম অন্ধকার করিয়া, আনন্দ বাগকে নিরানন্দে ভাসাইয়া ভাস্করানন্দ সরস্বতী স্বামী মহাশয় তিরোভাব

হইয়াছেন। ইনি কানপুর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে আশ্বিন শুক্লা সপ্তমীতে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইঁহার নাম ছিল, মতি-রাম। প্রথমে গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করেন। প্রথমে সংসারও করিয়াছিলেন। একটি পুত্রসন্তান হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইনি অল্প বয়সেই যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। সাতাইশ বৎসর বয়ক্রমে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পাথরের বাক্‌সের মধ্যে দেহ রাখিয়া আনন্দ বাগেই সমাহিত করা হইয়াছে। ঐ সমাধিস্থানের উপর একটি মঠ নির্ম্মিত হইবে। কে বলিবে এত অল্প বয়সে অকালে কেন তিনি লীলা-দেহ ত্যাগকরিলেন? আমাদের ভরসা এখন মাতাজী।

সাবিত্রী, স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই প্রাতঃস্মরণ—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃত পাপসঞ্চয়ঃ।
সোঽহ্নিশেষ ক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্‌ঘ্রি পঙ্কজম্।

ও ইহার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। তারপর সাবিত্রী উপাখ্যান চলিতেছে। "শ্রীতুলসীর কথা", আদর্শ স্ত্রী-চরিত্র (দময়ন্তী)। মৃণালবালা (উপন্যাস)। "মর্ম্মোচ্ছাস"। গয়ামাহাত্ম্য। কৃষ্ণায় তুভ্যম্ নমঃ। গৃহিণী। নিত্যমিলন নির্ম্মলা (উপন্যাস)। প্রায় সকল প্রবন্ধগুলিই ক্রমশঃ। ইহা ভাল নয়। সাবিত্রী কি দেখাইবার জন্য সব প্রবন্ধগুলির পরিচয় দিলাম। কিন্তু আমাদের মন উঠিল না। সম্পাদক মহাশয়কে খাটিতে হইবে। বিষয়নির্ব্বাচনে দৃষ্টি নাই। চাই।

নির্ম্মাল্য, বৈশাখ। "আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি" দুই জন স্ত্রী কবির আংশিক বিবরণ। 'একখানি পত্র', সম্পাদক মহাশয় পত্রখানি ফাইলে রাখিয়া ভ্রমক্রমে প্রেসে পাঠাইয়াছিলেন। 'ধর্ম্মবিবেক', রাজার অলক্ষ্মী ক্র পুরাণ গল্পটি। 'পরিচারক' গল্প। 'পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ' বৈষ্ণব কবি ভাণ্ডার হইতে। 'মহারাজা রাজবল্লভ'—বঙ্গে এখন ইতিহাস-যুগ। সুখের কথা, কিন্তু তাহা বলিয়া ভিত্তিহীন অনুমান জনজীবন বা ইতিহাস নহে। রাজবল্লভ প্রবন্ধ এখনও আরম্ভ হয় নাই মনে করিলাম কিন্তু ওরূপ ইংরেজীর বুকনি সন্ন্যাসীর পাতে মাছের মুড়োর উষ্ণ-শয্যার ন্যায় দেখায়। কবিতা-গুচ্ছে "মোছআঁখি"টি বেশ।

মৃত্যুর পর।

(১৯)

পঞ্চদশ অধ্যায়ে একস্থলে বলিয়াছি স্বর্ণময়ী কালীর বর্ণতত্ত্বের ও কুল-কুণ্ডলিনীর সতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের কথা এখন বলিতে পারিলাম না। উদাহরণও এখন দিতে পারিলাম না। আর সপ্তদশ অধ্যায়ের এক স্থানে বলিয়াছি "বেদের শ্লোককে বরাবর মন্ত্র বলিয়া আসিতেছি, লোকে 'মন্ত্র বলে তাহাও শুনিয়া আসিতেছি—সে মন্ত্র কি তাহা ত বুঝিতে হইবে?—মন্ত্রশক্তি কি তাহা ত বুঝা চাই।" আর এক স্থানে, বেদমন্ত্র পাঠ করিলে দেবতা আসিয়া যজ্ঞীয়বস্তু গ্রহণ করেন। * * এমনই মন্ত্রের মহিমা এবং মন্ত্রশক্তির এতই গরিমা।" এক্ষণে এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিব। মন্ত্রতত্ত্ব যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন মন্ত্রশক্তিতে যাঁহার ঐকান্ত বিশ্বাস হইয়াছে, ভব-কারাগারে তাঁহার মেয়াদ ফুরাইয়াছে, একথা ধ্রুব সত্য।

এই মন্ত্রতত্ত্ব আলোচনা করিতে "তন্ত্রতত্ত্ব"ই আমাদের প্রধান সহায়। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নিকট আমরা চিরঋণী আছি ও চিরকাল থাকিব। আমার কার্য্য সঙ্কলন বার বার বলিয়াছি। আরও বলিয়াছি নিজের ভাষায় বলা আমার আন্তরিক অনিচ্ছা। কিন্তু বিদ্যার্ণব মহাশয়ের ভাব প্রভৃতি আগাগোড়া বজায় রাখিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে এই জন্য তাঁহার যুক্তি ও ভাষার ও তর্কের যথেচ্ছ ব্যবহার করিলাম। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের আশীর্ব্বাদেই আমরা বলীয়ান্। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের দু একটা কথা কোথাও বলিতে হইতেছে।

একদল লোক আছেন তাঁহারা বলেন, বেদই বল, তন্ত্রই বল, অপর শাস্ত্রই বল আর মন্ত্রই বল সকলই মনুষ্যের সৃষ্টি। আর মন্ত্রের কোনকালে কোন ক্ষমতা ছিল কি না জানি না কিন্তু এখন এই দেখি শুনি ও বুঝি যে মন্ত্র ।ফস্‌ফিসিনি ও বীজবীজনি বই আর কিছু নয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা শাস্ত্রের দাস। আর ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলিবে। শাস্ত্রের কর্ত্তা কেহই নাই তবে শাস্ত্রকে প্রকাশ করিয়াছেন, মা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ঋষিগণ। শাস্ত্র স্ব প্রকাশ এবং স্বতঃসিদ্ধ। শাস্ত্র ভূয়ো দর্শনের ফল নহে।

আগম নিগমের অর্থ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। বেদকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন।

বেদং ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানীহি নগনন্দিনি
স্বয়ং প্রবর্ত্ততে বেদ স্তৎকর্ত্তা নাস্তি সুন্দরি
স্বয়ম্ভবে ভগবতা বেদো গীতস্তথা পুরা
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোস্য ন কারকাঃ

—বৃহন্নীলতন্ত্র।

অর্থাৎ নগনন্দিনি বেদকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া জান, সুন্দরি বেদ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়। কেহ তাহার কর্ত্তা নাই। পুরাকালে ভগবান কর্ত্তৃক স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকটে বেদ গীত হয়। তদবধি স্বয়ং মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষিগণ পর্য্যন্ত যুগে যুগে সকলেই বেদের স্মরণ কর্ত্তা, কেই "কর্ত্তা" নহেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে বেদ ব্রহ্মের নিশ্বাসনির্গত। ইহাতে পরমেশ্বর বেদ প্রণয়ণ করিয়াছেন এরূপ বুঝায় না। 'আমার নিশ্বাস' বলিলে কি বুঝিতে হইবে, আমি আমার নিশ্বাস প্রণয়ণ করিয়াছি? নিশ্বাস নিত্য পদার্থ ও স্বপ্রকাশ তবে জড়দেহ অধিকারে আছে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ব্রহ্মের দেহ ত পাঞ্চ ভৌতিক দেহ নহে, সে দেহের সবই ব্রহ্ম—নিশ্বাসও ব্রহ্ম। তাই বলিয়াছেন বেদকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া জান। শাস্ত্রে দোষ আছে কি না শাস্ত্র ঠিক কি না—এ বিচার মানুষের চলে না।

দোষাঃ সন্তি ন সন্তীতি পৌরুষেয়েষু বিদ্যতে।
বেদে কর্ত্তুরভাবাত্তু দোষশঙ্কৈব নাস্তিব।

দোষ আছে, না আছে, এ বিচার পুরুষনির্ম্মিত বাক্যে সম্ভবে, বেদে কর্ত্তার অভাব হেতুক দোষের আশঙ্কাই আদৌ নাই। ভগবান নিশ্বাসরূপ বেদকে সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রকাশ এবং মহাপ্রলয়ে পশ্বাসরূপে সংহরণ করিয়া থাকেন মাত্র। আরও আমি যেমন আমার প্রতিবেশী রামচন্দ্রের সব দেখি ও সব জানি ও সমালোচন করিতে পারি, মানুষ সেইরূপ ভগবানের সব দেখিয়া ও জানিয়া সেই মন্ত্রের সমালোচন করিতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরের কিছুই জানে না বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। মানুষ যদি ভগবানের সব জানিবে তবে ভগবানের ঈশ্বরত্ব রহিল কোথায়? ভগবান স্বপ্রকাশ হইলেও কখনও দৈবকীর কখনও কৌশল্যার গর্ভে ইচ্ছা করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া

থাকেন। বেদও সেইরূপ স্বপ্রকাশ হইয়াও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাবলম্বনে ভগবানের হৃদয়ে আবির্ভূত এবং নিশ্বাস নির্গত। প্রদীপের প্রকাশে অন্ধকার নাশ হয় কিন্তু প্রদীপকে কেহ প্রকাশ করে কি? শাস্ত্রের আর একটি নাম "আপ্তবাক্য" ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা বিরহিত যাহা, তাহাই আপ্ত। (ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা বিরহিতত্বমাপ্তত্বম্)। ভগবান স্বয়ং শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছেন "শব্দ ব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মদীয়া শাশ্বতী তনুঃ "অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম (শাস্ত্র) এবং পরব্রহ্ম (তুরীয় চৈতন্য) এ উভয়ই আমার নিত্য শরীর। পরমেশ্বরী নরলোচনের অগোচর হইলেও শাস্ত্রমূর্ত্তি অবলম্বনে জগদ্ধাত্রী সাজিয়া জগৎকে ক্রোড়ে করিয়া বলিতেছেন আর অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং, বেদান্ন প্রমদিতব্যং মাচারান্না পগন্তব্যম্", প্রমাদভরে সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না, বেদ হইতে পরিচ্যুত হইও না, আচার হইতে উৎপথে গমন করিও না।" এই গভীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনুসরণ করিয়া পর্ব্বতে, প্রান্তরে, তপোবনে, নদীতীরে, কুটীরে, মন্দিরে, রাজেন্দ্রগণের যজ্ঞমণ্ডপে, গৃহস্থগণের গৃহকক্ষে, ব্রহ্মচারীর আশ্রমে, কোটী কোটী যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছে; পৃথিবীর যজ্ঞাগ্নির প্রভায় স্বর্গীয় সৌধশিখর রঞ্জিত হইয়াছে; দ্বাদশ বার্ষিক, শত বার্ষিক, সহস্র বার্ষিক ব্রতে যজ্ঞ সমাপন করিয়া তপোনির্দ্ধূতকল্মষ কলেবরে কত কোটী কোটী আর্য্য মহাপুরুষ ব্রহ্মলোকের উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহার ইয়ত্তা করিবে? কিন্তু "আজ্ বেদের কোন্ শাখার কোন্ মন্ত্র পাঠ করিয়া কে কোন্ স্বর্গস্থ দেবতাকে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত করিয়া দিবে? সেই দৈনিক লক্ষ লক্ষ সমিৎপুঞ্জের সংগ্রহ আজ্ কোথা হইতে হইবে? দৈনিক দশ সহস্র গোহত্যা যে ভারতবর্ষের রাজধানীর নিত্যকৃত্য, আর কি সেই ভারতবর্ষ হইতে স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় পয়স্বিনী গাভীগণের দুগ্ধস্রোত ঘৃত-স্রোত প্রবাহিত হইবে? আর কি প্রতি যজ্ঞকুণ্ড মধ্য হইতে ভৈরব-জ্বালা-বলিসঙ্কুল বহ্নিস্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া জটাজুটবিমণ্ডিতশ্মশ্রুলমুখমণ্ডল শ্রুক্ শ্রুব-ধারী ব্রহ্মতেজোময়মূর্ত্তি ভগবান্ বৈশ্বানর "বরং বৃণু" বলিয়া যজমানের সম্মুখে দাঁড়াইবেন? আর কি যজ্ঞবিঘ্নভয়ভীত রাক্ষসাসুরবিদ্রাবিত ঋষিগণের প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠভবন শূন্য করিয়া যজ্ঞরক্ষার্থ ধরাধামে অব-তীর্ণ হইবেন? আর কি যজ্ঞাগ্নি হইতে শুকদেবের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী, দ্রৌপদীর

এই জন্য উল্লিখিত বাক্য অপঞ্চনখ ভক্ষণের নিবৃত্তিপর। ইহাকে পরিসংখ্যা বিধি বলে।

এই তিন বিধির লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে কেবল মন্ত্রের দ্বারাই বৈদিক প্রয়োগ ও বৈদিক অর্থের জ্ঞান হয়, অন্যরূপে হয় না, ইহা একটি নিয়মবিধি।

বিধেয় অর্থের পরিচ্ছেদককে "নামধেয়" বলে। যেমন "উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ"। পশু কামনা করিলে যে সে যজ্ঞ করিলে হইবে না। কেবল মাত্র "উদ্ভিদ্" যজ্ঞ করিতে হইবে। "উদ্ভিদ্" এক যাগ বিশেষ। নানারূপ যাগ থাকিলেও উদ্ভিদ্ শব্দ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া একরূপ যাগ বুঝায়। এই জন্য "উদ্ভিদ্" শব্দ নামধেয়।

যে বাক্য দ্বারা পুরুষকে কোন কার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করে তাহাকে "নিষেধ" বাক্য বলে। যেমন "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ", "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি।

প্রাশস্ত্য কিম্বা নিন্দাপর বাক্য "অর্থবাদ"। লক্ষণা দ্বারা অর্থবাদ কোন মাত্র প্রয়োজন বিশিষ্ট অর্থে পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ প্রশংসা দ্বারা অর্থবাদ বিধিবাক্য প্রবর্ত্তিত এবং নিন্দা দ্বারা নিষেধ বাক্য হইতে নিবর্ত্তিত করে।

জৈমিনির মীমাংসা দর্শনে বেদের এই পাঁচ লক্ষণ বিবৃত রহিয়াছে। পঞ্চ লক্ষণযুক্ত বেদ দ্বারা যাগ করিবার উপায় অবগত হওয়া যায়।

যাগের স্বরূপ দ্রব্য ও দেবতা। অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগকে যাগ বলে। দ্রব্য ত্যাগ করিলে যে উপায়ে সেই দ্রব্য দেবতার নিকট উপনীত হইতে পারে, অলৌকিক বেদ মনুষ্যকে সেই উপায় বলিয়া দিয়াছে। দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম, এই ছয় অঙ্গে শুদ্ধ হইলে তবে যাগরূপ ধর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

যে দেশে কৃষ্ণসার হরিণ বিচরণ করে এবং যে দেশে আচারবান্ পুরুষ বাস করে, সেই দেশ শুদ্ধ। "সর্বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে।" অশুদ্ধ দেশে যজ্ঞ করিলে সে যজ্ঞ ফলদায়ক হয় না।

পূর্ব্বাহ্লাদি কাল শুদ্ধ। যে সময়ে যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য পাওয়া যায় না, যে সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি দ্বারা কর্ম্ম নিবর্ত্তিত হয়, সূতকাদি দ্বারা যে সময়ে অশৌচ হয়, সেই সময় অশুদ্ধ।

দ্রব্যশুদ্ধি নানাবিধ। জল আদি পার্থিব দ্রব্য দ্বারা, সংস্কার দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মহত্ত্ব দ্বারা, অল্পত্ব দ্বারা, এইরূপ নানা উপায়ে দ্রব্যের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা, বীর্য্য, সংস্কার ও কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তা শুদ্ধ হইয়া থাকেন।

সদ্গুরুর মুখারবিন্দ হইতে যথাবৎ জ্ঞানই মন্ত্রের শুদ্ধি। অশুদ্ধ মন্ত্র ফলদায়ক হয় না বরং কখন কখন বিপরীত ফলদায়ী হয়।

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থ মাহ।
সবাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥ শিক্ষা।

ত্বষ্টা এই বলিয়া আহুতি দিলেন, যে "স্বাহা ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব।" যদিও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে বৃত্র ইন্দ্রের শত্রু হইবে। কিন্তু স্বর কর্ত্তৃক সমাসের অন্য অর্থ হওয়াতে ইন্দ্রই বৃত্রের শত্রু হইলেন। এই জন্য মন্ত্রের শুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয়। দেবার্পণই কর্ম্মের শুদ্ধি। যে কালে যাগের প্রচার হইয়াছিল, সে কালে সকামতা এত প্রবল, যে মনুষ্যকে নিয়মের অধীন করাই তখন অত্যন্ত দুরূহ ছিল। প্রবল কামনাযুক্ত মনুষ্য একবারে কামনা ত্যাগ করিতে পারে না। তবে যদি সে যথেচ্ছাচার না হয়, তাহাই তাহার পরম ধর্ম্ম। বেদ বিধি ও নিষেধ বাক্য দ্বারা মনুষ্যকে বলিলেন তুমি এই কায করিও, এই কায করিও না।

স্বভাবের বিরুদ্ধ কায করিতে হইলেই, মনুষ্যের প্রলোভন আবশ্যক হয়। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিব, অন্যের দাস্যবৃত্তি করিব। কেন, না তাহা হইলে ধন পাইব। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মনুষ্য কি না করিতে পারে। তাই স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, বেদ মনুষ্যকে সদাচার ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন। "অপামসোমমমৃতা অভূম"। আমরা সোম পান করিয়া অমর হইব।

স্বর্গের লোভ, মিথ্যা লোভ নহে। কারণ বিধিও নিষেধ বাক্য পালন দ্বারা মনুষ্য পুণ্য সঞ্চয় করে। এবং সেই পুণ্য দ্বারা বহুকাল যাবৎ স্বর্গলোকে অবস্থান করে।

তবে স্বর্গই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। বাস্তবিক উদ্দেশ্য কামনা ত্যাগ। কারণ কামনা ত্যাগ দ্বারা মনুষ্য স্বর্গের উচ্চ পদবী লাভ করিতে পারে। যতদিন আমাদের কামনা থাকে, ততদিন আমরা ত্রিলোকীর মধ্যেই বিচরণ করি। নিষ্কাম হইলেই মহর্লোক আদি ঊর্দ্ধতন লোকে গমন করিতে পারি।

ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ॥ ভা-পু-৩-১০-৯।

এই শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলেন, যে ত্রৈলোক্য কাম্যকর্ম্মের

বিপাক এই জন্য প্রতি কল্পে ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি ও নাশ হয়। মহর্লোক প্রভৃতি নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল। এই জন্য দ্বিপরার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল লোকের নাশ হয় না। দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবশানে ঐ সকল লোকবাসীদিগের প্রায় মুক্তি হয়।

কিন্তু যতদিন সকামতা প্রবল থাকে, ততদিন কামনার নিরোধ দ্বারা আমরা বড় জোর স্বর্গে যাইতে পারি।

এই জন্য স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, দেবতা উদ্দেশ্যে যাগ করিতে বলিয়া, বেদ আমাদিগকে যথেচ্ছাচার হইতে বিরত করেন, আমাদিগকে সদাচারের শিক্ষা দেন, এবং আমাদিগকে নিবৃত্তির পথে আনীত করেন।

যাঁহারা যাগকে চরম উদ্দেশ্য মনে করেন, তাঁহারাই ভুল করেন।

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মোনৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহ ভয়াপহঃ॥

ভা-পু-১১-১২-১৮।

বেদ যে বিষয় হইতে আমাদিগকে নিবর্ত্তিত হইতে বলেন, আমরা সেই পরিমাণে সেই বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত হই। মনুষ্যের এই ধর্ম্মই মঙ্গলজনক ও শোক মোহ ভয় নাশক।

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্য রোচনম্॥ ১১-২১-২৩

বৈদিক কর্ম্ম করিয়া স্বর্গ লাভ হইবে। এইরূপ যে ফল বাক্য শুনা যায়, সে শ্রেয়ো লাভের জন্য নহে। সে কেবল রোচনা মাত্র। বাস্তবিক নিষ্কামতা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় এই কথা বলিবার আশয় করিয়া, অবান্তর ফল দ্বারা কথঞ্চিৎ কামনা রোধক বৈদিক কর্ম্মে মনুষ্যকে প্রবর্ত্তিত করাই ফলবাক্য কথনের তাৎপর্য্য। যেমন "পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ড লড্ডুকান্" এই বলিয়া পিতা পুত্রকে তিক্ত ঔষধ খাওয়ান। ফল, আরোগ্য। লাড়ু, কেবল রোচনা মাত্র। এইরূপ স্বর্গফল কেবল রোচনা মাত্র।

তাই জৈমিনি দর্শনের অর্থ সংগ্রহ করিয়া লৌগাক্ষি ভাস্কর যেন সঙ্কুচিত ভাবে বলিতেছেন—"এবং চ যজেত স্বর্গকাম ইত্যাদিনিখিলবেদস্য সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা যাগাদি ধর্ম্মপ্রতিপাদকত্বম্ সিদ্ধম্। সোঽয়ং ধর্ম্মো যদুদ্দিশ্য বিহিত স্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণস্তদ্ধেতুঃ। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তনিঃশ্রেয়সহেতুঃ।"

"যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমগ্র বেদ কেবল যাগাদি ধর্ম্মকেই প্রতিপাদন করিতেছে। স্বর্গ উদ্দেশ করিয়া ঐ ধর্ম্মবিহিত হইয়াছে। এই জন্য উহা দ্বারা স্বর্গ লাভ মাত্র হয়। কিন্তু ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম আচরণ করিলে সেই ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়সের কারণ হয়। কিন্তু তাহার প্রমাণ কোথায়। লৌগাক্ষি ভাস্কর বলেন—ন চ তদর্পণ বুদ্ধ্যানুষ্ঠানে প্রমাণাভাবঃ। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্। ইতি ভগবদ্গীতাস্মৃতেরেবপ্রমাণত্বাৎ।

আমরা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিব ভগবদ্গীতা কিরূপ প্রমাণ, এবং লৌগাক্ষি ভাস্কর বেদের সমতুল্যরূপে ভগবদ্গীতাকে প্রমাণ বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না কেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বাল-বিধবা।

তারাময়ী যামিনীর কুসুম কোমল
আশাভরা জ্যোৎস্না-দীপ্ত-স্ফীত বক্ষোপরে,
নীরবে সাজায়ে চিতা জ্বালিয়া অনল,
ঐ বুঝি ডুবে শশী প্রদোষ তিমিরে!
সুখপূর্ণ জীবনের ক্ষণিক স্বপনে,
গেঁথে সে আশার মালা পরেছিল গলে;
প্রেমময় জীবনের মিথ্যা জাগরণে,
ভাবেনি সে চাঁদ কভু ডুবিবে অকালে।
লাবণ্য বিকাশে ফুল্ল নবীন যৌবনে,
হাসি-গীত মাখা তার দেহ আভরণ,
মিলাইবে অশ্রু সিক্ত মলিন বসনে,
সুখের স্বপনে হেন ভাবেনি কখন';
কখন' ভাবেনি তার অপূর্ণ জীবনে,
সহসা ডুবিবে চাঁদ—ঘুচিবে স্বপন!

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার।

বিরহ।

বিরহ কথাটি বড় হৃদয়বিদারক। পাছে বিরহ ঘটে, তাই আমরা প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তর প্রদেশে লুকাইয়া রাখিতে চাই। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে বিরহিনী নলিনী প্রাণ ত্যাগ করে। প্রাণাধিক বসন্ত সহচরকে হারাইয়া প্রকৃতি সুন্দরী ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া পড়েন। যাহার সহিত প্রাণে প্রাণে মিলন হয় তাহার বিরহ বড়ই অসহনীয়। প্রেমিক কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন,—"বিরহ হইলে কেহ না জিয়য়।"

আবার বিরহের আর একটি বিষম দোষ—সন্দেহ উৎপাদিত করা। এই সন্দেহ হইতেই প্রেমবন্ধন শিথিল হয়, ইহাই প্রণয়ের মহাশত্রু। যদি শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা দেবীর বিরহ সংঘটিত না হইত তবে অগ্নিপরীক্ষা হইবে কেন? কেনই বা পতিরতা জনকনন্দিনী শ্রীরামের ত্যজ্যা হইবেন? গোবিন্দলাল ভ্রমর যদি বিচ্ছিন্ন না হইতেন তবে তাঁহাদের সোণার সংসার পুড়িয়া ছারখার হইত না। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিরহ যে প্রেমের মহান্ শত্রু তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সকল জিনিষেরই দোষ গুণ আছে। আবার কাহাতেও এমন একটি বিশেষ গুণ আছে যে একটি মাত্র গুণে সমস্ত দোষ উপেক্ষিত হয়। প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা এক সময় সখীর প্রতি বলিয়াছেন,— "ঐছন এক গুণে বহু দোষ নাশা।"

জগতটা বিরহকে ভয় করিতেছে, তাহার হস্ত হইতে দূরে থাকিবার জন্য সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। যেন সে বড়ই নির্ম্মম! দৃষ্টি মাত্রে বুঝি হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিবে! বিরহ যে ভয়ানক তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তাহা হইলেও তাহার একটি বিশেষ গুণ আছে, তাহা এই যে এক দিকে সে যেমন প্রিয়জনের মনে সন্দেহ উৎপাদন করে অপরদিকে তদ্রূপ প্রিয়জনের হৃদয়ে প্রিয়জনের মূর্ত্তি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দেয়। বিরহী ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে ভ্রমণে একদণ্ড তাঁহার সেই ভালবাসার মূর্ত্তিটিকে বিস্মৃত হইতে পারেন না। বিরহীর নিকট তাঁহার প্রিয় বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি বিশ্বব্যাপী। বিরহী তাঁহার প্রিয়বস্তুর ছবি ভিন্ন জগতে আর কিছুই দেখিতে পান না। সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদখানির দিকে চাহিলে তাঁহার হৃদয়ে প্রিয় বস্তুর মাধুরী জাগিয়া উঠে। প্রভাতের শিশিরাক্ত প্রফুল্ল নলিনী দর্শন

করিলে তাঁহার সেই বিরহী প্রিয়জনের অশ্রুপূর্ণ বদনখানি হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। এমন সময় নাই, যে সময় বিরহী তাঁহার প্রিয়জনের বদনখানি স্মরণ না করেন। মিলন চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হারাই হারাই ভাবই তাহাতে প্রবল বিরহ অনন্তকালব্যাপী "ওই এল ওই এল" ভাবই তাহাতে অধিক "পড়ে পাতার উপর পাত, ওই এল প্রাণনাথ"। মিলন আতঙ্কময়, বিরহ আশাপূর্ণ। পূর্ণ। বিরহ আছে বলিয়াই মিলনে মাধুর্য্য আছে। বিরহ না থাকিলে মিলন ঘটিত না ও মিলনের মাধুর্য্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারিত না। প্রণয় জগতে বিরহই রাসায়নিক পদার্থ, বিরহেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই,

"আয়রে বিচ্ছেদ তোরে যতনে রাখি হৃদিমন্দিরে।
এ জনমের মত তোরে সে সঁপে গেছে আমারে॥
বিচ্ছেদরে বিচ্ছেদ হয়ো না, করি রে তোর উপাসনা,
তুমি রহিলে অন্তরে সে রবে না অন্তরে।"

এই প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে।

এক সময় প্রেমপাগলিনী বিরহিনী রাধিকা বলিয়াছিলেন,—

"পহিলহিরাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমন না হাম রমণী।
দুঁহু মনো মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠানে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন।
দুঁহুকো মিলনে মাঝে পাঁচ বান॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি।"

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে আমাদের প্রথম দর্শনে যে রাগোদয় হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া সীমা অতিক্রম করিয়াছে আর সেই রাগ তিনি পুরুষ আমি রমণী বলিয়া যে উদিত হইয়াছিল, তাহা নহে, অজ্ঞান তখন ছিল না। পরস্পরের দর্শনে যে রাগোদয় হইয়াছিল, তাহাই মদনরূপে আমাদের পরস্পরের মিলন ঘটাইয়াছিল, অন্য দূতী খুঁজি নাই।

এখন হে বিরাগ (বিরহ) তোমাকে আমার দূতীকার্য্যে বরণ করিতে হইল। ইহাতেই বুঝিয়া দেখ বিরহ ব্যতীত মিলন হইতে পারে না। বিরহই প্রেম পরিবর্দ্ধনের প্রথম উপায় তাই প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে বিরহ সাধন করিয়াছেন ও জীবকে বিরহ শিক্ষা দিয়াছেন। বিরহই প্রেমের গাঢ়ত্ব স্থাপন করে তাই শ্রীকৃষ্ণ মাথুরের (বিরহের) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীমতীর প্রেম যে শতগুণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শ্রীরাধিকার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বিরহই প্রেম প্রেমই বিরহ, প্রেমের সমস্ত অংশ জুড়িয়া বিরহ অবস্থান করিতেছে, সেই জন্যই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়াও বলিতেছেন,—

পিরীতি পিরীতি কিরীতি মুরতি,
পরাণে লাগল যে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল
পরাণ পুতলি যথা।
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বালিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল॥ চণ্ডীদাস।

তাই বলি বিরহ ব্যতীত প্রেমের আর কি আছে। এই বিরহ যে কত মধুময় যিনি প্রেমিক তিনিই তাহা অনুভব করিয়াছেন। মিলনে "গেল গেল" বিরহ চিরস্থায়ী। যে মিলন চায় সে প্রজ্জ্বলিত কালানলে হস্তক্ষেপ করে মাত্র।

তোমরা যাহা ভালবাস তাহা নাও, আমি কিন্তু,—

অস্থির চপলা সম, বজ্রাধিক নিরমম,
চাহি না চাহি না ওগো এমন মিলন,
মোরে কর আশীর্ব্বাদ, পুরে যেন মনসাধ,
আমি যেন নিতি করি বিরহ সাধন।

প্রেমগাথা ও মর্ম্মগাথা রচয়িত্রী।

কান্যকুব্জে রাজসূয় এবং স্বয়ম্বর।

কান্যকুব্জে রাঠোর বংশীয় রাজপূত রাজগণ বহুকাল হইতে রাজত্ব করিতেন। ইং ১১০০ এগার শতাব্দীর পরে জয়চন্দ্র নামক জনৈক রাঠোর কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রবল প্রতাপের সহিত তথায় রাজত্ব করেন। কোহান বংশীয় রাজপুত রাজগণ রাঠোর রাজবংশের প্রবল ও প্রধান শত্রু ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের বিষয় যেরূপ মহাভারতে বর্ণিত আছে, ঐ সময়েও সেইরূপ যুদ্ধ প্রায় সততই হইত। কোহান ও রাঠোর বংশীয় রাজাগণের মধ্যে পরস্পর যে সকল যুদ্ধ ঐ সময়ে হইয়াছিল, তদবলম্বনে কএকখানি গ্রন্থ হইয়াছিল ও ভাটমুখে বংশমর্য্যাদার সহিত সততই তাহা শুনিতে পাওয়া যাইত। কোহান বংশ ব্যতীত প্রায় সকল রাজাই জয়চন্দ্রের অধীনতা স্বীকার করিলেন, সুতরাং জয়চন্দ্র অতি অল্প দিনের মধ্যে রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন। রাজমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া মাণ্ডলিক উপাধি ধারণ করিলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিমে ও উত্তরে অবস্থিত দেশের রাজাকে পরাস্ত করিলেন ও অপর আট জন করদ রাজাকে বন্দী করিলেন।

পূর্ব্বপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে মনুষ্যের মন স্বভাবতই ধাবিত হয়, এবং ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার চরমসীমায় উপনীত হইয়া রাজা জয়চন্দ্রের তাহাই হইল। ভারতবর্ষের রাজমণ্ডলীর মধ্যে যিনি যখন রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন, তিনি কখন কখন রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ও অধ্যক্ষতায় ও পিতামহ ভীষ্মদেবের উৎসাহে রাজা যুধিষ্ঠির আপন দিগ্বিজয়ী ভ্রাতৃগণের সাহায্যে উক্ত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা ও ঋষিগণের অনুমোদন মতে ভারতবর্ষের সমসাময়িক রাজগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ যেমন মহত্ত্বের পরিচায়ক তেমনি বিপদ সঙ্কুল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের ঐ যজ্ঞে অস্ত্র ধারণ করিয়া, বিদ্রোহি রাজমণ্ডলীর অগ্রগণ্য ও নেতা শিশুপালকে দমন করিয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক উক্ত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের পর আর রাজসূয় যজ্ঞের কথা শুনা যায় নাই। এক্ষণে রাজা জয়চন্দ্র তাহা আপন বাহুবলে সম্পন্ন করিতে সাহসী ও উদ্যোগী হইলেন।

রাজা জয়চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার আরও একটি গূঢ় কারণ ছিল।

ঐ সময়ে আপন কন্যার বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য স্বয়ম্বর সভাও করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া এক কার্য্য দ্বারা দুই মহৎ ও বিপদ ভূয়িষ্ঠ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। ভারতবর্ষে যখনই স্বয়ম্বরের কথা শুনা যায় তখনই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীরাজের কন্যাগণের ও দ্রুপদরাজনন্দিনী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্বয়ম্বরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ভীষ্মদেব একরথে জয়ী হইয়া, কন্যাগণকে হরণ পূর্ব্বক আপন ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। দ্বিতীয় স্বয়ম্বরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে পঞ্চপাণ্ডব জয়ী হইয়া পাঞ্চালীকে বিবাহ করেন। নিজ বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া আপন বাহুবলে এই উভয় কর্ম্মেই রাজা জয়চন্দ্র উৎসাহী ও ব্রতী হইলেন।

এই যজ্ঞে ভারতবর্ষের সমগ্র রাজমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিবারের সমরসিংহ ও দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ এই দুই জন মাত্র আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষা করতঃ স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বংশ মর্য্যাদা ও ক্ষত্রিয়গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। জয়চন্দ্রের দুর্ম্মতি হইল; তিনি এই উভয় রাজার প্রতিমূর্ত্তি সোণায় গঠিত করতঃ সমরসিংহের মূর্ত্তি অন্যান্য রাজমণ্ডলীর মধ্যে স্থাপন করিয়া, জয়চন্দ্রের মূর্ত্তি সভামণ্ডপের দ্বারদেশে দ্বারবানের আসনে স্থাপন করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাপিত সমরানল ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

স্বয়ম্বরের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইল ও মহা সমারোহের সহিত সভামণ্ডপ সজ্জিত হইল। স্বয়ম্বরের জন্য কন্যা অনীত হইল। হঠাৎ ক্ষত্রিয়োচিত বীরদর্পে পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে আসিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া লইলেন। জয়চন্দ্র অন্যান্য রাজগণের সাহায্য সত্ত্বেও সসৈন্যে পৃথ্বীরাজের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পাঁচ দিন যুদ্ধ হইল কিন্তু জয়চন্দ্র কিছুতেই কন্যা প্রত্যানয়ন করিতে অথবা প্রত্যর্পণ করিতে পৃথ্বীরাজকে বাধ্য করিতে পারিলেন না। এই ব্যাপারে কনোজাধিপতি ও দিল্লীশ্বর উভয়েই বিশেষ হীনবল হইয়া পড়িলেন। সেই যুদ্ধ যে ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে অমঙ্গলজনক হইবে তাহা তখন উভয়েই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা জানিতেন না যে সুলতান ঘোরী উৎসুকনেত্রে তাঁহাদের এই যুদ্ধ দুর হইতে অবলোকন করিতেছিলেন।

ক্রমশঃ।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাম যখন বনচারী তখন একদা দণ্ডকারণ্যে গমন করিলে অগস্ত্যশিষ্য তপোধন সুতীক্ষ্ণ রামকে এই কথা বলিয়াছিলেন "হে রাম, আমি চিরদিনই তোমার দাসানুদাস—নিরন্তর তোমারই মন্ত্র জপ করিয়া থাকি। শম্ভু ও স্বয়ম্ভু তোমারই চরণদ্বয় আশ্রয় করিয়া আছেন। তোমার পদযুগল সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার পবিত্র পোত স্বরূপ। ভগবন্ মলভুত মুদ্গলপিণ্ড এই অসার শরীরে আমার দারুণ অভিমান জন্মিয়াছে; হৃদয় সেই অভিমানপাশে আবদ্ধ হইয়াছে; আমি তোমার মায়াবলে সুতকলত্র ও গৃহরূপ অন্ধকূপে মগ্ন হইয়াছি। * * তুমি সর্ব্বজীবের অন্তরে বাস করিতেছ কিন্তু যাহারা তোমার মন্ত্র জপে বিমুখ, তাহাদের প্রতি মায়া বিস্তার করিয়া থাক। মায়া তোমার মন্ত্রসাধনারত মহাত্মগণের নিকট হইতে দূরে অপসৃত হইয়া যায় এবং তুমি সেই ভাগ্যবান্দিগকে নরপতির ন্যায় সেবানুরূপ ফল প্রদান কর।"

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ১০-৩৩

অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস, আমি অক্ষয় কাল এবং বিশ্বের মুখরূপ বিধাতা। এক স্থানে—বেদের মধ্যে সামবেদ, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী।

আর এক স্থানে বলিয়াছেন—আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞের মধ্যে আমি জপ-যজ্ঞ এবং স্থাবরের মধ্যে আমি হিমাচল। আর এক স্থানে বলিয়াছেন—বিধিহীন, অন্নহীন, মন্ত্রহীন ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে।

রামপ্রসাদ তাঁহার "কালীকীর্ত্তনে" বলিয়াছেন—

পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার।
কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার।
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল বুঝি বুদ্ধির তারল্য॥

প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে পায়॥

রামপ্রসাদ যে মন্ত্রতত্ত্ব ও অক্ষরতত্ত্ব অবগত ছিলেন তাঁহার নিম্নলিখিত গানগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে। তিনি হাতে কলমে করিয়াছিলেন।

ষট্‌চক্রদর্শন।

(প্রসাদীসুর, একতালা।)

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তরে ষড়দলোপর বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী॥
ত্রিকোণ মনিপুরে বহ্নিবীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগদলে, শিব ভৈরবী লাকিনী॥
অনাহতে ষট্‌কোণে, দ্বিষড়দল বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ুবীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্রবীজে সুধাক্ষরে হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥

ষট্‌চক্রভেদ।

(রাগিণী বিভাস, তাল একতালা।)

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে॥
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিবশক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,

এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মুলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য ঘরে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠার বিহরে।
হ, ক্ষ আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্ত্য এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, জেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হোং স্বরে॥
ফিক্কে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণ যুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কালপদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ শত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনে প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে॥

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ করাইয়া দিই, চণ্ডীতে একস্থানে আছে,

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বংহি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্ব দেবী জননী পরা॥

ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন—তুমি হোম শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে প্রযুজ্য স্বাহা স্বধা ও বষট্‌কার রূপ মন্ত্রস্বর স্বরূপা এবং দেবভক্ষ্য সুধাও তুমি, হে নিত্যে! তুমি অক্ষর সমুদয়ে হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন প্রকার মাত্রা স্বরূপা হইয়া অবস্থান করিতেছ এবং যাহা বিশেষরূপে অনুচ্চারণীয় ও অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থিত তাহাও তুমি, তুমিই সেই (বেদসারভূতা) সাবিত্রী, হে দেবি, তুমিই আদি জননী।

আর এক স্থানে—

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন তৃপ্তিং প্রয়ান্তি সকলেষু মুখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈপিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতুরুচ্চার্য্যসে ত্বমতএব জনৈঃস্বধা চ॥ ৮
যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্য মহাব্রতা চ অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈর্ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥ ৯
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-মুদ্গীতরম্যপদ পাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবীত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥ ১০

[তুমি যেমন জগতের কারণ তদ্রূপ জগৎ কার্য্যসাধন হেতুও তুমি]

হে দেবি! যজ্ঞ সকলে যে মন্ত্রের সম্যক্ উচ্চারণ দ্বারা সমস্ত দেববৃন্দ তৃপ্তি-লাভ করেন, সেই 'স্বাহা' মন্ত্র তুমি হও এবং স্বধা মন্ত্রস্বরূপিণীও তুমি এই হেতু পিতৃগণের তৃপ্তি নিমিত্ত পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ)কারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক তুমি উচ্চারণীয় হও। ৮। (কর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ড সাধনের হেতুও তুমি] হে দেবি! সেই ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধনভূতা পরমাবিদ্যাও তুমি; যাহা মুক্তির হেতুভূতা এবং অচিন্তনীয় মহাব্রত স্বরূপা, সুতরাং বিনষ্ট-সমস্ত (অনুরাগাদি) দোষ ও সুসংযতেন্দ্রিয় হেতুতত্ত্ব (ব্রহ্ম) সারভূত বলিয়া যাঁহাদিগের ধারণা হইয়াছে, সেই মোক্ষার্থি মুনিদিগের কর্ত্তৃকই যে বিদ্যা অভ্যাসের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ৯ (তুমি যেমন জ্ঞানরূপিণী তৎসাধনশাস্ত্রস্বরূপাও তুমি) তুমি শব্দাত্মিকা অর্থাৎ প্রাতিপাদিক শব্দস্বরূপা, অতএব সুবিমল জ্ঞানের হেতুভূত ঋক যজু ও উচ্চ গান দ্বারা রমনীয় পদ সকলের পাঠবিশিষ্ট যে সামবেদ তাহার আধারভূতাও

তুমি এবং তুমি বেদস্বরূপা, দেবি ও ভগবতীও তুমি, জগৎ পরিপালন নিমিত্ত কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুশীদ, এই বৃত্তিচতুষ্টয়রূপাও তুমি, সুতরাং তুমিই সর্ব্ব জগতের দারিদ্র্যপীড়া নাশিনী। ১০।

এক্ষণে পাঠক মহাশয়কে শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য খণ্ড হইতে স্থলবিশেষ উপহার দিব। মনঃসংযোগে পাঠ করিবেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ী বিশ্বম্ভর দেবলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণের উপর দেবগণের আবেশ হইয়াছিল। সেই সময়ের কথা।

কথন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা
কথন বুঝয়ে যেন বিদর্ভের বালা
নয়নে আনন্দ ধারা দেখিয়ে যখন
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝয়ে তখন
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে
মহা চণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে

* * *

জননী আবেশ বুঝিলেন সর্ব্বজনে
সেইরূপে পড়ে স্তুতি মহাপ্রভু শুনে
কেহ পড়ে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্ডীস্তুতি
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেমন মতি
জয় জয় জগত জননী মহামায়া
দুঃখিত জীবেরে দেহ রাঙ্গা পদ ছায়া
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরী
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমার মহিমা
বলিতে না পারে অন্যে কিবা দিবে সীমা

জগত স্বরূপা তুমি তুমি সর্ব্বশক্তি
তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা তুমি বিষ্ণু ভক্তি
যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ
সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্ব মাতা
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা

ত্রিজগতে হেতু তুমি গুণত্রয়ময়ী
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে এই কহি
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্ব জীবের বসতি
তুমি আদ্যা অবিকারা পরম প্রকৃতি
জগত জননী তুমি দ্বিতীয় রহিতা
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল মাতা
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন
সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি
তুমি সে করাহ ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া
রাখই জননী চরণের দিয়ে ছায়া
সংসার মায়ায় মগ্ন জগত তোমার
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূত বুদ্ধি
তোমা সঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি
এইরূপে স্তুতি করে সকল মহান্ত
বর মুখ মহা-প্রভু শুনিয়ে নিতান্ত

* * *

মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া
স্তনপান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হইয়া
কমলা পার্ব্বতী দয়া মহা নারায়ণী
আপনে হইল প্রভু জগত জননী
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা

তথাহি। পিতামহ স জগতো ধাতা মাতা পিতামহঃ।

আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তন পান
কোটি কোটী জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান
স্তন পানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেম রসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥

এই যে মন্ত্র তন্ত্রেই প্রাপ্তব্য। তন্ত্র ছাড়া মন্ত্র নাই। প্রত্যেক অক্ষরই জগদম্বার স্বরূপ বিভূতি। পাঠক মহাশয় এখন বুঝিতে পারিবেন যে প্রাচীন কবিরা কেন অক্ষরানুসারে কখনও চৌত্রিশাক্ষরে কখন পঞ্চাশ অক্ষরে জগদম্বার স্তুতি লিখিতেন আর ঐরূপ ক কারাদি বর্ণ ক্রমে স্তুতির পরই কেন জগদম্বার আবির্ভাব হইত। হায় সে বিশ্বাসের দিন কোথা গেল? এখন ত এ সব উঠিয়া গিয়াছে। দেব রামপ্রসাদের সুন্দর চৌত্রিশাক্ষরে শ্মশানে কালীস্তুতি করিয়াছিলেন। নব্য পাঠক পাঠিকাকে এরূপ পাণ্ডিত্যের একটু পরিচয় দিলে ক্ষতি কি? রামপ্রসাদের দেখুন—

(ক) কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার
কপর্দ্দি-কামিনি কি বা করুণা তোমার

(খ) খ ভরে ভ্রমহ মাগো হের হর ভয়
খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয়
খর খড়্গ করে ধরে খল খল হাসি
খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি

(গ) গিরিবর সুতা গৌরি গণেশ জননি
গগণ বাসিনি বিদ্যা গিরীশ গৃহিণি
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি
গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি

এইবার ভারতচন্দ্রের দেখুন—পঞ্চাশ অক্ষরে—

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা
অনাদ্যা অনন্ত অন্নপূর্ণা অষ্টভূজা

আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া
আনিয়াছ আমারে আপনি আজ্ঞা দিয়া
ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণি ইন্দিরা
ইন্দীবর নয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছা ইরা
ঈশ্বরী ঈপতি জায়া ঈষদ হাসিনী
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশান ঈহিনী
উমা উর উরস্থল উপরে উত্থিতা
উপকারে উর গো উরগউপবীতা
ঊর্দ্ধজটা ঊরুরম্ভা ঊষ প্রকাশিকা
ঊর্ম্মিতে ফেলিয়া কৈলা ঊষর মৃত্তিকা
ঋতুরূপা তুমি ঋষি ঋভুক্ষের বৃদ্ধি
ঋষিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি
ৠকার স্বর্গের নাম তুমি ৠ রূপিণী
ৠ স্বরূপা রাখ মোরে ৠবাসদায়িনী
৯ কার বেদের নাম তুমি সে ৯ কার
৯ পড়িলে কি হবে ৯ কি জানে তোমার
৯ কার দৈত্যের মাতা ৯ ভব দানব
৯ কার স্বরূপা তবু বধিলা ৯ ভব
এণ রিপুবাহিণী এ একান্তেরে চাও
একা আনি এখানে এখন কি এড়াও
ঐশানী ঐহিক সুখে ঐকান্ত বাসনা
ঐরাবত পতি করে ঐ পদ বাসনা
ওড়পুষ্প ওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস
ওজোগুণ তরাবার ওপদ ওকস
উৎপাতিকে উপসর্গে তুমি সে ঔষধ
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ
অংশরূপা অংশুময়ী অংশে কংস অরি
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি

অঃ কার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষর কোষে
অঃ কি কর অঃ স্বরূপা রাখ মোরে তোষে
কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা
কাতরে করুণা কর কুণপ কর্ণিকা
খর খড়্গ খর্পর খেটকে খলনাশা
খণ্ড খণ্ড কর খলে খল খল হাসা
গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশ জননী
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারি গমনী
* * * *
হৈমবতী হেরম্ব জননী হরপ্রিয়া
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া
সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে।

এ টুকু তুলিবার আরও একটু কারণ আছে। আমাদের যে বর্ণমালা এক্ষণে বাঙ্গালায় প্রচলিত তাহাতে ব্যভিচার ঘটিয়াছে। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণ পরিচয়ের প্রথমভাগে প্রথমে এইরূপ ইচ্ছানুরূপ বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া ব্যভিচার ঘটান। পরে সে দোষ অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। ৺ভূদেব বাবু এ কথা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে বাঙ্গালায় বর্ণমালার ব্যভিচার অতি অন্যায় তাহা শাস্ত্রানুসারে হওয়াই উচিত। তন্ত্রানুসারে বর্ণমালা এ কথা অনেকেই জানেন। তন্ত্রানুসারেই দেবভাষা সংস্কৃতের বর্ণমালা আছেই এবং বাঙ্গালা ভাষার ও তন্ত্রানুসারে বর্ণমালা হওয়া উচিত। তন্ত্রানুসারে বর্ণমালা কি তাহা সাধক ভারতচন্দ্র হইতে দেখাইলাম। "ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে" অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। এই ষোল স্বর আর চৌত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব, শ ষ স হ ক্ষ। এই বর্ণমালার মধ্যে ড় ঢ় য় ৎ, এ সব ব্যাপার নাই বা ক্ষ কৃ ষ দুইটি অক্ষরে বিভাগ করা নাই

সাধকগণ ষট চক্রের পাপ্‌ড়ীতে পাপ্‌ড়ীতে যেমন অক্ষর দেখিয়াছেন, সেই রূপই প্রকাশ করিয়াছেন, ষট্‌চক্রের প্রতিমূর্ত্তি যখন দিব তখন তাই পাঠক দেখিতে পাইবেন। আরও একথা জানা আছে, ধাতু হইতে শব্দ ধাতু সব সংস্কৃত। ধাতুর বানানে এই তান্ত্রিক বর্ণমালারই ব্যবহার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সব বর্ণ ষট্‌চক্রের পদ্মের পাপ্‌ড়ীতে পাপ্‌ড়ীতে অন্তর্নিহিত আছে, তবে আমরা উৎ+চারণ বা (উচ্চারণ) করি অর্থাৎ তাহাদিগকে উর্দ্ধে বায়ুর সাহায্যে বিচরণ করাই তখন যে সব স্থান হইতে তাহাদের প্রকাশ হয় সেই অনুসারেই তাহাদের নাম হয়, কণ্ঠ্য বা তালব্য বা ওষ্ঠ ইত্যাদি। বর্ণমালা তন্ত্রানুসারে হইবার আরও অনেক কারণ আছে তাহা এক্ষণে খুলিতে পারিলাম না।

ভগবান বলিয়াছেন "আমাকে ধ্যান করিতে করিতে বাক্যসংযমন ও মন্ত্রবর্ণ স্মরণ পূর্ব্বক জপ করা বিধেয়"। জপ কাহাকে কহে? কথাটা আছে— জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎসিদ্ধি র্নসংশয়ঃ।

জপ=অর্থ উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে মন্ত্রবর্ণ "উচ্চারণের" নাম জপ।

"তন্ত্রসারে" এই জপের এইরূপ লক্ষণ দেওয়া আছে—

নিজ কর্ণাগোচরোঽয়ং স জপো মানসঃ স্মৃতঃ।
উপাংশুর্নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা স জপো বাচিকঃ স্মৃতঃ॥

নিজ কর্ণের অগোচর যে জপ তাহা 'মানস', নিজ কর্ণের গোচর যে জপ তাহা 'উপাংশু' এবং বাক্যের দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত যে জপ তাহা 'বাচিক'। তবেই জপ তিন প্রকারের মানস, উপাংশু ও বাচিক। যথাক্রমে উত্তম মধ্যম ও অধম। মানস উত্তম, উপাংশু মধ্যম আর বাচিক অধম।

ক্রমশঃ।

আগমনী।

কালচক্রের সবেগ আবর্ত্তনে আবার ষড়ঋতুর শরৎ আসিয়াছে, আবার ঐম্বিকামাস আশ্বিন আসিয়াছে, আবার প্রকৃতিসতী রঙ্গীণ মেঘের রঙ্গীণ পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া দিনমুখে ও রজনীমুখে মধুর মধুর হাস্য করিতেছেন। পথ ঘাট জল স্থল দিকদেশ আকাশ পাথার পরিষ্কার, পরিষ্কার। গন্ধবহ দিগ্‌বদক্ষিণা হইতে শনৈ শনৈ সঞ্চারে অভিসারে আগমন করিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে চুম্বনের ধন গন্ধ বিলাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। এমন দিনে নিসর্গ-সুন্দরীর যদি আগমনী শুনিবেন তবে প্রত্যুষে ও প্রদোষে ঐ বিহগের কাকলী স্বরূপ ঐক্যতান বাদন মনঃসংযোগে শ্রবণ করুন। উমাপূজায় কে কত অধিক কুসুমের আয়োজন করিতে পারে এই লইয়া জল ও স্থলের, পর্ব্বত ও কান্তারের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। নীল নীল সুনীল অম্বরে দারুণ বর্ষার ক্লেশ মনে করিয়া মহা আড়ম্বরে শশী আজ দরবার খুলিয়া বসিয়াছেন। তবে নষ্ট চন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া নক্ষত্ররাণীগণের সহিত যেন কৌতুক করিয়াই এক একবার পাৎলা মেঘের আবরণে মুখ ঢাকিয়া কলঙ্ক লুকাইতেছেন। সদাগতি সে রসভঙ্গ সহ্য করিতে না পারিয়া তখনই খুলিয়া দিতেছেন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া গিরিরাণীর আজ্ উমার মুখখানি মনে পড়িয়াছে। শারদীয়া-চন্দ্রিমা দর্শনে আজ সোহাগের ধন উমার পদনখরাজির জ্যোতি মনে পড়িয়াগিয়াছে। আবার স্বপ্ন কথা স্মরণ করিয়াছেন। সহচরীকে বলিতেছেন,

রাগিণী পরজ বাহার।

শয়নে স্বপনে সদা দেখিতেছি উমাধন।
মা আমার মা বলে এসে করিছে যেন রোদন॥
কক্ষের ধন চক্ষে হেরে, বক্ষে লয়ে ধারণ করে,
নারি প্রবোধিতে তারে ঝরে তারার ত্রিনয়ন।
মা আমার কাতর স্বরে, বলিছে মা কেমন করে,
ভুলিয়ে ছিলি আমারে, মায়ের এমন কঠিন মন॥

সহচরীমুখে কৈলাসের যে সংবাদ মেনকারাণী শ্রবণ করিলেন তাহাতে জননীর দুঃখ শোক ক্ষোভ প্রেম অপত্যস্নেহ একেবারে যুগপথ উথলিয়া উঠিল। বিনয়ে কাতরকণ্ঠে গিরিরাজকে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন,

দেশমল্লার।

কৈলাস সংবাদ শুনে মরিহে পরাণে। (আজ্)
কি কর হে গিরিবর যাও যাও এস জেনে॥
সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়ে ভার,
সার করে যোগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে।
যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ করে,
হরের বৈভব হেরে, লয়ে গেল স্থানে স্থান।
শশী গগণ মণ্ডলে, সুরধূনী ধরাতলে,
ফণীগণ গেল পাতালে, অনল নিবিল বনে॥
শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হয়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, অভিমানে পাগলিনী।
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাগেতে দিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধা পানে॥

গিরিরাজ গিরিজায়াকে নিবারণ করিলেন। প্রবোধ দিলেন কত বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে গৌরী আনিবার চেষ্টা বৃথা।

ললিত।

বারে বারে কহ রাণি গৌরী আনিবারে।
জানত জামাতার গুণ বিবিধ প্রকারে।
অমরের রেখে মান, শঙ্করের গরল পান,
পেয়ে উমা জুড়িয়েছে প্রাণ, কেমনে ছাড়িবে তারে॥

কিন্তু সব ভাসিয়া গেল। কিছুতেই কিছু হইল না। মেনকা ধরাশয্যা অবলম্বনে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। তখন রাণীকে কোন ক্রমে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া গিরি কৈলাস শিখরে আসিয়া উপনীত হইলেন। মহামায়ার মায়া পিতৃদেবকে দর্শন করিয়া উচ্ছ্বাসে পরিণত হইল। মা তখন আপনিই পিতৃদেবকে কৌশল শিখাইয়া দিলেন। গিরিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া শঙ্করের পূজায় বসিলেন। আশুতোশ মন্ত্রপূত বিল্বপত্র-বা আর কতক্ষণ সহ্য করিবেন? এ দিকে ভক্তের বাসনা ও দিকে মার আবদার, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের আবদার। মাগো তোমার সংসারের অভিনয়, তোমার কার্য্যের অভিনয় ভারতবাসী হিন্দুর ঘরে ঘরে অহরহ হইয়া থাকে। ঈপ্সিতার্থে স্থির নিশ্চয়

মন বা নিম্নগামিনী স্রোতস্বিনীর গতি কে কখন রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে? শক্তিহীন জড়ের সহিত শক্তির সংগ্রামে কার পরাজয় কে আর তোমাকে বলিয়া দিবে?

আশুতোষ শেষ নিরুপায় হইয়া বলিলেন—

আলিয়া কেদার।

হার ধর নন্দি, শিব কণ্ঠহার।
দেখো ভুল না দক্ষ যজ্ঞের ব্যাপার।
কণ্ঠের হার শিবে দিও পুনর্ব্বার।
হৃদয় শূন্য করে, ছার কায়া ধরে,
আজি দিলাম জীবন সঁপে তোমার করে।
শিবের কেহ নাই, প্রাণের উমা বই,
যেন বিসর্জ্জন দিওনা আর বার॥
উমায় বিদায় দিয়ে, আশা পথ চেয়ে,
আজ রহিল আশুতোষ, কায়া লয়ে,
আর প্রাণ ধন, কার্ত্তিক গজানন,
দেখো, রেখোরে যতনে দুটি কুমার।

গিরিরাজ উমাকে আনিতে গিয়াছেন, তবুও রাণী ধরাশায়িনী। পলকে প্রলয় বহিয়া যাইতেছে, কতক্ষণে অমিয় আধ আধ মা মা বাণী শ্রবণ করিবেন, কতক্ষণে চাঁদমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আপনা ভুলিবেন, কতক্ষণে মুখে ক্ষীর সর নবনীত তুলিয়া দিয়া জনম সফল করিবেন, কতক্ষণে দুই ক্রোড়ে দুই কুমার লইয়া অমিয় আনন্দসাগরে একেবারে ডুবিয়া যাইবেন। দিন যায় না —প্রহর যায় না, পল বিপলও যায় না। এমন সময় সহসা সহচরী আসিয়া সংবাদ দিলেন, রাণী উঠ, মা আসিতেছেন। প্রতিবেশিনীরা ও উমার সহচরীগণ আনন্দে সোৎসাহে ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন রাণী উঠ উঠ তোমার দুঃখের নিশি অবসান হইয়াছে, ঐ আমাদের উমা আসিতেছে।

মালশ্রী।

আজি শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ শশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
বলে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবা নিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে॥

মালশ্রী।

ওগো রাণি নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া, এসোনা সঙ্গে আমার গো॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় আদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে, প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তলভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূর আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে মা, কি মা ভুলেছিলে, মা বলে, একি কথা মার গো॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি, সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে, এমন শুভদিন আর কার গো॥

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

স্বাস্থ্য, জ্যৈষ্ঠ। এই পত্রিকাখানির উন্নতি দর্শনে আমরা সুখী। আমাদের দেশে ল্যান্সেটের ন্যায় একখানি পত্রিকা প্রকাশের এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু তাই বলিয়া যত্ন চেষ্টা উৎসাহের ত্রুটি কেন হইবে? সম্পাদক বুঝিয়াছেন এরূপ পত্রিকার উন্নতি জাতীয়ত্বের উপর নির্ভর করে, তাই তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন "এই সকল পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী ঔষধ ও আর খাইব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা আরও প্রশংসনীয় নয় কি? ঈশ্বরের সৃষ্টির ব্যবস্থা অতি সুন্দর। তিনি একদেশে রোগ, অন্য দেশে তাহার ঔষধ—এরূপ করেন না। আমাদের দেশের ঔষধ আমাদের দেশেই মিলাইয়া রাখিয়াছেন।" ইহার পর দীর্ঘচ্ছন্দ ইংরেজী ঔষধের ব্যবস্থা ভাল দেখায় না। গ্রীষ্মকালের পানীয় মধ্যে আনারসের রস, আমপোড়া, পাতিলেবুর রস প্রভৃতির মধ্যে "নানা প্রকার বিলাতী পানীয় স্বাস্থ্যকর ও স্নিগ্ধ গুণ সম্পন্ন" ঠিক যেন শাখাঁহাতের উপর গাউন। সাবধান করিবার কারণ এই যে আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। বালী উত্তরপাড়ায় বেঞ্জার্সফুডে ভদ্রলোকের ত্রুটি হইতেছে। স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ মন্দ নহে কিন্তু একটু দেখিতে হইবে—সংলগ্ন না অসংলগ্ন। জন্ পিটর গ্রাণ্ট বলিতেন বাঙ্গালিকে আমি শিক্ষিত বলি না —কেন না তাহারা স্বাস্থ্য-রক্ষা বুঝে না—নিজের শরীরটা কিসে ভাল থাকিবে তাহাই বুঝে না। আর্য্যচিকিৎসাকে ভিত্তি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের উদ্ধারসাধন করিতে হইবে এবং বিদেশী নূতন আবিষ্কার সযত্নে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে য়ুরোপে দুইটা অদ্ভুত অস্ত্রচিকিৎসা হইয়া গেল—(১) পাকস্থলী কাটিয়া বাহির করিয়া দিয়া অপর একটি টিসুতে (ঝিল্লিতে) পাকস্থলীর কার্য্য করান আর (২) গলা কাটিয়া তৎপরিবর্ত্তে কৃত্রিম পর্দ্দা বাঁধা কণ্ঠনালী বসান যাহাতে বাক্‌শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে—তাহার বিশেষ বিবরণ পাঠ করিতে সকলেই ত ব্যস্ত হইবেন। রোগের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, ইংরেজী কেহ জানে কি না খবর লইয়া, বলেন রোগের নাম Bengal is that division of India এরূপ হাতুড়ের দিন গিয়াছে। এখন অনেক ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া হাত দেখিতে শিখিয়াছেন, অনেক ডাক্তার নিজে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, নিজে অস্ত্র ধরিতে ও মুষ্টিযোগ

ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন, এখন তাঁহাদের পক্ষে আমরা যেরূপ বলিতেছি ওরূপ পত্র বড় উপাদেয় ও ফলপ্রদ হইবে।

স্বাস্থ্য, আষাঢ়। স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে "মকরধ্বজ" দেখিলাম। জার্ম্মাণীতে আয়ুর্ব্বেদ মতে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়াছে। কই সে সংবাদ বা যশুরে মকরধ্বজের ব্যাপার ত দেখিলাম না? সিবিল সার্জ্জন শ্রীরসিকলাল দত্ত মকরধ্বজ ব্যবহার করিতেছেন তাহা আমরা জানি। এবার সুশ্রুত হইতে সঙ্কলিত "গর্ভিণী বিবরণ" আছে; আয়ুর্ব্বেদ সম্মত জ্বর চিকিৎসা আছে। এই ত চাই। কৃত্রিম দন্ত ব্যবহারের পক্ষপাতী আমরা নহি—ইহা হিন্দুর কর্ম্ম নয়। স্বাস্থ্যে আর একটা সংবাদ আছে এক জন ফরাসী আপন ভাষায় আমাদের দেশের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির অনুবাদ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ল্যান্সেট নামক ইংরেজী পত্র তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া মলমূত্র সম্বন্ধে হিন্দুর শৌচাচারের বিলক্ষণ সুখ্যাতি করিয়াছেন। কেবল আয়ুর্ব্বেদ কেন হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে এত বিধিব্যবস্থা আছে যে জাতীয় স্বাস্থ্য-সংহিতা সংগ্রহের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী, নিশ্চয় জানিবেন যাহা অহিন্দু তাহা অস্বাস্থ্যকর।

ভারতী, আষাঢ়। একটি স্বরলিপি আর তিনটি পদ্য—আহিতাগ্নিকা, বর্ণমালা, নব বর্ষায় প্রকৃতির প্রতি,—ছাড়া বাকি গুলি, কুড়ানো মেয়ে (গল্প), বরোদার জাতিতত্ত্ব, অধ্যাপকচিত্র, মানমন্দিরের পরিণাম, অহল্যার শাপ-কথার দ্বৈধ, ফসলে কীট, চিনির শুল্ক। আহিতাগ্নিকা—যথা প্রাড্ বিবাক কঙ্কে মলিম্লুচ অভিসারিকা অতি সাহসিকা উৎকট-কট-অন্ধকার সমালোচিকা। "বর্ণমালায়" লবণবাহী বলদের ফিকির সেই জ্যোতিষিক প্রশ্ন। খাটিল কৈ? শেষ কবিতাটি ভাল। "বরোদার জাতিতত্ত্ব"ই এবারকার প্রবন্ধ। অনেক সংবাদ আছে। এই দেখুন না—

কেড়োয়া কানবীগণ অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং ভীরু, কিন্তু দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান বোধ হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অথিতিপরায়ণা ও সরল-প্রকৃতিসম্পন্না। ইহাদের বিবাহ প্রথার ন্যায় কিম্ভূত কিমাকার প্রথা, বিশ্বসংসারে আর কুত্রাপি আছে কিনা বলা যায় না। ইহাদের জাতির মধ্যে দশ বার বৎসর অন্তর একবার করিয়া বিবাহ হয়, একবার এক দল ছেলে মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে দশবার বৎসরের মধ্যে আর কাহার বিবাহের

নামটি করিবার যো নাই। ছেলে মেয়ের বয়সের উপর বিবাহের কালাকালের নির্ভর করে না। সিপুর নামক স্থানে পার্ব্বতীদেবীর মন্দির আছে, ইহারা এই পার্ব্বতীদেবীর উপাসক, দশবার বৎসর অন্তর একবার ইহাদের বিভিন্ন স্থানের মণ্ডলগণ এই মন্দিরদ্বারে সমাগত হয়, এবং কতকগুলি কাগজে "এবার বিবাহ হওয়া উচিত" ও "এবার বিবাহ হওয়া উচিত নহে," এই মর্ম্মের দুই প্রকার কথা ছোট ছোট কাগজে লিখিয়া সেই কাগজখণ্ডগুলি দেবীপাদমূলে স্তূপাকারে ঢালিয়া দেয়। তাহার পর আট দশজন বালক বালিকাকে সেই কাগজগুলির কতক কতক তুলিয়া লইবার জন্য অনুমতি করা হয়। এইভাবে তিনবার কাগজ তুলিবার পর কাগজ খণ্ডগুলি খুলিয়া দেখা হয়, যদি 'বিবাহ হওয়া উচিত' লেখা কাগজ বিপরীত মতবিশিষ্ট কাগজ অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় উত্তোলিত হয় (প্রতিবারই তাহা অধিক হইয়া থাকে) তাহা হইলে দেবীর বিবাহে অনুমতি হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়; তখন সেই মাঙ্গলিক সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হয় এবং কেড়োয়া কানবী দলে আনন্দোৎসব পড়িয়া যায়। অতঃপর বিবাহের দিনান্তর হয় ও বর-কন্যার পিতামাতা বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কন্যার পিতা বরকে এক টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসে, ইহাই ইহাদের বাগ্দান। বরের অশ্বারোহণেই বিবাহ করিতে যাইবার নিয়ম, কিন্তু বিবাহের দিন বিবাহার্থীর সংখ্যা এত অধিক হয় যে সকলে অশ্ব জুটাইতে পারে না, সুতরাং তাহারা দলবাঁধিয়া একখানা খুব বড় গরুর গাড়ী ভাড়া করে, ও তাহাতে আরোহণ করিয়া বিবাহ করিতে যায়। তাহাদের সমবেত বাদ্যভাণ্ড এই মঙ্গলানুষ্ঠানের কাহিনী ঘোষণা করিতে করিতে বর ও বরযাত্রীদলের অনুগমন করে। গাড়ী-বোঝাই করা বিবাহার্থী বরেরা স্ব স্ব ভাবী শ্বশুরবাড়ীর দ্বারের সম্মুখে গিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে, তখন গাড়োয়ান অবশিষ্ট বরগুলিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে যায়। দশবার বৎসর অন্তর একবার বিবাহের দিন আসে বলিয়া পিতামাতা তাহাদের অবিবাহিতা ছোট বড় সকল কন্যাকেই সে দিন বিবাহিত করিবার চেষ্টা করে।

"অধ্যাপক চিত্র" অতিরঞ্জন। 'কদাচন' মানে একটা প্রকাণ্ড দস্যু আমরা চাণক্য শ্লোক হইতেই জানি কিন্তু এ সকল সুবুদ্ধি-রচনা। ৺দাশরথী রায় অনেক দিন পূর্ব্বে অধ্যাপক সমালোচন করিয়াছেন। 'অহল্যার শাপ' সম্বন্ধে

লেখক বলেন পাষাণের মানুষ হওয়ার কথাটা বাল্মীকি রামায়ণে নাই, ওটা কৃত্তিবাসের কল্পনা আর অহল্যাটাও বাল্মীকির কল্পনা (প্রতিভা)। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে—

সাহল্যাহল্যয়া সার্দ্ধং ইন্দ্রস্য যদভূৎ পুরা।
তদাকর্ণ্যেতিহাসেভ্যস্তস্মিন্নিন্দ্রেঽস্বরজ্যত॥

সেই অহল্যা (ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ-কুমারী), ইন্দ্রের সহিত যে ঘটনা পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস হইতে কর্ণগোচর করিয়া, ঐ ইন্দ্রে (ইন্দ্র নামে এক ব্যক্তি) অনুরাগিণী হয়।

এখানে অহল্যার কথা পূর্ব্ব হইতে চলিত ও তাহা ইতিহাস বলিয়া বশিষ্ঠ স্বীকার করিতেছেন। এই ঋষিবাক্য ছাড়া স্বয়ং বেদব্যাস (অধ্যাত্ম রামায়ণ) কি বলিয়াছেন দেখুন। (বঙ্গানুবাদ) বিশ্বামিত্র কহিলেন—রাম, এ বিষয়ে একটি অতীত ঘটনা শ্রবণ কর। * * একদিন গৌতম কার্য্যান্তর ব্যপদেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে শচীপতি সেই মুনিবেশ ধারণ করিয়া অহল্যাকে উপভোগ করতঃ ত্বরিত পদে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বহির্দ্দেশে গৌতমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। * * তিনি ত্রিদশাধিপতিকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, রে দুরাত্মন্, রে যোনিলম্পট তুই সহস্র যোনিবিশিষ্ট হ।' * * তখন ঋষি তাহাকেও কহিলেন, রে দুষ্টে, রে দুর্ব্বৃত্তে, আমার এই আশ্রম সর্ব্বপ্রাণী বিবর্জ্জিত হইবে। তুই এই স্থানে শিলায়লীন হইয়া অহরহঃ অনাহারে অবস্থান করতঃ পরম তপস্যা আশ্রয়পূর্ব্বক আতপ অনিল ও বর্ষাদির প্রবল প্রতাপ সহ্য করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই মানসাধিষ্ঠিত পরমেশ্বর রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে থাক্। এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে যখন দশরথতনয় শ্রীমান্ রামচন্দ্র অনুজ সঙ্গে উপস্থিত হইয়া তোর আশ্রয় শিলায় পদার্পণ করিবেন, তখন তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা প্রদক্ষিণ প্রণাম ও স্তব করিয়া তোর পাপ প্রক্ষালন ও শাপ বিমোচন হইবে। তদবধি অহল্যা * * জীবগণের অদৃশ্য হইয়া বায়ু মাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক চরণরজের স্পর্শ বাসনা করিতেছে। * * মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র এই বলিয়া রাঘবের হস্ত ধারণ করতঃ সুকঠোর তপোনিরতা পাষাণময়ী অহল্যাকে দেখাইয়া দিলেন। তখন রামপদ দ্বারা শিলা স্পর্শ করিবা মাত্র সেই তপস্বিনী পূর্ব্বরূপে তাঁহার দৃষ্টিপথে উপনীতা হইলেন।

আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কেবল এইমাত্র যে অধ্যাত্ম রামায়ণে স্বয়ং মহেশ্বর বক্তা আর উমা শ্রোতা। কৃত্তিবাস ত খালাস। বাল্মীকির উপর যখন আবার নম্বর চড়িবে, তখন সে কথার জবাব দিব।

ঋষি, আষাঢ় ও শ্রাবণ। ঋষির আবরণ-বল্কলে লেখা আছে "আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক মাসিক পত্র।" অভ্যন্তরেও দেখিলাম "আমাদের কাগজের যে সুর তাহাই থাকুক।" আমাদেরও তাই ইচ্ছা। "পতি দেবতা" "লক্ষ টাকার কথা" প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃতই ঋষির সঙ্গ সাধু-সঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছি। দ্রব্যগুণ বিচার বর্ণানুক্রমে শেষ হইবে ও অন্ততঃ ঋষি দশ বৎসর লোকালয়ে থাকিবেন শুনিয়া আরও আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু বলিতে ভয় হয়,—কেন না, একজন প্রবীণ-পরমায়ু-বিশিষ্ট পত্র সম্পাদক আমাদের বিনিময়ের কাগজ সমালোচনার দায়ে বন্ধ করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ণিমার নিকট আমি লজ্জিতও আছি—"পিপাসার জল" পাঠে আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এরূপ অন্তঃসারহীন অঋষিজনোচিত লেখা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইলে ঋষির অচিরেই ভট্ট বুলরে পরিণতি হইবে। স্ত্রীলোকের দুঃখে না কাঁদিলে স্যালেণ্টি হয় না তা জানি কিন্তু "গে" বাবাজীবনরাই যে নিদারুণ প্রসব বেদনার কারণ তাহা একবার ভাবিয়াছেন কি? কঠোর প্রসববেদনা নিবারণের কি উপায় করা হইয়াছে? আমরা বার বার জিজ্ঞাসা করিব। আমরা জানি যে যাহারা প্রসব বেদনার কারণ তাহারাই মরিয়া হুতুমথুমো বা হুমোপাই হয়। ঋষির রাগ নাই তাই বলিতে "প্রয়াস" হইল। ঋষিতে ইংরেজী মাস কেন? এও 'পাগলের নালিস'।

প্রয়াস, ৮ম সংখ্যা। আমরা দল বাঁধিতে জানি না, দল রাখিতে জানি না, অথবা দল বাঁধি, কেন না একটা যে দল হইয়াছে। ভাঙ্গা দলের কথা যাহা বলিয়াছি তাহা কার্য্যে ফলিতেছে। বহুদিন পূর্ব্বে ১২৭৯ সালে সিবিলিয়ান বীম্‌স্ সাহেব বাঙ্গালা ভাষাটাকে ছাঁকিয়া লইতে বলেন ও ফরাশিশ একাডেমির ন্যায় একটা সাহিত্য সমাজ সংস্থাপন করিতে পরামর্শ দেন এবং ঐ সমাজ হইতে একখানি অভিধান প্রণয়ণ করিবার ইঙ্গিতও করেন। বীম্‌সের এই প্রস্তাব সেই সময়ের নূতন সাময়িক পত্র বঙ্গদর্শনে আলোচিত হইয়াছিল। তখন বীম্‌সের প্রস্তাব নানা কারণে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে আংশিকভাবেও হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের কথা সকলেই শুনিয়া-

ছেন। অনেকে তাহাতে যোগদান করেন নাই, এ কথাও জানা আছে। আমরা এ রোগে অনেকদিন ভুগিতেছি, এ ভোগ আরও পাঁচজনকে ভুগিতে দেখিয়াছি। গো ভাগ্য নাই বা থাকিল এ টুলি ভাগ্য থাকিলেই হইল। ভারতসভার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ান লীগ দেখিয়াছি, কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলমানের কন্‌ফারেন্স দেখিয়াছি, ইলবার্টবিলের প্রতিবাদের সঙ্গে ইলবার্টবিলের স্বাপক্ষে মত দিতে দেখিয়াছি, সহবাস অসম্মতির সহিত সহবাস্ সম্মতির আইন ও আবেদন দেখিয়াছি, এখন আবার সাহিত্য পরিষদের পর, "বান্ধব-সমিতি" "সাহিত্য সেবক সমিতি" "কোহিনূর পরিচালক সমিতি" "হিন্দু হোষ্টেল সমিতি" "গুপ্ত বিদ্যালোচনী সভা" ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি সমিতি দেখিতেছি। শুনিতেছি সাহিত্য পরিষদের অভাব নাকি কোন কোন সমিতি দ্বারা মোচন হইবে। এমন কথা শুনিলে আমাদের আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। যখন বাঙ্গালা পাঠ, মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত ছিল, যখন বাঙ্গালা পড়িলে একঘরে হইতে হইত। কেবলমাত্র ইংরেজী অনভিজ্ঞের হোটেলের বিল অব্ ফেরারে পৃষ্ঠে "অর্দ্ধসের গো মাংস লিখিবার জন্য যখন বাঙ্গালার ব্যবহার ছিল, সেই লজ্জাবন্ধনের দিনে, সেই দুর্দ্দিনে, প্রাবৃটের ঘন ঘোর অন্ধকারে কম্পিত কলেবরে বন্ধুর মুখের দিকে সভয়ে চাহিয়া নীরবে কত ঝঞ্ঝাবাত মাথার উপর সহ্য করিয়াছি, এখন ত শরতের শুভ দিন। আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে বাঙ্গালীর অদৃষ্টদোষ কিছুই ঠিক হয় না, থাকেও না। গুণ হয়ে দোষ হয়, বিদ্যার বিদ্যায়। পূর্ব্বে যে কথা তুলিয়াছি, তাহারই উপসংহার করিতেছি। এত অধিক মাসিক পত্রের ও নূতন নূতন সমিতির আবির্ভাব ভাষার স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে, আধিব্যাধির পরিচায়ক। মৃতবৎসার আঞ্জা নিষ্ফলা হয় না। প্রয়াসে "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও সাহিত্য পরিষদ" প্রবন্ধে দেখিলাম "এই সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে মতের একতা নাই এবং চক্ষু-লজ্জার অপেক্ষা না করিয়া সত্য সমালোচন করিবার ক্ষমতা নাই।" এই কথা আমাদের অমৃতের ন্যায় ভাল লাগিয়াছে।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মন্ত্র কাহাকে কহে? তন্ত্রসার বলেন—

মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্র প্রকীর্ত্তিত।

মনন অর্থাৎ সংসারচিন্তা বা সংসার কামনা হইতে ত্রাণ করে বলিয়া দেবতাদির সাধন ও উপাসনার উপযোগী শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ বা পদাবলী বা অক্ষর মাত্র মন্ত্র নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

তারপর বিদ্যার্ণবের কথায় শ্রবণ করুন—

ভাষা বা বাক্যের ফল, রসভাবমাধুর্য্য-চাতুর্য্যের আস্বাদন—আর মন্ত্রের ফল দৈবতেজে মনোবৃত্তিকে সন্ধুক্ষিত বলিয়া নিত্য প্রত্যক্ষরূপে অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বসমূহের পূর্ণ অনুভব। বাক্য জড়, মন্ত্র চৈতন্যময়। বাক্য বর্ণ বিন্যাস, মন্ত্র তেজঃপুঞ্জ। বাক্য লোক সংসারের উপদেশক, মন্ত্র অলৌকিক শক্তির উদ্‌ভাসক সুতরাং বাক্য জনন মরণশীল জীব স্থানীয় মন্ত্র অজর অক্ষয় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। জড়ে চৈতন্যে, জীবে ব্রহ্মে যতদিন ভেদ থাকিবে ততদিন বাক্য ও মন্ত্রে ভেদ থাকিবে।

মননাৎ পাপতস্ত্রাতি মননাৎ স্বর্গ মশ্নুতে,
মননা ন্মোক্ষ মাপ্নোতি চতুর্ব্বর্গময়ো ভবেৎ।

যাঁহার মনন হেতু জীব পাপ হইতে আত্মত্রাণসাধন করে, যাঁহার মননহেতু জীব স্বর্গভোগ করেন, যাঁহার মননহেতু জীব মোক্ষ লাভ করেন, এইরূপে জীব যাঁহার অবলম্বনে চতুর্ব্বর্গময় হইয়া যান, তাঁহার নাম মন্ত্র।

মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং গীয়তে মননাদ্ যতঃ।
মননাৎ ত্রাতি ষট্‌চক্রং গায়ত্রী তেন কীর্ত্তিতা॥

মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যিনি মনন দ্বারা গীত হয়েন, অর্থাৎ চতুর্দল হইতে সহস্রদল পর্য্যন্ত যিনি বীণাধ্বনি বিনোদিনী হইয়া পঞ্চাশদ্বর্ণ মাতৃকা-রূপে নিত্যবিহারিনী, এতাবতা গায়ৎ। মনন হেতু ষট্‌চক্রকোষ বিদীর্ণ করিয়া যিনি জীবের পরিত্রাণবিধায়িনী—এতাবতা ত্রী, এই উভয় শব্দের যোগে সেই মন্ত্রময়ী মহাশক্তির নাম গায়ত্রী।

মননান্মন্ত্র মিত্যাহু র্ধ্যানাদ্ধ্যানং প্রচক্ষতে।
সমাধানাৎ সমাধিঃ স্যাদ্ধবনাদ্ধোম উচ্যতে।

মনোবৃত্তির প্রক্রিয়া দ্বারা সাধ্য বলিয়া মন্ত্র, ধ্যান (চিন্তন) হেতু ধ্যান। ইষ্ট দেবতার স্বরূপে আত্ম-সমাধান হেতু সমাধি, এবং হবন হেতু হোম কথিত হইয়াছে।

মন, দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ এবং হৃৎপদ্মমণ্ডলে অবস্থিত। সেই মনেরই নামান্তর অন্তঃকরণ যেহেতু বাহ্য (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) বিষয়ে ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে মনের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। কর্ণ যদি শ্রবণ না করে, ত্বক্ যদি স্পর্শ অনুভব না করে, চক্ষু যদি রূপদর্শন না করে, নাসিকা যদি গন্ধ গ্রহণ না করে, জীহ্বা যদি রসাস্বাদ না করে, তবে মন ইহার কোন বিষয়েরই স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না। মনের তিনটি গুণ, সত্ত্ব রজ তমঃ। বৈরাগ্য ক্ষমা প্রভৃতি মনের সাত্ত্বিক বিকার, কাম ক্রোধ রাজস বিকার। আলস্য ভ্রান্তি তন্দ্রা তামস বিকার।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরং।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃস্মরণং বিষয়া ইমে।

মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত, অন্তকরণ এই চারিটি বিভাগে বিভক্ত। যথাক্রমে সংশয় নিশ্চয় গর্ব্ব ও স্মরণ তাহার বিষয়। সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম বুদ্ধি, অভিমানাত্মিকার নাম অহঙ্কার আর স্মরণাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম চিত্ত। উপাসনা ব্যাপারে এই চিত্তবৃত্তিরই আধিপত্য। মন্ত্রস্মরণ দেবতাস্মরণ ইত্যাদি যাহা কিছু সেই সমস্তই চিত্তবৃত্তির প্রক্রিয়া সাধ্য। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তত্ত্বের অন্তর্গত যে কোন একটি পদার্থ ব্যতীত কি জাগ্রদবস্থায়, কি স্বপ্নাবস্থায় চিত্ত অন্য কিছু স্মরণ করিতে পারে না। মন্ত্রবিষয়ক মননেও এই পঞ্চতত্ত্বের কোন একটি পদার্থের অস্তিত্ব থাকা চাই। উপাসনাদি সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস-ব্যাপাররূপাদি। সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানসিক ব্যাপারের নাম উপাসনা।

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরং॥

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ইঁহারা সকলেই শাক্ত, কেহ শৈব বা বৈষ্ণব নহেন, যেহেতু সকলেই বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র কিন্তু গায়ত্রীর ধ্যানে বলিতেছেন—জপ সময়ে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন এই ত্রিকালভেদে গায়ত্রীকে ত্রিমূর্ত্তি ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালে—গায়ত্রী তরুণারুণ রক্তবর্ণা দ্বিভূজা অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারিণী হংসবাহিনী কুমারীরূপা ব্রহ্মাণী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা ঋগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

মধ্যাহ্নে—সাবিত্রী নীলোৎপলদল শ্যামা চতুর্ভূজা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারিণী গরুড়াসনসংস্থিতা যুবতীরূপা বৈষ্ণবী সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী যজুর্ব্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

সায়াহ্নে—সরস্বতী বিশদশ্বেতসুন্দরী ত্রিশূল ডমরুধারিণী ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতা বৃষভাসনসংস্থিতা বৃদ্ধরূপা রুদ্রাণী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থায়িনী সাম বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

এখন বুঝিতে হইবে গায়ত্রী প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্গুণ ইহাও শাস্ত্রবাক্য। আবার জপ ও প্রাণায়াম সময়ে তাঁহার সগুণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রবাক্য।

কেবল একটি গায়ত্রীমন্ত্রের উদাহরণ দিলাম। কিন্তু এক গায়ত্রী বলিয়া নহে, সমস্ত মন্ত্রেরই দুইটি করিয়া শক্তি নিহিত আছেন। প্রথম বাচ্য শক্তি, দ্বিতীয় বাচক শক্তি। যিনি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা তিনি বাচ্যশক্তি। আর যিনি মন্ত্রময়ী দেবতা তিনিই বাচকশক্তি। যেমন শাস্ত্র বলিয়াছেন "সর্ব্বেষাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা, সমস্ত বিষ্ণুমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা। যেমন দুর্গা সহস্র নাম স্তোত্রমন্ত্রে দুর্গা দেবতা, মহামায়া শক্তি। যেমন বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দেবতা দেবকীনন্দন শক্তি ইত্যাদি। বীজ যেমন ফলের অন্তর্নিহিত বাচ্যশক্তিও তদ্রূপ বাচকশক্তির অন্তর্নিহিত। বাহিরের ফলাংশ ভেদ না করিলে যেমন অভ্যন্তরের বীজাংশ লক্ষ্য হয় না, তদ্রূপ বাচকশক্তির আরাধনা না করিলে বাচ্যশক্তির স্বরূপ অনুভূত হইতে পারে না। মন্ত্র বাচ্যশক্তি বলে জীবিত এবং বাচকশক্তি বলে রক্ষিত, জীবন ব্যতিরেকে রক্ষাতেও কোন ফল নাই, আবার রক্ষা ব্যতীত জীবনেরও কোন স্থায়িত্ব নাই, তাই এই উভয় শক্তির কোন একটিকে পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধি ত দূরের কথা মন্ত্রচৈতন্যের উপায় নাই। বিশেষত যে মন্ত্রবলে উপাসনার অধিকার জন্মিবে, বাচকশক্তির আরাধনা ব্যতিরেকে সেই মন্ত্রেই আদৌ জীবনীশক্তির সঞ্চার হইবে না। মৃত সন্তান ক্রোড়ে

করিয়া সংসারের উন্নতি চিন্তা করাও যে কথা, অচৈতন্য মন্ত্র লইয়া সিদ্ধি সাধনার পরামর্শ করাও সেই কথা। উপাসনা অর্থে উনবিংশ শতাব্দীর সংক্রামক উপাসনা নহে। ইহার উচ্চারণের ফল প্রথমে বিশ্ববিপ্লাবিনী দৈবদৃষ্টি-বৃষ্টি, পরিণামফল সিদ্ধিরূপ শস্য সম্পত্তি, পার্থিব জল যেমন সূর্য্য-কিরণে সংক্রামিত এবং আকাশে সঞ্চিত হইয়া বৃষ্টিরূপে ধরাতলে পতিত হয়, আবার সেই জল বিশুষ্ক হইয়া যেমন সূর্য্যমণ্ডল অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ গায়ত্রী প্রতিপাদ্য তেজোময় মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে এই দ্বৈতজগৎ আকৃষ্ট হইয়া অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানরূপে নীরস দ্বৈত সংসার আপ্লাবিত করিবে, আবার সেই অদ্বৈততত্ত্ব হইতেই বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মানন্দরসস্রোতে দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ডকে ভাসাইয়া দ্বৈত-ভান স্বতন্ত্র রাখিয়া অদ্বৈতবুদ্ধি সেই অদ্বৈতরূপিনীর অভিমুখে ধাবিত হইবে, ইত্যবসরেই কর্ম্মভূমির সুযোগ্য কৃষক সাধকের বিশাল বিশ্বক্ষেত্রপূর্ণ করিয়া অষ্টসিদ্ধিরূপ শস্য সম্পত্তি অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত এবং সুপক্ক হইয়া যাইবে। তাই গায়ত্রী মন্ত্র বলিতে ঝঞ্ঝাবাতের প্রারম্ভ না বুঝিয়া সেই জলভরমন্থর জলধর-সুষমা মাকেই বুঝিতে হইবে। তিনিই গায়ত্রী প্রতিপাদ্য বাচ্যশক্তিস্বরূপিণী নির্গুণ দেবতা হইয়াও তাঁহার নির্গুণস্বরূপ, সগুণ জীবের অগম্য জানিয়া সাধকের সিদ্ধি সাধনার অনুকুল সগুণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্ত জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই ভক্তহৃদয়বিহারিণী সগুণ মূর্ত্তিই গায়ত্রী মন্ত্রের মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী বাচকশক্তি। পঞ্চাশৎ বর্ণনাদিনী কুলকুণ্ডলিনীর বর্ণে বর্ণে কেবল তাঁহারই শ্বেত পীত নীল লোহিত বর্ণচ্ছটা। প্রতি বর্ণ কেবল তাঁহারই স্বরূপ বর্ণনা।

সর্ব্বেষা মেব মন্ত্রাণাং নির্ব্বাণপদদায়িনী
সৈকাহি বীজং বিপ্রর্ষে জৈমিনে মোক্ষদায়িনী
তত্র তত্র সমস্তানাং মন্ত্রাণাং তাং মহামতে
বেদাঃ গ্রাহু রধিষ্ঠাত্রী দেবতাং মোক্ষদায়িনীং।

মহাভাগবত (ব্যাসজৈমিনি-সংবাদ)।

(বারাণসীক্ষেত্রবাসী মুমুক্ষু মানবগণের দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে স্বয়ং শম্ভু তৎক্ষণাৎ তথা গমন করিয়া যাহার যাহা গুরুদত্ত মন্ত্র, তাহার কর্ণকুহরে সেই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র (দুর্গা) উচ্চারণ করিয়া নির্ব্বাণরূপ মহামোক্ষ দান করেন বলিয়া, বলিতেছেন)—বিপ্রর্ষে জৈমিনে, সেই মহাশক্তিই জীবের নির্ব্বাণমোক্ষদায়িনী, যে হেতু একমাত্র তিনিই সমস্ত মন্ত্রের বীজরূপিণী।

মহামতে! সমস্ত বেদ, সেই মোক্ষদাকেই সমস্ত মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বাচ্য বাচক অবস্থাভেদে সেই সচ্চিদানন্দময়ীর স্বরূপত কোন রূপ ভেদ নাই—জলের ঘনীভূত অবস্থা যেমন মেঘমণ্ডলী, তদ্রূপ নির্গুণ বাচ্য শক্তির ঘনীভূত অবস্থাই বাচকশক্তির সগুণমূর্ত্তি। বায়ু হিল্লোলে মেঘ যেমন তরল হইয়া জল বর্ষণ করে তদ্রূপ ভক্তের প্রেমের হিল্লোলে চঞ্চল হইয়াই মূর্ত্তিময়ী সগুণ দেবতাও ব্রহ্মাণ্ডময় নিজ নির্গুণস্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন। সেই কৃতার্থতার জন্য যাহা কিছু প্রক্রিয়া তাহাই সিদ্ধি ও সাধনা।

মা একস্থলে বলিয়াছেন—

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মমুক্ষুপূর্ব্বমাশ্রয়েৎ ক্রিয়া যোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ স্বল্প মালোচয়েৎ সূক্ষ্মং রূপং মে পরমব্যয়ম্।

সেই হেতু মুক্তি-অভিলাসী সাধক প্রথমে অবশ্য আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করিবে এবং ক্রিয়া যোগ দ্বারা যথাবিধি সেই সমস্ত রূপের সম্যক্ উপাসনা করিয়া ধীরে ধীরে আমার অব্যয় পরম সূক্ষ্মরূপের অল্প অল্প আলোচনা করিবে।

গায়ত্রীর ন্যায় সমস্ত মন্ত্রেরই বাচ্যশক্তি নির্গুণ, কিন্তু বাচকশক্তি সগুণ। কারণ বাচকশক্তি উপাস্য, বাচ্যশক্তি অধিগম্য, বাচকশক্তিকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং বাচ্যশক্তিতে প্রবেশ করিতে হইবে। যতদিন আমার এই মন প্রাণ দিয়া আমি "আমি" থাকিয়া (অর্থাৎ আমি উপাসক তিনি উপাস্য এই জ্ঞান স্থির রাখিয়া) আমাকে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, ততদিন স্থূলাকারে সগুণ মূর্ত্তি বই আমার গতি নাই, আর যে দিন আমার মন প্রাণ প্রকৃতিগর্ভে ডুবিয়া যাইবে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব তাঁহার স্বরূপে বিলীন হইবে—আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যাইবে, সেই দিন আমি কার, কে আমার? আমি থাকলে ত তুমি। সে দিন আমিও নাই তুমিও নাই। সেদিন তটিণী সাগরে গিয়া মিশিতেছে, তটিণীও নাই, সাগরও নাই।

তবে বুঝিতে পারা গেল, মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ দ্বিবিধ—বাচক-শক্তি ও বাচ্যশক্তি। সাধকের উপাসনাক্রমে বাচকশক্তি জাগরিতা হইলে তবে বাচ্যশক্তির প্রকাশ হইবে। যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা যেরূপ মূর্ত্তিমতী হউন না কেন, সকলেই সেই মূলাধার বিবর বিলাসিনী কুলকুণ্ডলিনীর অঙ্গ

বিভূতি বই আর কিছুই নহেন।* অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণমালাই মাতৃকা-সরস্বতীর অক্ষমালা। এই পঞ্চাশদ্বর্ণ হইলেই অনন্তকোটী মহামন্ত্রের আবির্ভাব এবং এই সকল মন্ত্রই সিদ্ধিসাধনার একমাত্র নিদান। এই মন্ত্রই বীজ অঙ্কুর স্তম্ব কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পল্লব পত্র পুষ্প ফল ভেদে নানাবিধ। বীজ বপন ব্যতিরেকে পত্র পুষ্প ফল পল্লবের আশা যেমন অসম্ভব, দেবতার স্বরূপ মন্ত্র ব্যতিরেকেও তদ্রূপ অন্যান্য মন্ত্রে অধিকার থাকা অসম্ভব, এই জন্যই দীক্ষাকালে দেবতার স্বরূপ মন্ত্র যাহা লাভ করা যায় তাহার নাম বীজমন্ত্র। সাধকের হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত পরিষ্কৃত এবং কৃপাসলিল সেচনে সুসিক্ত করিয়া গুরুরূপী পরব্রহ্ম তাহাতে মহাবীজ বপন করেন। সেই বীজেরই অঙ্কুরোদ্গম দেবতার নাম ঘটিত মন্ত্র, তৎপর তান্ত্রিকসন্ধ্যা গায়ত্রী ন্যাস পূজা উপচারমন্ত্র, তাহারই স্তম্ব কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পল্লব। স্তবন বন্দন তাহারই পত্র পুষ্প এবং মন্ত্রাত্মক কবচ তাহার ফলস্বরূপ। ফল মধ্যে যেমন সকল বীজ নিহিত এবং বীজের অভ্যন্তরে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অঙ্কুর কাণ্ড পত্র পুষ্পাদি নিহিত, তদ্রূপ মন্ত্রফল কবচের মধ্যেও বীজমন্ত্র সকল নিহিত এবং সেই বীজেরই অভ্যন্তরে সিদ্ধি সাধনা শক্তি প্রভৃতি অবস্থিত। পরমেশ্বরের উদ্দেশে আত্মবক্তব্যের ভাষার নাম মন্ত্র নহে।

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মামন্ত্রান্মন্ত্র উচ্যতে॥

যাহার মনন হইতে বিশ্ববিজ্ঞান, বিশ্বময় বিশেষজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) ব্রহ্মসত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ডসত্তা পৃথক্ নহে, এই একান্ত অনুভব প্রত্যক্ষ হয়—এই অংশে "মন্" সংসার বন্ধ হইতে পরিত্রাণ ঘটে—এই অংশে "ত্র" সমষ্টিতে ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্ণর আমন্ত্রণ যাহা হইতে হয়, তাহার নাম মন্ত্র।

অবিশ্বাসীর কথা স্বতন্ত্র। এখন শাস্ত্রের আজ্ঞায় যাঁহার বিশ্বাস আছে, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে—পূর্ব্বোক্ত বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞান, সংসার বন্ধন-পরিত্রাণ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের আমন্ত্রণ এই তিনটি অলৌকিক দায়িত্ব যাহাতে নিত্য বিদ্যমান, তাহাই মন্ত্র। সাধন ভজনের ফল পাইব কি? একমাত্র মন্ত্র ভিন্ন কাহার সাধ্য এ জগতে সদম্ভে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে "জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎসিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ? কাহার সাধ্য বলিতে পারে—যদি

*পঞ্চায়তনী দীক্ষার কথা পরে বলিব।

সিদ্ধি না হয় তবে আমি তার জন্য দায়ী রহিলাম, ত্রিভুবনে কাহার এমন আধিপত্য যে এক দিকে সেই অবাঙ্মনসগোচরা দুরারাধ্যা সাধ্য দেবতা, অন্য দিকে মায়ামোহ সমাচ্ছন্ন জীবসাধক, এই উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে ভাই সাধক, ভয় নাই, আমি তোমার প্রতিভূ রহিলাম। সেই সিদ্ধি-দাতা দায় পরিশোধকর্ত্তা প্রতিভূ একমাত্র মন্ত্র। কি জানি মন্ত্রের কেমন দুরন্ত আকর্ষণীশক্তি, যাহার আকর্ষণে নিত্যসিদ্ধ অপারস্থির গম্ভীর পরম-দেবতাকেও চঞ্চল করিয়া তুলে, প্রকৃতির চির প্রবহমান প্রক্রিয়া রাশিকেও স্তম্ভিত করিয়া নিজ প্রচণ্ড প্রতাপ বিস্তার করিতে থাকে, সাধকের প্রকৃতি-সিদ্ধ জীবত্ব বিদূরিত করিয়া শিবত্ব সঞ্চারিত করে, অযত্নসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি নিয়ত তাঁহার নয়নগোচরে নৃত্য করিতে থাকেণ মন্ত্রসিদ্ধি বলে যখন সাধকের ত্রিলোকদৃষ্টি বিস্ফারিত হয়, তখন আর অলৌকিক বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, মহামায়ার অনুগ্রহে যখন তাঁহার অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ার তত্ত্বকবাট উদ্ঘাটিত হয়, তখন আর কার্য্যকারণ প্রক্রিয়া মধ্যে সাধকের পক্ষে কিছুই দুর্ঘট নহে। এই জন্য মন্ত্রকে ভাষা বলিয়া অনুমান করা মূর্খতার পরিণাম মাত্র। মন্ত্র হইতেছে তাহারই অন্তশ্চারিণী নিখিল বর্ণ নিনাদিনী ধ্বনিরূপিণী নিত্যসিদ্ধ প্রত্যক্ষ দেবতা, সেই সাক্ষাদ্দেবতাকে অক্ষর বলিয়া মনে করাও মহাপাপ, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

গুরৌ মানুষ বুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষর ভাবনা
প্রতিমায়াংশিলাবোধং কুর্ব্বাণো নরকংব্রজেৎ।

গুরুদেবে যাহার মনুষ্যবুদ্ধি, মন্ত্রে যাহার অক্ষর ভাবনা এবং দেবপ্রতিমায় যাহার শিলাবুদ্ধি, তাহার নরক অব্যাহত।

অক্ষরতত্ত্বটি আরও একটু বলা হইতেছে। আমরা সাধারণতঃ লিপি-বিন্যাসকে এবং উচ্চারিত বর্ণকে অক্ষর বলিয়া মনে করি—সহজ কথায় বর্ণের নাম অক্ষর। কিন্তু "উচ্চারিত প্রধ্বংসিনো হি বর্ণা ন তৃতীয়ক্ষণ মপেক্ষন্তে" বর্ণ সকল উচ্চারণমাত্রেই ধ্বংসশীল, তাহারা কখনও তৃতীয় ক্ষণের অপেক্ষা করে না—এই দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, পদ, বাক্য বা ভাষা বলিতে বর্ণসমষ্টির একত্র অবস্থানও অসম্ভব। যেমন "কলস" শব্দটি উচ্চারণ করিতে হইলে ক উচ্চারণের পর ল উচ্চারণ করিতে গেলেই ক তখন আর নাই। আবার ল উচ্চারণের পর স উচ্চারণ করিতে গেলেই ল তখন আর নাই,

সুতরাং ক ল স বর্গের উচ্চারণ হইলেও 'কলস' এই শব্দের উচ্চারণ অসম্ভব। বস্তুতঃই বর্ণেরই উচ্চারণ হয়, শব্দের উচ্চারণ অসম্ভব—তবে ঈশ্বরেচ্ছা-গ্রন্থিতে যে সকল বর্ণ শব্দরূপে পরস্পর গ্রথিত, তাহাদেরই যথাক্রমে অব্যবহিত পরে পরে শাস্ত্রানুসারে উচ্চারণ করিতে হইবে, এই পর্য্যন্তই শব্দের শব্দত্ব এবং শাস্ত্রের আজ্ঞা। তাই কথিত হইয়াছে—যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থ প্রতিপাদনে বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যা স্তে তথৈবার্থবোধকাঃ। বর্ণ যতগুলি, যেমন গুলি এবং যে গুলি, যে অর্থ প্রতিপাদনে ঈশ্বরেচ্ছানিয়োজিত এবং সামর্থ্যশালী, তাহারা সেইরূপেই পরতঃ পর উচ্চারিত হইয়া সেই সেই অর্থের বোধক হইবে। আদিভাষার বিবরণে সত্যতত্ত্ব এই যে, মন্ত্ররূপ শব্দব্রহ্ম বেদের আবির্ভাবের পর জীব জগতের শব্দসমষ্টিময়ী ভাষার সৃষ্টি সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই যে অমুকবর্ণ সকল একত্র সমবেত হইলে শব্দরূপ অমুক অর্থের বোধক হইবে—ইহা অনাদি সিদ্ধি, যুক্তি তর্ক বিচার বলে কাহারও সাধ্য নাই যে ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্বময় ভাষাবিপ্লব ঘটাইতে পারে। এই সনাতনী সিদ্ধি চিরকাল সমানভাবে আছে বলিয়াই জগত রক্ষিত হইতেছে, এই জন্যই শব্দশাস্ত্র বলিয়াছেন—

ইদমন্ধতমং কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥

এই সমস্ত ত্রিভুবনরাজ্য অন্ধতম হইয়া যাইত, যদি শব্দনামক জ্যোতিঃ সমগ্র সংসার ব্যাপিয়া দেদীপ্যমান না থাকিত। এ শব্দ, শাস্ত্রানুগত বৈদিক ভাষার, অন্যান্য ভাষার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ সে সমস্তই মহাপ্রকৃতি বৈদিক ভাষার বিকৃতি বা আধুনিক রূপান্তর মাত্র। যাহাহোক আদি ভাষা লইয়াই আমাদের কথা। তাহাতেও দুইটি বর্ণ একদা উচ্চারিত হইবার নহে। এখন প্রথমক্ষণে যাহার উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয়ক্ষণে যাহার নাশ, উচ্চারণের পর যাহাকে পাইবার উপায় নাই তাহাকে অক্ষর বলিয়া স্বীকার করি কিরূপে? কিন্তু তথাপি অক্ষরের নাম অ-ক্ষর, অর্থাৎ কোন কালে যাহার ক্ষরণ (বিনাশ) নাই—অনাদি অনন্ত নিত্য সিদ্ধ সনাতন পদার্থ। তবেই বুঝিতে হইতেছে যে চিরকালই অক্ষর লিখিয়া পড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু অক্ষর কাহাকে বলে তাহা আজ্ও জানি না, ইহাই দুঃখ। ভগবান্ বলিয়াছেন—"শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতীতনূ, শব্দ যাঁহার নিত্যদেহ, সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্ ভিন্ন কাহার সাধ্য শব্দতত্ত্ব প্রকাশ করিবে?

ক্রমশঃ।

হলাহল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকালে।

তখনও চাঁদ উঠে নাই,—তবে সাঁঝের অন্ধকারটা ঘুচিয়া গিয়া একটা অস্পষ্ট আলোক-ছটা যেন গগনমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—আর সেই না আঁধারে না আলোকে পৃথিবী কেমন এক সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন নব পরিনীতা বালিকা-বধূ ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সলজ্জভাবে চারিদিকে চাহিতেছে, আর তাহার ব্রীড়াবনত নয়ন দুটীরমত দূর আকাশমণ্ডলে দুই একটি তারকা এক একবার চাহিয়া আবার যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক এ ভাব কত সুন্দর—কত মধুর!

গঙ্গার তীরের উপর একটী প্রশান্ত উদ্যান। সেই উদ্যানের এক ভাগে গঙ্গার বক্ষের উপর একটী দ্বিতল বাটী। বাটীটী এরূপে গঠিত যে, উপর বারান্দার নিম্নদেশ দিয়া সলিলরাশি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া যাইত। সেই বাটীর ছাদের উপর একটী রমণী পুত্রক্রোড়ে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। এমন সময় পরপারের শ্যামল শস্যক্ষেত্র হইতে চাঁদের একটুখানি দেখা গেল, অমনি কোথা হইতে একটা শ্বেত মেঘ খণ্ড চাঁদকে ধরিতে আসিল, আবার দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া গেল। চাঁদমুখ আবার উজ্জ্বল হইল। পুনরায় একটা ধূম্রবর্ণের মেঘ ধীরে ধীরে চাঁদের উপর দিয়া চলিয়া গেল; যেন সুধাংশুর সুন্দর ললাটে একটা অতৃপ্ত-চুম্বন দিয়া সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে দেখিতে বায়ুপ্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গেল। হায়! মানুষও এইরূপ সৌন্দর্য্য-লোলুপ!

দেখিতে দেখিতে চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ দেখা গেল। একটা সুস্নিগ্ধ কিরণ সুরধুনী বক্ষের এপার হইতে ওপার দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। পবন-হিল্লোলে নদীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছিল—এক্ষণে ইন্দুকররাশি সেই তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া কত রঙ্গে খেলিতে লাগিল;—কখন উচ্চে কখন নিম্নে কখন বা তরঙ্গবক্ষে কত স্নেহে গা ঢালিয়া দিল।

খোকা সুধীর চুপ করিয়া এতক্ষণ চাঁদের দিকে চাহিয়াছিল। সে থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল "মা! আমি চাঁদ নেবো।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন "ও এখানে আসবে কেন?"

"কেন আস্‌বে না!"

"ও বলছে তুমি বড় দুষ্টু—তাই ও আস্‌বে না।"

"আমি ত দুষ্টু নই।"

সুহাসিনী পুত্রকে একটী চুম্বন করিয়া তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিলেন

"চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে,
কদম তলায় কে রে—"

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর করিল;—

"আমি তোদের কেষ্ট ঠাকুর
ঘোম্‌টা তুলে দে রে।"

খোকা হাসিয়া উঠিয়া পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল। সুহাসিনীও ফিরিয়া সেই দিকে চাহিল। এমন সময় খোকা বলিয়া উঠিল;—

"মা!—বাবা, বাবা!"

এই বলিয়াই সুধীর মাতার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া হাসিমুখে "কেষ্ট ঠাকুরের" ক্রোড়ে উঠিতে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কথোপকথনে।

কেদারনাথ পিতার একমাত্র সন্তান। পূর্ব্বে তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে দেনার দায়ে বাড়ীটি পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে। কেদারনাথ এক্ষণে কলিকাতায় কাজকর্ম্মের সন্ধান করিতেছেন, তাঁহার কাজকর্ম্ম হইলে তবু সংসার চলিবার অনেকটা আশা হয়।

আজ তিনি কলিকাতায় যাইবেন। রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতায় যাওয়া হইবে সুতরাং সন্ধ্যাবেলা সুহাসিনীর সহিত একবার দেখা করিবার জন্য উৎসুক হইলেন এবং ছাদের উপর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন।

সুধীর পিতার নিকট যাইয়া ক্রোড়ে উঠিলে, কেদারনাথ তাহাকে একটি চুম্বন করিলেন। সুধীরের আর আহ্লাদ ধরে না।

সুহাসিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পিতাপুত্রের এই রঙ্গরস দেখিতেছিল। কেদারনাথ কিছুক্ষণ পরে সুধীরকে সুহাসিনীর ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন;—"আমার সঙ্গে কি একটা কথাও কবে না?"

"কেন?"

"কৈ আর কও?"

"কেন—এত কইছি!"

কেদারনাথ হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অমন হুঁ, না সকলেই বলে। ভাল ক'রে দু'টা কথা কও!"

সুহাসিনী তখন কিছু বলিল না। অনেকক্ষণ পরে স্বামীকে বলিল, "আজ না কি কলিকাতায় যাবে?"

কে। "হুঁ।"

সু। "কেন যাবে?"

কেদারনাথ বলিলেন "সুহাসিনী! 'কেন যাবে' এ কথা বলা যত সহজ এ কথার উত্তর তত সহজ নহে। পুত্র হইয়া পিতার যদি কোন কাজে না আসিলাম, সন্তান হইয়া পিতার যদি না কোন উপকারই করিতে পারিলাম তবে আর মানুষ নামে প্রয়োজন কি? পুরুষ হইয়া স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া জনকের অন্ন ধ্বংস করা, কিম্বা 'আমি কি করিব' ভাবিয়া বসিয়া থাকা অতি কাপুরুষের কার্য্য। সেই জন্য পিতার নিবারণ সত্ত্বেও আমি কলিকাতায় যাইতেছি। কিন্তু—সেই জন্য তুমি কাঁদিতেছ না কি?"

সুহাসিনী সামান্য কাঁদিতেছিল বটে। সে কিছু বলিল না। স্বামীর অতবড় একটা দীর্ঘ বক্তৃতা সে যে বড় একটা বুঝিতে পারিয়াছিল তাহা ত বোধ হয় না! কেবল "একটা কথা" তাহার বোধগম্য হইয়াছিল; তাই সে লজ্জায় কিছু বলিল না। অধিকন্তু তাহার চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল তাহার অজ্ঞাতে নিম্নদেশে পতিত হইল।

কেদারনাথ পুনরায় বলিলেন "সুহাস! মনে করিও না তোমায় কিছু বলিয়াছি;—কথাক্রমে কি বলিয়াছি বলিয়া কি তোমার ক্রন্দন করা উচিত?"

সুধীর এতক্ষণ চুপ করিয়া চাঁদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল; হঠাৎ মাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে বলিল, "মা! কাঁদতিস্ কেন?"

সুহাসিনী কিছু বলিল না। কেদারনাথ সুধীরকে লইয়া বলিলেন;—

"সুধীর! আমার সঙ্গে যাবি?"

"কোতায়?"

"কলিকাতায়।"

"মা গেলে দাব।"

"আমার সঙ্গে যাবি না?"

সুধীর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

সুহাসিনী এতক্ষণে অবশ্য ক্রন্দন থামাইয়াছিল। সে এইবার কেদার নাথকে বলিল "কখন যাবে?"

"এই দশটার গাড়ীতে।"

"আবার কবে আসিবে?"

"দেখি—যখন সময় পাইব।"

সুহাসিনীর সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার গলাটা কেমন ভারি ভারি হইতে লাগিল। সে কিছু বলিল না।

কেদারনাথ বলিলেন, "বাবা প্রভৃতি কেমন থাকেন, মাঝে মাঝে লিখিও।"

সুহাসিনী মস্তক সঞ্চালনে সম্মতি জানাইল।

"আর মহাশয়ার সংবাদটা দিতেও বোধ হয় ভুল্‌বেন না!'

স্বামীর এই রহস্যে সুহাসিনীর কেমন একটা লজ্জা আসিয়া তাহার মুখটা বুজাইয়া দিল। সে সলজ্জে আপনার চক্ষুদ্বয় অবনত করিল। আর কেদারনাথ—ছিছি কি লজ্জার কথা! সেই ব্রীড়াবনত সুন্দর নয়নপল্লবে, ইন্দুকরবিধৌত যামিনীর সেই ধীর নির্জ্জনে, সুহাসিনীর লজ্জাসঙ্কুচিত নেত্র-কমলে চুম্বন করিয়া ফেলিল। দূর আকাশমণ্ডলে চাঁদ মেঘের অন্তরালে একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, একটা সুমন্দ সমীরণ গঙ্গার পরপার হইতে দৌড়িয়া আসিয়া "কর কি, কর কি" বলিতে বলিতে কেদারনাথের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, আর গঙ্গার তরঙ্গাবলী ধীরে ধীরে একবার নাচিয়া উঠিয়া আবার ভাগীরথীর অনন্তপ্রবাহে মিশিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায়।

কেদারনাথ সেই দিন রাত্রেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কত বুক-ভরা আশা, কত অসীম সুখের মোহন স্বপ্ন লইয়া কেদারনাথ কলিকাতায়

উপস্থিত হইলেন। তিনি মানসনয়নে কলিকাতার যাহা চিত্র দেখিয়াছিলেন, কলিকাতাকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী ও ধনসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু পথে পথে বারাঙ্গনার ভীষণ কটাক্ষ পাপের জলন্ত উদাহরণ ও কত প্রকার অধর্ম্ম দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে দুঃখ ও ঘৃণা বোধ হইল।

কেদারনাথ বাসায় থাকিয়া কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুবিধা করিতে পারিলেন না। তিনি আবেদন পত্র হস্তে লইয়া যেখানেই যান, সে স্থান হইতেই ভগ্নমনোরথে ফিরিয়া আসেন। কেহ বলিলেন, "আপনার বিদ্যা আছে বটে কিন্তু হাত পাকে নাই।" কোন মহাত্মা বলিলেন "দিন কতক কাজকর্ম্ম শিখিয়া আসুন—এখনও কিছু কাজ জানেন না।" সুতরাং নিরাশ হৃদয়ে প্রত্যহ তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইত।

অবশেষে একদিন তাঁহার কপাল ফিরিল। এক সওদাগর আফিসের বড় সাহেব তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন এবং আপাততঃ কুড়ি টাকা বেতনের একটী চাকরী দিলেন।—লুপ্তপ্রায় আশা পুনরুজ্জীবিত হইল। সোৎসাহে বিপুল যত্নের সহিত তিনি কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মানুষের যখন ভাগ্য ফিরিয়া যায়, তখন ভূমিতে চপেটাঘাত করিলেও পয়সা উঠে। বাস্তবিক সুখদুঃখের এমনই পরিবর্ত্তন যে অসীম সুখের মাঝেও কোথা হইতে এক অসম্ভাবিত সুবিশাল দুঃখরাশি আসিয়া মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে আবার অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণার মধ্যেও এক অভূতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় সুখ আসিয়া নিরাশার আঁধারময় গভীরতম গহ্বর হইতে একেবারে তুলিয়া লইয়া মানুষকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যায়। এই সুখদুঃখের এত পরিবর্ত্তন বলিয়াই মানবজীবন পৃথিবীতে কখন সুখময়, কখন দুঃখময় কিন্তু ইহাও নিশ্চিত, এত পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই মানুষ ভীষণ দুঃখেও আশার কণিকা লইয়া বাঁচিয়া থাকে।

কেদারনাথ সাহেবের কেমন সুনজরে পড়িয়াছিলেন। দুই তিন মাসের মধ্যেই সাহেব তাঁহাকে এক শত টাকা বেতনের পদে স্থাপিত করিলেন এবং আরও কিছু দিনের মধ্যেই কেদারনাথ আফিসের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। এখন তাঁহার আর অর্থের অভাব রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তনে।

এক বৎসর পরে কেদারনাথ বাটী আসিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতার আনন্দের আর সীমা নাই। পুত্রের উন্নতিতে তিনি অতীব আনন্দিত। কেদারনাথও হৃষ্টচিত্তে পিতার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া পিতার শুভ আশীর্ব্বাদ হৃদয়ের সহিত শিরে লইয়া জন্ম সার্থক বোধ করিতেছেন।

এমন সময় বৃদ্ধের চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি অন্য গৃহে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই অতীতকালের অতীত কথা, তাঁহার মনে পড়িল—কেদারনাথের স্বর্গীয় মাতার লুপ্ত স্মৃতি বৃদ্ধের হৃদয়ে আসিয়া কত বিগত কাহিনীর পুনরুন্মেষ করিয়া দিল। যৌবনের সেই কত অসীম ভালবাসা, প্রৌঢ়ের সেই কত মধুর স্মৃতি বৃদ্ধের অস্তমান জীবন মোহিত করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ দুই হস্তে নয়ন আবরণ করিয়া স্বর্গগতা গৃহিণীর চিন্তা করিতে লাগিলেন,—চক্ষু ফাটিয়া হস্ত মধ্য দিয়া অশ্রুজল ধীরে ধীরে ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

এক বৎসর পরে সুহাসিনীর সহিত কেদারনাথের দেখা হইল। পুত্র সুধীর পিতাকে দেখিয়া "বাবা! এদ্দিন কোথায় ছিলে" বলিয়া পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কেদারনাথ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন।

সেই ছাদের উপর গঙ্গার ধারে আজ আবার স্বামীস্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছে। সুধীর কেদারনাথের ক্রোড়ে আছে। তেমনি করিয়া চাঁদ উঠিয়াছে,—তেমনি করিয়া জ্যোৎস্নারাশিতে জগৎ ভাসিতেছে,—তেমনি করিয়া কুল কুল শব্দে তরঙ্গিনী রঙ্গভঙ্গে ছুটিতেছে। দূরে গঙ্গাবক্ষস্থ এক খালি ক্ষুদ্র তরণীর ভিতর হইতে সূক্ষ্ম আলোকরেখা নদীর দুই কূলে গিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইতেছে। তাহা দেখিয়া কেদারনাথ বলিলেন, "দেখ সুহাস! যে দিন তোমাদের ছাড়িয়া এখান হইতে কলিকাতায় গমন করি, সে দিন তোমার মনে আছে কি? কত অনন্ত সুন্দর ছবি, কত বিশাল মোহন চিত্র, তখন মানসনয়নে দেখিতেছিলাম। শেষে কিন্তু সকলই মিথ্যা হইয়া আসিতেছিল। মনে করিয়াছিলাম, বুঝি সে সাধের ছবিগুলি, সে হৃদয়ের চিত্রগুলি কোথায় মুছিয়া যাইবে। তখন হতাশভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম।

আর ঐ সূক্ষ্ম আলোকরেখার মত সেই সময়ে একটি পদার্থ দেখিতে পাইলাম। তাহা আশা! হায় আশা! তুমি না থাকিলে মানুষের কি হইত?

সুহাসিনী হাসিয়া বলিল "কি বল্‌ছ?"

কেদারনাথ বলিলেন "কেন, কিছু বুঝিতে পারিলে না?"

সু। "একটু একটু পেরেছি,—তা' সে সব কথা এখন আবার কেন?"

কেদারনাথ কিছু বলিলেন না। সুহাসিনীর সরলতা দেখিয়া তিনি আহ্লাদিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কেদারনাথ সুহাসিনীকে বলিলেন "অত কম পত্র লিখেছিলে কেন?"

সুহাসিনী বলিল "বেশী কি লিখিব, ভেবেই পাই না। আর, আর—"

সুহাসিনী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা মুখ হইতে বাহির হইল না। এমন সময় সুধীর বলিল "বাবা! তুমি আবার যাবে?" তখন সুহাসিনী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কেদারনাথ বলিলেন "কেন রে সুধীর?"

সুধীর বলিল "আমিও দাব তাই ভাবচি—আর মা! তুইও যাবি নয়?" বলিয়া সুধীর মাতার দিকে চাহিল।

বালকের বিজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনিয়া কেদারনাথের হাসি পাইল, তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য সুহাসিনী ও পরিশেষে সুধীর বাবুও সে হাসিতে যোগ দিতে ভুলে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার বন্ধু।

দিন কতক পরে কেদারনাথ পুনরায় কলিকাতায় ফিরিলেন এবং নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

কলিকাতায় কেদারনাথের একজন বন্ধু জুটিয়াছিল। তাহার নাম ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্রনাথ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কেদারনাথের বাসায় আসিত এবং অবকাশের দিন উভয়ে ভ্রমণে বহির্গত হইত।

একদিন কেদারনাথ শুনিলেন যে, আফিসের বড়সাহেব বিলাত যাইবেন। তখন তাঁহার একটু ভাবনা হইল। ধীরেন্দ্রনাথকে বলিলে, তিনি

বলিলেন "ভয় কি? যে কোন সাহেবই আসুক না কেন, তোমার নিকট সকলেই বশ হইবে।"

কেদারনাথ কিছু বলিলেন না। কিন্তু আরও কয়েক দিন তাঁহাকে বিশেষ চিন্তিত দেখা গেল। যাহাহউক কয়দিন চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি বাড়ীর কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

একদিন সুহাসিনীর নিকট হইতে তিনি একখানি পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

প্রিয়তমেষু—

অনেকদিন তোমার পত্র পাই নাই। সেই জন্য আমরা অত্যন্ত ভাবিত আছি। আমরা এখানে সকলে ভাল আছি, তুমি কেমন আছ? শীঘ্র পত্রের উত্তর দিয়া আমাদের চিন্তা দূর করিও। অধিক আর কি লিখিব?

তোমার সুহাসিনী।

পুঃ দাসীর প্রণাম জানিও। সুধীর সর্ব্বদা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। ইতি

চিন্তার সময় প্রিয়জনের সংবাদাদি পাইলে মনটা তবু অনেকটা সুস্থির হয় কিন্তু কেদারনাথের তাহা হইল না! অনেক মানুষের এরূপ হয়! কেদারনাথেরও পত্র পাইয়া বিরক্তি জন্মিল। বিশেষতঃ সুহাসিনীর সেই "একঘেয়ে" পত্র গুলা তাঁহার কেমন ভাল লাগিত না! তিনি কত 'প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর হৃদয়নাথ' প্রভৃতি শব্দপূর্ণ পত্রের আশা করিতেন, কিন্তু মূর্খা সুহাসিনী তাহা লিখিত না বা লিখিতে জানিত না। সুতরাং কেদারনাথের বিরক্তি ত হইতেই পারে!

ধীরেন্দ্র কেদারনাথকে দিন কতক চিন্তান্বিত দেখিয়া বলিল "দেখ ভাই! তোমায় ক'দিন বড় ভাবিতে দেখিতেছি তা যদি একটা ঔষধ খাও, তাহা হইলে সব সেরে যায়!"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ঔষধ?"

ধী। "কিছুই নয়" তবে একটু "রোজ লিকর।"

কে। "'রোজ লিকর' না মদ হইতে তৈয়ারি হয়?"

ধী। "কে বলিল? সে সব কিছু নয়—বেশ্ খাইতে। সদ্গন্ধও আছে। শরীর ও মন বেশ্ তাতে ভাল থাকে—কিছুই খারাপ নয়।"

কেদারনাথ 'খাইব কি না খাইব' ভাবিতে ভাবিতে মনে করিলেন, "না খাইলে ধীরেন হয় ত মনে মনে রাগ করিবে। আর মদও ত নয়, বরং

খেলে মনের চিন্তা যেতে পারে—আর তা ছাড়া বেশী ত খাব না!"

কেদারনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—ঐ ঔষধ কোথায় পাওয়া যায়?"

"আমি আনিতেছি" বলিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ এক বোতল 'রোজ লিকর' নিজে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া আনিল।

কেদারনাথ প্রথমে একটুখানি খাইল। খাইয়া মন প্রফুল্ল হইল; তার পরে বলিল "আচ্ছা আর একটু দাও।" ক্রমে অর্দ্ধেকটা কেদারনাথের উদরস্থ হইল। ধীরেন্দ্রনাথ বাকী অর্দ্ধেকটা এক নিঃশ্বাসে খাইয়া ফেলিল।

পান করণান্তর উভয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অভিনয় স্থলে।

তখন বাসন্তী সমীরণে সায়াহ্নকাল আমোদিত হইতেছিল,—অস্তমন সূর্য্যকিরণে জগৎ প্রতিভাসিত হইতেছিল এবং স্তরে স্তরে স্বর্ণোজ্জ্বল মেঘখণ্ড সকল পশ্চিমগগণ উজ্জ্বল করিতেছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ কেদারনাথকে যে দিকে লইয়া যাইতেছিল, তিনিও সেই দিকে যাইতেছিলেন। 'রোজ লিকর' (বা গোলাপী পানীয়) পানে কেদারনাথের সামান্য একটু মত্ততা জন্মিয়াছিল কিন্তু হৃদয়টা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়াছিল। তাই কেদারনাথ উন্মুক্ত হৃদয়ে হাসিমুখে ধীরেন্দ্রনাথকে কত কথা বলিতেছিলেন।

কেদারনাথ! সাবধান!! এ জগতে কে কিসে শত্রুতা সাধন করে, তাহা তুমি অবগত নহ। সংসারের কুটিলতা, ভীষণ জগতের আবিলতা তোমার হৃদয়ে এখনও প্রবেশলাভ করে নাই। কিন্তু তোমার মনের দুর্ব্বলতার জন্য তোমার অধঃপতন হইতেছে!

ধীরেন্দ্রনাথ সে দিন কেদারনাথকে শীঘ্র শীঘ্র বাসায় রাখিয়া আসিল না। রাত্রি হইল, কেদারনাথও আজ বাসার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। শেষে পরামর্শ হইল অদ্য রজনীতে নাট্যাভিনয় দেখিতে যাওয়া হইবে। যথা সময়ে উভয়ে দেখিতেও যাইলেন।

উজ্জ্বল আলোকে রঙ্গমঞ্চ আলোকিত, সুমধুর ঐক্যতান ধীরে ধীরে বাজিয়া দর্শকগণের চিত্তবিনোদন করিতেছে, অপ্সরাকণ্ঠের ত্রিদিব-বাঞ্ছিত

সুমধুর গীতধ্বনিতে দর্শকগণ তন্ময় হইতেছে, রম্ভোর্ব্বশী সদৃশী নর্ত্তকীগণের বিলোলকটাক্ষে সকলকে স্তম্ভিত করিতেছে, কেদারনাথ বিহ্বলচিত্তে, চিত্ত-বিভ্রমে বলিয়া উঠিলেন "বাহবা—বেশ্-বেশ্।"

দর্শকগণ একবারমাত্র সেই দিকে চাহিয়া দেখিল এবং দেখিয়াই পুনরায় অভিনয় দেখিতে লাগিল।

রাত্রিশেষে কেদারনাথ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কলিকাতার বাসায় বড় কেহ কাহারও সংবাদ রাখে না, সুতরাং কেদারনাথকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না।

কেদারনাথ ধীরে ধীরে আপন শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল, কিন্তু কেদারনাথের নিদ্রিত মস্তিষ্কেও একটি লবণ্যময়ী নর্ত্তকীর চিন্তা আসিয়া কত কি ক্রীড়া করিতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাপ।

তারপর কেদারনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথকে প্রায়ই অভিনয়স্থলে দর্শকগণের সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাওয়া যাইত। কতদিন ধীরেন্দ্রনাথের দেখাদেখি কেদারনাথ অভিনেত্রীগণের গাত্রে ফুলের তোড়া ছুড়িয়া মারিত আর তাহারাও এক একটা আবেশময় বিলোলকটাক্ষে কেদারনাথের নৈতিক চরিত্রের বিশেষ উন্নতি করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত!

এদিকেও আর এক মাত্রা অধিক উঠিয়াছিল। 'রোজ লিকর' পান করিতে করিতে বন্ধুতার অনুরোধে, মনের প্রফুল্লতা অধিকতর বৃদ্ধির জন্য, স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং আরও কতকগুলি 'অনিবার্য্য' কারণ দর্শাইয়া কেদারনাথ "নিয়মিত" একটু করিয়া সুরাপান করিতে লাগিলেন।

সুহাসিনী পূর্ব্বেকার মত প্রতি সপ্তাহেই স্বামীকে একখানি করিয়া পত্র লিখিত। বৃদ্ধ পিতাও কতবার স্বহস্তে কেদারনাথকে লিখিতেন, কিন্তু সে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক সে গুলি কেদারনাথের নিকট যাইলে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিতেন। কি 'প্রিয়তমেষু—শ্রীচরণ সেবিকা' কিম্বা বৃদ্ধপিতার 'বাবাজী—বাপধন' প্রভৃতি সেকেলে সম্বোধনগুলা তাঁহার ভাল লাগিত না!

হায়! কেদারনাথ, তুমি যে পিতার দারিদ্র্যের জন্য একদিন নিজ পত্নীর নিকট "সন্তান হইয়া পিতার যদি কোন কাজে না আসিলাম তবে আর মানুষ নামে প্রয়োজন কি" বলিয়াছিলে, সেই পিতার স্নেহার্দ্র সম্বোধন এক্ষণে (ধনী তুমি!) তোমার ভাল লাগে না? তুমি যে পিতার পদতলে একদিন লুণ্ঠিত হইয়া আপনার মানবজন্ম সার্থক হইল ভাবিয়া মনে মনে পিতৃপদযুগল পূজা করিয়াছিলে, সেই পিতার পত্র পাইয়া এক্ষণে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও? তোমার মরণই মঙ্গল!

মাঝে মাঝে কেদারনাথের মনে অনুতাপের উদয় হইত। কিন্তু যখন বিষম জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন বন্ধুরূপী পিশাচ ধীরেন্দ্র আসিয়া সুরাই প্রকৃত ঔষধ বলিয়া উপদেশ দিত। কেদারনাথও সুধাবোধে পুনরায় হলাহল পান করিতেন।

আবাসবাটীখানি উদ্ধার করিবার জন্য কেদারনাথ কতকগুলি টাকা পূর্ব্ব হইতেই জমাইতেছিলেন এক্ষণে সুরা ও বেশ্যায় সে সকল নিঃশেষিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে মাসে মাসে পিতৃগৃহে কিছু টাকা পাঠাইতেন, এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইল। তত্রাচ ২০০।২৫০ টাকাতেও কেদারনাথের এক্ষণে সঙ্কুলান হইত না—কাজে কাজেই তিনি ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাপিষ্ঠ ধীরেন্দ্রই আবার তাঁহার সুরা ও তদানুসঙ্গিক নানাবিধ বিলাসিতার জন্য ঋণের অর্থ আনিয়া দিতে লাগিল।

শীঘ্রই পুত্রের গুণাগুণের কথা বৃদ্ধ পিতার কর্ণে যাইল। তিনি ত শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধবয়সে এ বিষম সংবাদ শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ আর সহিতে পারিল না। বাস্তবিক কেই বা এরূপ সহিতে পারে?

সুহাসিনী শুনিয়া নির্জ্জনে অনেক কাঁদিল। গভীর নিশীথে অভাগিনী ছাদের উপর যাইয়া ঘোরান্ধকারে পতিতপাবনীর নিকট স্বামীর জন্য কত প্রার্থনা করিতে লাগিল,—দীন হৃদয়ের কত তপ্তশ্বাসের সহিত অশ্রুজল মিশ্রিত করিয়া যুক্তকরে একাগ্রচিত্তে জগদীশ্বরের নিকট নিজ পতির জন্য নীরবভাষায় কত প্রার্থনা করিতে লাগিল। কে জানে পাষাণতনয়ার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল কি না;—কে বলিতে পারে, সেই অচিন্ত্য অনাদিনাথের কর্ণে দীনা সাধ্বী রমণীর সেই করুণ প্রার্থনা উপস্থিত হইল কি না!

* * *

দুঃখপীড়িত মূর্চ্ছিত বৃদ্ধের সে মোহ আর ভাঙ্গে নাই। কেবল অন্তিম সময়ে—শেষ দীর্ঘশ্বাসের সহিত বৃদ্ধ একবার "কেদারনাথ" বলিয়া মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পার্থিব জগতের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। সুহাসিনী ও প্রতিবাসীগণ করুণস্বরে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, ঘোর নিশীথে নিদ্রিত জন সে কাতরস্বরে চমকিত হইয়া নিদ্রা পরিত্যাগ করিল।

ঠিক্ এই সময়ে কেদারনাথের নিকট একখানি টেলিগ্রাম গেল। কেদারনাথ তখন মদিরাবিহ্বল হইয়া বারাঙ্গনার পাপময় কোমল ক্রোড়ে শুইয়াছিল। টেলিগ্রাম পাইয়া একবার মাত্র কি ভাবিল কিন্তু ধীরেন্দ্রপ্রদত্ত সুরাপানে পুনরায় সব ভুলিয়া গেল। হায় মদিরা! তুমি সব করিতে পার। তোমার রূপে যে একবার মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার উদ্ধারের আশা অতি অল্পই আছে। তোমার কুহকে যে ভুলিয়াছে সেই মজিয়াছে। তুমি যে জগৎ ছারখার করিলে! দয়াময় দেব! কবে সে দিন আসিবে যে দিন এ রাক্ষসীর করাল কবল হইতে জগতের পুনরুদ্ধার হইবে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনুতাপ।

এ জগতে পাপের শাস্তি নিশ্চয়ই আছে। তাহা না থাকিলে সংসার থাকিত কি না সন্দেহ। স্বর্গ বল আর নরকই বল সব এই সংসারে। তাই আমরা পুণ্যের চিত্র দেখিয়া কখন বা হৃষ্ট হই কখন বা পাপের জ্বালাময়, যন্ত্রণাময় পরিণাম দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। কিন্তু ভ্রান্ত মানুষ ভীষণ পাপচিত্র দেখিয়াও পুনরায় পাপে মগ্ন হয় কেন? কেন! কে জানে!—

কেদারনাথ পরদিন পিতার মৃত্যুর কথা জানিতে পারিল কিন্তু জানিয়াও কিছু করিল না। বরং হৃদয়ে একটু জ্বালা উপস্থিত হইলে, সুরাপানে আবার সব ভুলিবার চেষ্টা করিল। মূর্খ বিবেকবিহীন কেদারনাথ তখন সুরাকেই জ্বালানিবারক মহৌষধ মনে করিয়া হলাহল উদরস্থ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল তাহা আর নিবিল না।

ঘোরতর সুরাপায়ী বলিয়া দুই এক মাসের মধ্যেই কেদারনাথের কাজ গেল। আর তখন কিছু আগেকার বড় সাহেব ছিলেন না যে, কেদারনাথের সহস্র দোষ মার্জ্জনা হইবে। সুতরাং অর্থহীন ঋণগ্রস্ত কেদারনাথ আজ বাটী

অভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিল। সয়তানের সহচর ধীরেন্দ্র তখনও কেদারনাথের সঙ্গ ত্যাগ করিল না। সে কেদারনাথের অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল, এক্ষণে কেদারনাথের বসতবাটী বেনামী করিয়া নিলামে ক্রয় করিবার জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কেদারনাথ গাড়ীতে উঠিয়া অবধি চিন্তামগ্ন। তাহার মুখ মধ্যে মধ্যে এরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিতেছিল যে ধীরেন্দ্র তাহাকে কিছু বলিতে সাহস করিল না।

গাড়ী ক্রমে কত স্থান অতিক্রম করিয়া শেষে গ্রামের সমীপস্থ হইতে লাগিল। কেদারনাথ দূরে সেই নিজ গ্রামের শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাইল। সেই কৃষকগণের আনন্দগীতি, সেই পূর্ব্বকার মত ধীরে ধীরে তাহার কর্ণে আসিয়া অস্পষ্ট বাজিতে লাগিল কিন্তু কিছুই ভাল লাগিল না। যে জন্মভূমিকে দেখিলে কেদারনাথের স্নেহ ভালবাসা উথলিয়া উঠিত, আজ সেই জন্মভূমির নিকট আসিয়া কেদারনাথের পা উঠিল না। ট্রেনখানি দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল, কেদারনাথ কিন্তু গাড়ী হইতে নামিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। হায়! সেই কত স্নেহের, কত আদরের জন্মভূমির,—সেই কত ভক্তির, কত শ্রদ্ধার জনকজননীর, সেই কত অসীম প্রেমের, কত অনন্ত ভালবাসার সুহাসিনীর স্মৃতি আসিয়া কেদারনাথের হৃদয় মুহ্যমান করিয়া ফেলিল। হতভাগ্য শ্যামল শস্যক্ষেত্র-গত পথ মধ্যে বক্ষে হস্ত দিয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ গত হইলে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া, কেদারনাথ উদাসনয়নে মন্থরগতিতে ধীরেন্দ্র সমভিব্যাহারে গ্রাম অভিমুখে যাইতে লাগিল। পথে গ্রামের লোকের সহিত দেখা হইলে, কেহ কথা কহিল না। বালকগণ পর্য্যন্তও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। কেদারনাথ লজ্জায় অবনত বদনে, বিমর্ষহৃদয়ে ধীরে ধীরে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

হতভাগ্য অনুতপ্ত কেদারনাথ নিজবাটীর দ্বারে আসিয়া কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। জানিত পিতা নাই যে স্নেহকণ্ঠে ডাকিবে, মাতা নাই

যে আদরে আহ্বান করিবে,—একমাত্র আশা সুহাসিনী। তাই অনেকক্ষণ দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া কেদারনাথ কম্পিতকণ্ঠে আবেগে ডাকিল, "সুহাসিনি!"

ধীরেন্দ্র কেদারনাথের সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার কি মনে হইতেছিল বলিতে পারি না, তবে সেও কেদারনাথের বিকৃতস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। কেদারনাথ পুনরায় চাঞ্চল্যময় কণ্ঠে সাবেগে ডাকিল "সুহাসিনি!" কেহ উত্তর দিল না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, অমাবস্যা বলিয়া তখনই একটু অন্ধকার আসিতেছিল, হঠাৎ সেই আঁধারময় নৈশগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা পেচক, গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। কেদারনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ চমকিত হইল।

কেদারনাথ এবার আর কিছু করিল না, ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিল মাত্র। অমনই সেই দ্বার খুলিয়া গেল। কেদারনাথ বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র কতকগুলা চামচিকা শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

কেদারনাথ সেই অন্ধকারময় নির্জ্জনপ্রায় বাটীর উপরে চলিলেন। দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, কোন ঘরে আলোক নাই, কেবল মূষিকাদি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

এত অন্ধকার হইয়াছিল যে, কিছু দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কেদারনাথ একটা ঘরের একস্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে একটা পুরাতন প্রদীপ পাইলেন কিন্তু তাহাতে তৈল ও বর্ত্তিকা ছিল না সুতরাং সেটা ফেলিয়া দিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তাঁহার পুটুলিতে দুইটা বাতি আছে। সুতরাং সেই দুইটী বাহির করিয়া দিয়াশালাই দিয়া অগ্নি জ্বালিলেন এবং দুই জনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কেদারনাথ এইবার আপনার শয়নকক্ষের দিকে যাইতে লাগিলেন। কত ধূলা, মূষিক, আরসুলার মধ্য দিয়া উভয়ে চলিতে লাগিলেন।

অন্যান্য ঘরের দ্বারগুলি কোনটা উন্মুক্ত, কোনটা বা অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু এ ঘরের দ্বার বন্ধ,—বিপুল সন্দেহে, গভীর আশ্বাসে কেদারনাথ দ্বার ঠেলিলেন।

দ্বার খুলিয়া গেল কিন্তু ঘরের মধ্যে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

সেই গৃহমধ্যে "সুহাসিনী" ছিন্নশয্যায়—অন্তিমশয়নে শায়িতা। অদূরে পালঙ্কোপরি সুধীর নিদ্রিত।

দুর্ভাগিনী শ্বশুরের মৃত্যুর পর পিত্রালয়েও যায় নাই, যেন কাহার আশ্বাসে শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিয়াছিল। প্রায় এক মাস হইল তাহার জ্বর হইয়াছিল, একজন বৃদ্ধা তাহার নিকটে দিবসে থাকিত, রাত্রে চলিয়া যাইত। আজ জ্বর অত্যন্ত অধিক হইয়াছে বলিয়া দ্বারগুলি পর্য্যন্তও বন্ধ করা হয় নাই। সে অঘোর নিদ্রা যাইতেছিল। কেদারনাথ সাশ্রুনয়নে উদ্বেলিত কণ্ঠে ডাকিলেন "সুহাসিনী!"

বোধ হয় সেই নিদ্রাগতা অচেতনা সুহাসিনী তখন নিদ্রাযোগে কি মধুর মিলনস্বপ্ন দেখিতেছিল—বুঝি সে মন্দাকিনী-প্রবাহিত, নন্দনশোভিত সেই ত্রিদিবধামে মন্দারমালায় সুসজ্জিতা হইয়া নিষ্ঠুর প্রাণকান্তের আগমন প্রার্থনা করিতেছিল, তাই স্বপ্নে একবার হাসিয়া উঠিল। কেদারনাথ পুনরায় আবেগজড়িতস্বরে ডাকিলেন "সুহাসিনি!" সুহাসিনী নয়ন উন্মিলন করিল। হায়! দীনা রুগ্না সাধ্বীর সেই কাতরনয়নের দিকে চাহিতে, কেদারনাথের সাহস হইল না। কেদারনাথের চক্ষু ফাটিয়া তপ্ত অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল।

সুহাসিনী বলিল "এতদিনে আসিলে!"

কেদারনাথ কিছু বলিলেন না।

সুহাসিনী পুনরায় বলিল "কাঁদিও না—আমার কাছে এস।" কেদারনাথ তাহাই করিল।

"আমার মাথায় পা দাও আর আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মে জন্মে তোমাকেই স্বামীরূপে পাই।"

কেদারনাথ আবেগে উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কোথায় যাইবে সুহাসিনী! বল আমায় ক্ষমা করিলে?"

সুহাসিনী বলিল "সে কথা থাক্—সুধীরকে দেখো।"

এই বলিয়া সাধ্বী পতিব্রতা সুহাসিনী স্বামীর চরণতলে মস্তক লুটাইল এবং দেখিতে দেখিতে স্বর্গধামে চলিয়া গেল। হতভাগ্য কেদারনাথ নৈরাশ্যে, ক্ষোভে ও ক্লেশে কাঁদিতেও পারিল না। তাহার মুখ হইতে তখন কিছু বাহির হইল না!

* * * *

যাও সুহাসিনী! অনন্তধামে, সেই পরমপুরুষের পদতলে যাও, সেইখানে গিয়া তাঁহার চরণরেণুতে মিশাইয়া যাও। পাপময় জগতে স্বার্থপরতাময় সংসারে—দেবী তুমি! তোমার স্থান নাই। যাও দেবী অনন্তকাল সেই শান্তিবিরাজিত ত্রিদিবধামে বাস কর গিয়া, সেখানে তোমার পদপ্রান্তে সকলেই ভক্তিভরে অঞ্জলি দিবে!

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্ত।

কেদারনাথ কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সুধীরকে ক্রোড়ে লইল। নিদ্রিত বালক "মা—মা" রবে একবার কাঁদিয়া উঠিয়া পুনরায় নিঃস্তব্ধ হইল। কেদারনাথ আবেগে একবার তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং স্নেহের তনয়ের ললাটে একটা অতৃপ্ত উষ্ণ চুম্বন দিয়া, স্নেহের রত্নটিকে একবার নৈরাশ্যময় জন্মান্ত আলিঙ্গন করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। বাহিরে ধীরেন্দ্র দণ্ডায়মান ছিল। ঘরের ভিতর কি হইতেছিল তাহা সে পাপচক্ষে দেখিতে সাহস করে নাই। কেদারনাথ তাহাকে কিছু বলিল না দেখিয়া, সে ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল।

কেদারনাথ নিদ্রিত সুধীরকে লইয়া একজন প্রতিবাশীর বাটীতে গেল। তথায় একজনের হস্তে সুধীরকে দিয়া বলিল "একে রাখো—আমি আস্‌ছি।" এই বলিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত স্তম্ভিত প্রতিবেশীর হস্তে সুধীরকে দিয়া কেদারনাথ দ্রুতপদে বাহিরে আসিল। তথায় ধীরেন্দ্র দণ্ডায়মান ছিল। কেদারনাথ দ্রুতপদে যাইতেছে দেখিয়া সেও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। পাপিষ্ঠ মৃত্যুর জন্ত যেন কেদারনাথের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল!

কেদারনাথ তাহাকে এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই, বাটীর নিকটে আসিয়া, তাহাকে দেখিয়া কেদারনাথের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। কেদারনাথ গম্ভীরকণ্ঠে ধীরেন্দ্রকে বাটীরমধ্যে ডাকিল। ভয়ে ধীরেন্দ্রনাথ তাহার অনুসরণ করিল। কেদারনাথ দ্বার ভীষণরূপে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল।

কেদারনাথ গৃহমধ্যে যাইয়া আপনার পুটুলিটি লইয়া আসিল এবং ধীরেন্দ্রকে লইয়া উপরের ছাদে গেল।

তথায়—সেই ঘোর অন্ধকারে, ভীষণতাময় নির্জ্জনে, কলকলনাদিনী তরঙ্গিনীর সম্মুখে কেদারনাথ ধীরেন্দ্রকে বলিল "ধীরেন্দ্রনাথ! মদ খাইবে?"

ধীরেন্দ্র বলিল "খাইব।"

পুনরায় বাতি জ্বালা হইল। ধীরেন্দ্র কেদারনাথের বিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। পুটুলি হইতে এক বোতল তীক্ষ্ণবীর্য্য সুরা বাহির করিয়া কেদারনাথ বলিল;—

"ধীরেন্দ্র! দেখ যেদিন হইতে তোমার নিকট হইতে আমি সুরাপান করিতে শিখিলাম, সে দিন কি ভয়ানক! হায়! তখন কেন ভাবি নাই তাহা হইলে আমাকে এ অসহ্য জ্বালা, শত শত বৃশ্চিক দংশনের তীক্ষ্ণ যাতনা সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু ধীরেন্দ্র! তুমিই এ ভয়ানক জ্বালার—এ অসহ্য যন্ত্রণার একমাত্র কারণ। তোমা হইতেই আমার এ ঘোর পরিণাম! তোমা হইতেই আমার পিতার, আমার সাধের সুহাসিনীর মৃত্যু হইল! কিন্তু সুরা আবার সেই সকলের আর একটি কারণ। তাই আজ শেষদিনে—এস ধীরেন্দ্র, এই "হলাহল" পূর্ণ মদিরা পান করিয়া জন্মের শোধ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাই। আমাদের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া কেহ যেন আর মদ্যপান না করে—আমাদের এ ভয়ঙ্কর মরণের কথা শুনিয়া কেহ যেন আর সুরাপানে উন্মত্ত না হয়।"

ধীরেন্দ্র কেদারনাথের সেই আবেগময় ভয়ানক কথা শুনিয়া ভীতকণ্ঠে, জীবনের প্রতি ঘোর কামনাময় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "না না ভাই—আমি খাইব না!"

একটা গগনভেদী উচ্চতম "—হা—হা" রব ধীরেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। নৈশান্ধকারে, নির্জ্জনে, সেই শব্দ আরও ভয়াবহ বোধ হইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিল কেদারনাথ উন্মত্তের হাসি হাসিতেছে।

কেদারনাথ উঠিল। উঠিয়া ধীরেন্দ্রনাথের নিকটে যাইল এবং অন্তিম-চেষ্টার সহিত ভীষণ উন্মত্ততার বিক্রমে, ধীরেন্দ্রনাথের গলদেশ চাপিয়া ধরিল এবং অন্য হস্ত দ্বারা সেই ভীষণ "হলাহল" লইয়া পাপিষ্ঠকে পান করাইতে লাগিল। ধীরেন্দ্রনাথ একবারমাত্র কাঁদিয়া বলিল "কেদারনাথ!—কেদারনাথ ক্ষমা কর।" আর কে ক্ষমা করিবে? কেদারনাথের মস্তিষ্ক দিয়া তখন আগুণ বাহির হইতেছিল।

প্রায় অর্দ্ধেকটা ধীরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া কেদারনাথ বিকট হাস্যের সহিত সেই জীবনঘাতক হলাহলের অপরার্দ্ধ সজোরে এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। তারপরে জীবনের শেষহাসি হাসিতে হাসিতে ঘোরতর মত্ততার সহিত কেদারনাথ ধীরেন্দ্রের বক্ষে সজোরে দুইবার পদাঘাত করিল, পাপিষ্ঠ সেই আঘাতেই রক্তবমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল; আর কেদারনাথের সেই বিকটহাস্য, সেই জনমানবশূন্য ধীরতরঙ্গিনীপারে প্রতিধ্বনিত হইয়া জীবহৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করিতে লাগিল।

ঠিক্ এই সময়ে প্রজ্জ্বলিত আলোকটি নিবিয়া গিয়া ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি করিল!

তখন কেদারনাথ আলিসার উপর দণ্ডায়মান হইয়া, সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে, উজ্জ্বলতারকাপূর্ণ অসীম আকাশতলে, ভীষণতাময়, করুণতাময়, আবেগময়,—নৈরাশ্যময় কণ্ঠে "মা—মা" রবে সুরধুনীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল এবং দেখিতে দেখিতে সেই খরস্রোতার অগাধজলে কোথায় তলাইয়া গেল। হায়! সেই আঁধারময় অমানিশীথিনীর ঘোর অন্ধকার আর কখন ঘুচিবে না!

* * * *

সুরাসেবীর কি ভীষণ শোকাবহ পরিণাম! পাপের কি হৃদয়ভেদী মর্ম্মান্তিক পুরস্কার!

শ্রীরামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

কেন ভালবাসি?

সুধায় সতত মোরে,
কেন ভালবাসি তারে,
সহচরী চিন্তাদেবী অন্তরালে বসি,
"কি দিব উত্তর হায়! কেন ভালবাসি?"

যে দিন এ দু নয়ন,
হেরিল সে চন্দ্রানন,
তদবধি অভাগার পরাণ উদাসী,
কেমনে উত্তর দিব "কেন ভালবাসি?"

তদবধি শূন্যমনে,
সেই জ্ঞান সেই ধ্যানে,—
সেই মান অপমানে কাটে দিবানিশি
পাই না উত্তর তার "কেন ভালবাসি?"

দিন যায় ক্ষণ যায়,
বছর বহিয়া যায়,
উদাসী পরাণ মোর আরও উদাসী,
কি উত্তর দিব আমি "কেন ভালবাসী?"

জানি না কারণ তার,
কেন হেন অভাগার,—
কাঁদে প্রাণ তার তরে দিবা আর নিশি,
জানি না কেন যে আমি "তারে ভালবাসি?"

অভাগা কাতর স্বরে,—
তাই বলে বারে বারে—
সুধা' ও না "কেন এত প্রণয়-পিয়াসী",
"কি দিব উত্তর হায়! কেন ভালবাসি?"

বিমল-সরসী জলে—
কুমুদ যখন দোলে,—
তখন চন্দ্রমা যদি পড়ে ভূমে খসি,
তাহলে উত্তর হ'ত "কেন ভালবাসি।"

কিম্বা যবে তারাদলে,—
চাঁদের কিরণে খেলে,
তখন কুমুদ যদি চে'পে রাখে হাসি,
তাহ'লে উত্তর হ'ত "কেন ভালবাসি।"

রঞ্জিত-প্রভাত-রাগে,
দিবসের পূর্ব্ব-ভাগে,—
যাইত সরোজ যদি ত্যজিয়ে সরসী,
তবে ত উত্তর হ'ত "কেন ভালবাসি।"

অথবা মধ্যাহ্নকালে,
প্রখর-কিরণ-জালে,—
তপ্ত জলে পুষ্প-রাণী যে'ত যদি মিশি,
তবেও উত্তর হ'ত "কেন ভালবাসি।"

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ।

কান্যকুব্জে রাজসূয় এবং স্বয়ম্বর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সমষ্টিতেই জাতিধর্ম্ম হয়, ইহাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মেরও এইরূপ ভিত্তি। কিন্তু অভাগিনী ভারতমাতার কপাল ভাঙ্গিল, সেই জন্য এক্ষণে বিপরীত ফল ফলিল। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয়ে বীরধর্ম্মে বলীয়ান ও উত্তেজিত হইয়া পরস্পরে কেহ কাহার কৃত অপমান সহ্য করিলেন না। জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর বলক্ষয় করিলেন। ভাবিলেন না, যে তৎপূর্ব্বে গিজনীপতি মামুদ সাহা চতুর্ব্বিংশতি-বার ভারতবর্ষের দেবালয় প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিলেন না যে ঘোরপতি সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের বক্ষস্থলে যবন আধিপত্য স্থাপন করিবার সুযোগ দূর হইতে দেখিতেছিলেন। সেই যুদ্ধ অবসানে জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই হীনবল হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের অদৃষ্টরবিও অস্তগত হইলেন। ঘোরপতি সুলতান মামুদ যবনসেনা সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষ আক্রমন করিলেন। প্রথমতঃ তিনি ভগ্ন মনোরথ ও ভগ্নোৎসাহ

হইয়াছিলেন। পরিশেষে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়সেনাসহ জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি অন্যান্য রাজাকে পরাস্ত করিয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে নারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যবন প্রাধান্য স্থাপন করতঃ দিল্লীতে যবন সাম্রাজ্য চিরস্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভারতবর্ষে হিন্দুগৌরবও তদবধি ক্রমশঃ লোপ পাইতে আরম্ভ হইল। যে ক্ষত্রিয় ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীপতি ছিলেন, অদ্য তিনি যবনের দাস হইলেন ও নিজ মহিমা চিরকালের জন্য বিস্মৃত হইলেন। যিনি প্রবল প্রতাপে রাজসূয় যজ্ঞ ও স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান করিয়ালেন ও ভারতবর্ষে রাজ-চক্রবর্ত্তী ছিলেন, তিনিই যবনের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন ও নিজ রাজ্য-সহ ভারতমাতাকে অতল জলে ডুবাইলেন।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশে সাক্সান্ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথা হারলড্ নামা একজন রাজা ছিলেন। রাজ্য লইয়া আপন ভ্রাতা টসটিগের সহিত যুদ্ধ হয়। পরিশেষে রাজা হ্যারল্ড্ যুদ্ধে জয়ী হয়েন ও তথা রাজত্ব করিতে থাকেন। ইহারই অনতিবিলম্বে নরমাণ্ডিদেশবাসী উইলিয়াম ইংলণ্ডদেশ আক্রমন করেন। আপন ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে হীন বল হওয়ায় হ্যারল্ড্ তাহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। হেষ্টিংসের যুদ্ধক্ষেত্রে হ্যারল্ড্ রাজ্যচ্যুত হইলেন ও উইলিয়াম ডিউক্ অফ্ নরমাণ্ডি ইংলণ্ডদেশে স্বরাজ্য বিস্তার করিলেন। তদবধি ইংলণ্ডদেশে নরমান প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুকাল রাজত্ব করেন।

ইংলণ্ডে কালক্রমে ব্রিটিশ রাজ্য স্থাপিত হইল। গ্রেট ব্রিটেন্ ক্রমশঃ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে নানা স্থানে স্বরাজ্য বিস্তার করিল। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজগণ ক্রমশঃ যখন হীন বল হইলেন, তখন ব্রিটিশসিংহ প্রবল হইয়া ভারতবর্ষেও ব্রিটিশরাজ্য স্থাপন করিলেন। ইহা-দিগের রাজনীতি ও শাসনপ্রণালীর গুণে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষেই ব্রিটিশ রাজ্য বিস্তার হইল। যে দুই দেশ প্রায় সমসময়ে একই অবস্থাপন্ন হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, কালের কুটিল গতিতে সেই দুই দেশই এক রাজার অধীন হইল ও উভয় দেশেরই মঙ্গলামঙ্গল একই রাজপুরুষের ইচ্ছাধীন হইল। কেবল মাত্র প্রভেদ এই যে ঐ উভয় দেশের মধ্যে রাজা প্রজা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কান্যকুব্জে রাজসূয় ও স্বয়ম্বরের এই শেষ ফল?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন ও পণ্ডিত শিবনাথ ইত্যাদির সহিত কথোপকথন।

প্রায় সপ্তদশবর্ষ অতীত হইল, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ২৮শে অক্টোবর ইং ১৮৮২ সাল, শনিবার। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি। আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্মসমাজের ষাণ্মাসিক। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩।৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী হইতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানবাটীতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি বড় ভালবাসেন। ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ইহার পূর্ব্বদিন আর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে করিতে সশিষ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ভাগীরথীবক্ষে কালীবাটী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ভক্তসঙ্গে ষ্টিমার করিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

সিঁতি নামক গ্রাম পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে।

উদ্যানবাটীটী মনোহর বলিয়াছি। স্থানটী অতি নিভৃত। ভগবানের উপাসনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন। একবার শরৎকালে, আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতার ও সিঁতির নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাই আজ কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শিবনাথ আদি অনেক ভক্তগণ আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালের উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। আবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়মুগ্ধকরী কথামৃত পান করিতে পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর

সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ও দেবদুর্লভ হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখিতে পাইবেন। অপরাহ্নে বাগানটী বহুলোকসমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতামণ্ডপচ্ছায়ায় কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। কেহ সুন্দর বাপীতটে বন্ধুসমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছেন। অনেকেই সমাজগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতিক্ষায় পূর্ব্ব হইতেই উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের দোকান। প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজাবাড়ী—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে। চতুর্দ্দিক আনন্দপরিপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। উদ্যানের বৃক্ষলতাগুল্ম মধ্যে আনন্দের সমীরণ প্রভাত হইতে বহিতেছিল। আকাশ জীবজন্তু বৃক্ষলতা যেন একতানে গান করিতেছে—

'আহা কি হরষ সমীর বহে প্রাণে
ভগবৎ মঙ্গল কিরণে।'

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু। এমন সময়ে পরমহংসদেবের গাড়ী আসিয়া সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া চারিদিকের লোক আসিয়া তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিতে লাগিল।

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে দেবী রচনা হইয়াছে—সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ। তাহার সম্মুখে দালান, সেখানে পরমহংসদেব সমাসীন—সেখানেও লোক। আর দালানের দুই পার্শ্বস্থিত দুই ঘরেও লোক, ঘরের দ্বারদেশে উদ্‌গ্রীব হইয়া লোক দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার জন্য সোপান পরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ। সোপানের অনতিদূরে ২।৩টী বৃক্ষ, পার্শ্বে লতামণ্ডপ, সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন ছিল। তথা হইতেও লোক উদ্‌গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। সেই বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈষৎ হেলিতেছে, দুলিতেছে, যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত করিয়া তাহারাও অভ্যর্থনা করিতেছে।

পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব চক্ষু এককালে তাঁহার আনন্দমূর্ত্তির উপর পতিত হইল। যতক্ষণ নাট্যশালার অভিনয় আরম্ভ হয় না, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ

বিষয়কর্ম্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে। কিন্তু যাই ড্রপ্‌সিন্ (Drop-scene) উঠিয়া গেল, অমনি সকলে সব কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া অনন্যমন হইয়া একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকে। অথবা নানাপুষ্প পরিভ্রমণকারী ষট্‌পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে।

সহাস্যবদনে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত শিবনাথ আদি ভক্তগণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে আমার বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর এক জন গাঁজাখোরকে দেখ্‌লে ভারি খুসী হয়। হয়ত তার সঙ্গে কোলাকুলি করে। (শিবনাথের ও সকলের হাস্য)।

(সংসারী লোকের স্বভাব।)

শ্রীরামকৃষ্ণ।—যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি 'তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস'। অথবা বলি যাও, বেশ Building দেখগে (অর্থাৎ রাসমণির কালীবাটীর মন্দির সকল)। (সকলের হাস্য)

"আবার দেখেছি, যে ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে—তাদের ভারি বিষয় বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়ত, আমার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা অনেক ক্ষণ ধরে কহিছে। এ দিকে এরা আর বসে থাক্‌তে পারে না। ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। বার বার তাদের কাণে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌ছে 'কখন যাবে' 'কখন যাবে'। ওরা হয়ত বলিল 'দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাব'। তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, তবে তোমরা কথা কও, আমরা ততক্ষণ নৌকায় গিয়ে বসি! (সকলের হাস্য)।

(সংসারী লোক ও ত্যাগ।)

"সংসারী লোকদের যদি বল যে, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুন্‌বে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্যে গৌর নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে, এই ব্যবস্থা করেছিলেন—মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল। প্রথম দুটীর লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। হরিনামসুধার একটু আস্বাদ পেলে তারা

বুঝতে পারতো যে মাগুর মাছের ঝোল আর কিছু নয়, কেবল হরিপ্রেমে চক্ষের অশ্রু; আর 'যুবতী মেয়ে' কিনা পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল' কিনা ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

(নাম মাহাত্ম্য।)

"নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখন না কখন ইহার ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন সেই বীজ মাটীতে পড়ে গাছ হল ও তার ফলও হল।

(মনুষ্য প্রকৃতি ও গুণত্রয়; ভক্তি ও গুণত্রয়।)

"যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ আছে। তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব রজঃ তমঃ, তিন গুণ আছে।

"সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান? বাড়ীটী এখানে ভাঙ্গা ওখানে ভাঙ্গা, মেরামত করে না—হয়তো ঠাকুরদালানে পায়রাগুলা হাগ্‌ছে। উঠানে এখানে সেওলা পড়েছে, ওখানে সেওলা পড়েছে, ঝাঁস নাই। আসবাবগুলা পুরানো, ফিট্‌ফাট্ করবার চেষ্টা নাই। কাপড় যা তাই, একখানা হলেই হলো। আর লোকটী খুব শান্ত, শিষ্ট, অমায়িক, কার কোনও অনিষ্ট করে না।

"সংসারীর রজঃ-গুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে ২।৩টা আংটী। বাড়ীর আস্‌বাব খুব ফিট্‌ফাট্। ঘরের দেয়ালে কুইনের (Queen)এর ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়ীটী চুণকাম্ করা যেন কোন খানে একটু দাগ্ নাই। নানা রকম ভাল ভাল পোষাক্। চাকরদের পোষাক্ এম্‌নি এম্‌নি সব আছে।

"সংসারীর তমোগুণের লক্ষণ—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এই সব।

(ভক্তির সত্ত্ব।)

"আবার ভক্তির সত্ত্ব আছে। যে ভক্তের এই সত্ত্বগুণ আছে, তার ধ্যান অতি গোপনে হয়। সে হয়ত মশারির ভিতর ধ্যান করে—সবাই জান্‌ছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠ্‌তে এত দেরী হচ্ছে।

এদিকে শরীরের উপর আদর কেবল পেট্‌চলা পর্য্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হল। খাবার ঘটা নাই। পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁক-জমক নাই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ করে ধন লয় না।

(ভক্তির রজঃ।)

"ভক্তির রজঃ থাক্‌লে সে ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটী একটী সোণার দানা (সকলের হাস্য)। যখন পূজা করে, তখন গরদের কাপড় পরে পূজা করে।

(ভক্তির তমঃ।)

"ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত—ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো' এইরূপ ডাকাত পড়া ভাব।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমরসাভিসিক্ত কণ্ঠে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া গান করিতে লাগিলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

আবার ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাইতে লাগিলেন।

গান (নাম মাহাত্ম্য ও পাপ)

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরা পানাদি বিনাশি নারী;
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
(ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥"

"কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী!" এমন রোক হওয়া চাই।

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর, তিনি ত পর নন, তিনি ত আপনার লোক।

আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিন প্রকার, উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য! যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেয়োছে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে 'ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে! লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও' সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনওমতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য। এইটী বৈদ্যের তমোগুণ, কিন্তু এ গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

(তিন প্রকার আচার্য্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান্—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্‌ছে না দেখে, কোনও আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার; ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না)

সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যাঁরা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাঁদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটী জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ, তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি (Personal God) হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করেন। বিচার ক'রে জ্ঞানির বোধে বোধ হয় যে

'আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করেন। তিনি যে কি, মুখে বল্‌তে পারেন না।

"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কুল কিনারা নাই, ভক্তিহিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধরে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে সে বরফ গলে যায়; তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি টামি আর কিছুই থাকে না। যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরুখোসা ছাড়ালে, এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিন্তু খুঁজে কিছু পাওয়া যায় না।

"যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে? সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে বল্‌বে। একটা লবণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছ্‌ল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গলে মিশে গেল। তখন খপর কে দিবেক্।

"পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ;—পূর্ণ জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমিরূপ লুনের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

"যখন পুকুর থেকে চাসের জন্য মাঠে জল আনে, তখন জলের কত কল্ কল্ শব্দ। যখন পুকুরের জল ও মাঠের জল একসা হয়ে যায়, তখন আর শব্দ হয় না।

"বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, ততক্ষণই লোকে ফড়্ ফড়্ করে, তর্ক করে। বিচার শেষ হলে মানুষ চুপ্ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে কলসীর জল আর পুকুরের জল এক হলে আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।

"আগেকার লোকে বলতো, কালাপানীতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।

('আমি' কিন্তু যায় না।)

আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল' (সকলের হাস্য)। কিন্তু হাজার বিচার কর 'আমি' যায় না। তাই তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান

[illegible] ভক্তের পক্ষে [illegible] অ[illegible] ভক্তের কাছে তিনি সগুণ—একজন [illegible] রূপ হয়ে দেখা দেন। [illegible] তিনি প্রার্থনা শুনেন। [illegible] [illegible] করা হয়, তাঁকেই করা হয়। তোমরা বেদান্তবাদী নও। তোমরা [illegible] নও, তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো, তা[illegible] এসে [illegible] না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাক্‌লেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা [illegible] সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন। যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি। ভক্তি পথে তাঁকে [illegible] পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

৭৬

গীত—কামোদ।

আর দিন আসিতে বন্ধু নেপুর না দিও পায়॥ ধু।
নেপুরের রুণু ঝুনু, ননদিনী শুনিলে,
গোকুলে রাখিব খোঁটা।
শুক্ল বস্ত্রখানি না পরিও, বিনোদরায়, না দিও
চন্দনের ছিটা।
আন্ধার ঘরখানি পসর হৈব চান্দ কপালের ফোটা॥
রাধার সম্বাদ জানিও বিনোদরায়!
আসিও যাইও প্রতিদিন;—
কিহেতু করণ
সাজন কাজন,
আজি কভু নাই সেই দিন॥
কহে হীরামণি, শুন পরশমণি,
পরশমণির ফাঁদ।
মুখের মধু দিয়া, ভ্রমরা করিলা বন্দী,
হাতে দিয়া গগনের চাঁদ॥

TRACING LAMINATED.
DIFFERENT CONTRAST.

শ্যাম, মোরে স্মরিবে [illegible] একবারে না ছাড়ো মায়া,
ও কালাচাঁদ পরদেশী!
প্রেমসাগরে ডুবি, হারগুড়ী(১) তোমারে লেবি;
মন বান্ধ্যাছি পিরীতের ডোরে, পাসরি রহিলা মোরে।
পিরীতি তোমার সনে, আড়াপাড়া সবে জানে;
দৈবে কলঙ্কিনী হৈলাম, নয়নভরি না চাহিলাম।
স্বজনে পিরীতি করি, একবারে না যায় ছাড়ি;
জনমে জনমে পালে, সঙ্গে থাকে নিদানকালে।
কহে সৈয়দ ছোলতানে, আপনাকে যেই জানে,
ততোধিক আর কেহ নাই।
পৃথিবীতে দুঃখ পায়, যে আছে সম্পদ যায়,
পরিণামে নরকেত ঠাঁই॥

১৮

হের, ওকে এল গো রণে নব জলদবরণী।
ঐ যে ভীষণ আননা রে, লোহিত নয়না,
নবযৌবনা উলাঙ্গিনী।
এলোকেশী, ভালে শোভে অর্দ্ধশশী,
লোলজিহ্বা, বদনেতে অট্টহাসি,
বিকট করালদশনী।
বামা ধরে অসি করে রে, পশিয়ে সমরে,
বিনাশে অসুরে একাকিনী।
রুধির ধারা বহিছে অধরে, কণ্ঠ বিভূষিত শীর্ণ মুণ্ডহারে,
শবারূঢ়া ভয়ঙ্করা ভামিনী।
বিষোদরা যেন কালভুজঙ্গিনী,
বিরাজে ঐ ঘোর বরণী।
ও মা, দেখে লাগে ভয় রে,
হও মা সদয়, দেও মাধবে অভয়, ভয়বারিণি।

(১) "হার" —প্রত্যেক। 'হারগুড়ী' [illegible]।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী, শ্রাবণ। প্রথম প্রবন্ধটি "নিশ্চয়"(?) তাহার উপর ভাষাবিভ্রাট ও ভাববিভ্রাট। কিন্তু সকল প্রবন্ধই এরূপ নহে। "শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান" উল্লেখযোগ্য। এই ভজনস্থান বুড়ন গ্রাম, বেনাপোল হইতে দেড় ক্রোশ উঃ পঃ এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের বনগাঁ ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ উঃ পূঃ। সেই সময়ের তালুকদার রামচন্দ্র খানের বাটী ওখান হইতে এক মাইল মধ্যে। এই রামচন্দ্রই হরিদাসকে ছলিবার জন্য বেশ্যা পাঠাইয়াছিলেন। অবশেষে বেশ্যা বৈষ্ণবী হন, এ কথা সকলেই জানেন। "বিহ্বলা রাধিকা" নগেন্দ্রবালার। পত্রিকার নামে আমাদের এক বাবাজীর নাম মনে পড়িল "রাধানিতম্বাম্বরধূলিধূসর রসিকদাস কৃষ্ণদাস বাবাজী"।

কোহিনুর, "হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশে প্রকাশিত" বৈশাখ। প্রথমেই পরিচালকের আত্মকথা ও বিনীত প্রার্থনায় দেখিলাম "হিন্দুমুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবা কল্পে এবং কলিকাতা অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থ কোহিনুর প্রচারে ব্রতী হইয়াছি।" "কেহ কি বলিতে পারেন, বঙ্গীয় কৃতবিদ্য হিন্দুমুসলমান লেখকগণকে একত্রিত ও সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া(?) কখন কোন পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে? তবে এই নূতন অনুষ্ঠান নহে কি?" বর্ত্তমান মুসলমান লেখকগণের মধ্যে এই নামগুলির উল্লেখ আছে। কবি মোজাম্মেল হক্, কায়কোবাদ, রেয়াজ উদ্দিন আহাম্মদ, সেখ আবদর রহিম, আর প্রবীণ লেখক মীর মোসারফ হোসেন। কোহিনুর পরিচালনের জন্য একটি কমিটিও সংগঠিত হইয়াছে। ১৩০৫ সালের ৭ই শ্রাবণের এডুকেশন গেজেট কোহিনুর সমালোচন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, মতামতের মধ্যে দেখিলাম, "সাধারণতঃ আমাদের ইচ্ছা হয় যে কৃতিলেখকগণ দুই চারিখানি মাসিকপত্রে একযোগে লিখিয়া উহাদিগকেই প্রবল ও সজীব রাখেন। নূতন নূতন ক্ষীণজীবী সাময়িক পত্রের আমরা পক্ষপাতী নহি। এখানির উদ্দেশ্য অপর সাময়িক পত্র হইতে বিভিন্ন এবং আমাদের চক্ষে খুবই মহৎ।" প্রথমে মদন মাষ্টারের যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া চারিটি দল হয়। মহেশ চক্রবর্ত্তী, নবীন গুঁই, গয়ারাম কোঁয়ার, আর একটি। ইহা ছাড়া বউমাষ্টার ত ছিলই। তারপর ঐ পাঁচটি দলের বাদক, জুড়ী-গায়ক

প্রভৃতি একটু পদস্থব্যক্তিরা সকলেই এক একটি দল করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন মদন মাষ্টারের সুর পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা সাময়িক পত্রেরও ঠিক এই ইতিহাস। যিনি যে কোন সাময়িক পত্রে অন্ততঃ একবার মাত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনিই বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী—এইটি আইন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোহিনুরকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা এই কথা গুলি বলিলাম মাত্র। সে যাহাহৌক বর্ত্তমান সংখ্যা কোহিনুর পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে। কায়কোবাদের কবিতা ভাল, তবে সৌখীণ। এই কবিতা পাঠ করিয়া আমাদের স্বর্গীয় অধরলাল সেনকে মনে পড়িয়া গেল। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, বঙ্গে সৌখীণ কবিতা এখন স্থগিত রাখিতে হইবে।

অন্তঃপুর, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় একত্রে এবং শ্রাবণের সংখ্যা। "কেবলমাত্র মহিলাদিগের দ্বারা পরিচালিত"। ত্রিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে বামাবোধিনী যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহা সুন্দর সুঠামবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বৃক্ষটি সুধাবৃক্ষ হইয়াছে কি বিষবৃক্ষ হইয়াছে, তাহা আমরা এখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই। চুল কপ্‌চান, মোজা জুতা পায়, ছাতি মাথায়—ভঙ্গীর আমরা যেমন বিরোধী, কাদম্বিনী বাঘ, পঙ্কজেন্দুবালা মাসচটক বামাসুন্দরী বটব্যালেরও তেমনি বিরোধী। কিন্তু হায় আমাদের অরণ্যে রোদন। "দাসী" "দেবী" এখনও আছেন কিন্তু "অতলস্পর্শের" কিনারায়। বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবীর একখানি প্রতিকৃতি দেখিলাম। প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে গুণপণা আছে। গুণপণা আছে বলিয়াই বলিতেছি যে হিন্দুশাস্ত্রভাণ্ডারে একটু দৃষ্টি রাখিলেই ভাল হয়। প্রবন্ধের জন্য কখনও ভাবিতে হইবে না। কচুও সুখাদ্যে পরিণত হইবে! কচুকে সুখাদ্য করিবার উপায়ও দিয়াছেন। মানকচু, নারিকেল কোরা (কচুর অর্দ্ধভাগ), খাঁটি সরিষার তৈল, সরিষা ও লঙ্কা বাটা, এই ইঙ্গিতই বোধ হয় যথেষ্ট। তবে নিরামিষ আমিষ দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রবন্ধ তুলিয়া দেখাইতে পারিলাম না—স্থানাভাব। মোটের উপর ভাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(ঈশ্বরের রূপ দর্শন।)

একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাই না কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ অবশ্য দেখা যায়, সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপ রূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন করে?

ব্রাহ্মভক্ত। কি উপায়ে দেখা যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য এক ঘটী কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে? যতক্ষণ ছেলে চুসী নিয়ে ভুলে থাকে, ততক্ষণ মা রান্নাবান্না, বাড়ীর কাজ সব করে। কিন্তু ছেলের যখন চুসী আর ভাল লাগে না—চুসী ফেলে চীৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে হুড়্ হুড়্ করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।

ব্রাহ্মভক্ত। মহাশয়, ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানামত কেন? কেউ বলে সাকার, কেউ বলে নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানারূপের কথা শুনিতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ভক্ত যেরূপে দেখে, সে সেইরূপ মনে করে, বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে একবার যদি লাভ করতে পারা যায়, তা হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না,—সব খবর পাবে কেমন করে?

"একটা গল্প শুন। একজন বাহ্যে গিছ্‌লো। সে দেখ্‌লে যে গাছের উপর একটী জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটী সুন্দর লাল রঙ্গের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটী উত্তর কর্‌লে 'আমি যখন বাহ্যে গিছ্‌লাম, আমিও দেখেছি—তা সে লালরঙ্

হতে যাবে কেন! সে যে সবুজ রঙ্।” আর একজন বল্লে, না না আ
দেখেছি হল্‌দে।’ এইরূপে আরও কেউ কেউ বলে, না ধূসরদা, বেগুনী, নী
ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলা গিয়ে দেখে একজন লো
বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে ‘আমি এই গাছতলা
থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি, তোমরা যা যা বল্‌ছ, সব সত্য
—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল, আরও সব কত কি
হয়? আবার কখন দেখি, কোনও রঙ্‌ই নাই?’

“অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদাসর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্‌তে পারে তাঁর
স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানা ভাবে
দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই
জানে যে বহুরূপীর নানা রং—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না।
অন্য লোক কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

“কবীর বল্‌ত, ‘নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা’।

“ভক্ত যে রূপটী ভালবাসেন সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্ত-
বৎসল! পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি সীতারামরূপ ধরে
ছিলেন।

(কালীরূপ ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা।)

“বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ্ টুপ্ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ
সিদ্ধান্ত এই ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ ‘আমি ভক্ত’
এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলিয়া
বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের ‘আমি’ অভিমান তাকে
একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূর বলে।
দূর বলে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও, তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে ধারণা
কর্‌তে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর
বলে। যেমন দীঘির জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে
গিয়া, হাতে করে, জল তুলে দেখ, কোন রঙ্‌ই নাই। আকাশ দূর থেকে
দেখ্‌লে নীলবর্ণ, কাছে দেখ কোন রঙ্ নাই।

“তাই বলছি, বেদান্তবিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মু

যায় না। যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানা-
ও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তি বোধও সত্য।

(অনন্তকে জানা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি পথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ অতি সহজ
পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষজনম
পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

“যদি আমার এক ঘটী জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ
মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ্ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই,
শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার?

(সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান।)

“বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে জ্ঞানপথ—বড়
কঠিন পথ। বিষয় বুদ্ধির—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেস মাত্র থাকলে সে
জ্ঞান হয় না, এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

“এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির (planes) কথা আছে। এই সাতভূমি
মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের
স্থান। মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না, কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে।
মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে
জ্যোতিদর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতি দেখে অবাক্ হয়ে, বলে
‘একি! একি!’। তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

“মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। মন যখন কণ্ঠে উঠেছে, তখন অবিদ্যা অজ্ঞান
সব দূরে গিয়েছে, তখন ঐশ্বরিক কথা বই অন্য কোন কথা শুন্‌তে বা বল্‌তে
ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, তা হলে সে ব্যক্তি সেখান
থেকে উঠে যায়।

“মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ
দর্শন হয়। তখনও একটু ‘আমি’ থাকে। সে ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ
দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু
পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, সেই আলো
ছুঁলাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না।

“শিরোদ্দেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর

ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর থাকে না। সর্ব্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই সপ্তমভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

"এই কঠিন ব্রহ্মজ্ঞানীর পথ তোমাদের নয়। তোমাদের ভক্তিপথ এ খুব ভাল আর সহজ।

(সমাধি ও কর্ম্মত্যাগ।)

"আমায় এক জন বলেছিল, মহাশয় আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? (সকলের হাস্য)।

"সমাধি হলে সব কর্ম্মত্যাগ হয়ে যায়। পূজা জপাদি কর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্ম্মের বড় হৈ চৈ থাকে। তারপর যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে, ততই কর্ম্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম গুণ গান পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। (শিবনাথের প্রতি) যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, ততক্ষণ তোমার নাম গুণ কথা অনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, 'এই যে শিবনাথ বাবু এসেছেন' আর তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হয়ে যায়।

"আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গলে গলে পড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, দাদা আমার একি হল! হলধারী বল্‌লে, একে গলিত হস্ত বলে—ঈশ্বরের দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম্ম থাকেনা।

"সঙ্কীর্ত্তনে প্রথমে বলে, 'নিতাই আমার মাতাহাতী', 'নিতাই আমার মাতাহাতী'। ভাব গাঢ় হলে শুধু বলে "হাতী হাতী।" তারপর কেবল 'হাতী' এই কথাই মুখে থাকে। শেষে 'হা' বল্‌তে বল্‌তে ভাব সমাধি হয়। তখন যে ব্যক্তি এতক্ষণ কীর্ত্তন কর্‌ছিল, সে চুপ হয়ে যায়।

"যেমন ব্রাহ্মণভোজন। প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাত সুমুখে করে বস্‌ল, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল 'লুচি আন' 'লুচি আন' শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে গেছে। যখন দই এল, তখন সুপ্‌ সুপ্‌ (সকলের হাস্য)—শব্দ নাই বল্‌লেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ।

"তাই বল্‌ছি প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে, ততই কর্ম্ম কম্‌বে। শেষে কর্ম্মত্যাগ আর সমাধি।

"গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম্ম কমিয়ে দেয়, দশ মাসে কর্ম্ম প্রায় কর্‌তে হয় না। ছেলে হলে একেবারে কর্ম্মত্যাগ। ছেলেটী নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে।

(সমাধিস্থ মহাপুরুষ ও লোকশিক্ষা প্রদান।)

"সমাধিস্থ হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। ক'ার ক'ার লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে, যেমন নারদাদির। আর চৈতন্য দেবের মত অবতারদের। "কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে কেহ কেহ ঝুড়ি কোদাল বিদায় করে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে যদি পাড়ার কারু দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হল। স্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোৎ বল্লে মুৎবে না, পাছে তোমার উপকার হয়! (সকলের হাস্য) দু পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আন্‌তে দিলে চুসে চুসে এনে দেয়। (সকলের হাস্য)।

কিন্তু শক্তিবিশেষ। সমান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী এসে বস্‌লে ডুবে যায়। কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

(ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা পদ্ধতি ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথাদির প্রতি)। হ্যাগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ঐ কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে (কালী বাড়ীতে) গিছ্‌ল, আমি বল্লাম, তোমরা কি রকম lecture দাও, আমি দেখবো। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হল, আর কেশব বল্‌তে লাগ্‌ল। বেশ বল্লে, আমার ভাব হয়ে গিছ্‌ল। পরে কেশবকে আমি বল্লুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?—'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ' এই সুর। যারা নিজে ঐশ্বর্য্য ভালবাসে, তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা কর্‌তে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরী গেল, সেজ বাবু (রাসমণির জামাই)

রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বল্‌তে লাগ্‌ল 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গায়ের গয়না রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না।'

"আমি সেজ বাবুকে বল্লুম্, 'ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যার দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারি একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটীর ড্যালা। ছি! অমন হীনবুদ্ধির কথা বল্‌তে নাই, তুমি কি ঐশ্বর্য্য তাঁকে দিতে পরে?' তাই বলি, যাকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাকেই লোকে চায়, তার বাড়ী কোথায়, কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত ধন জন দাস দাসী, এর খবরে কাজ কি? নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ)কে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ী, তার বাবা কি করে, তার কটী ভাই, এসব কথা এক দিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্য্য রসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য্য! অত খপরে আমাদের কাজ কি!'

আবার সেই গন্ধর্ব্ব-নিন্দিত কণ্ঠে সেই মাধুরিমাপূর্ণ গান।

ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতুল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতী, জ্বলবে সদা অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার
সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

(ভক্তি ও লীলা)

"তবে তাঁকে দর্শনের পর ভক্তের ইচ্ছা হয় যে, তাঁর লীলা কিছু দেখি। যখন রামচন্দ্র রাবণ বধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ কল্লেন, তখন বুড়ী নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মণ বল্লেন 'রাম, একি বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ী, আর অত পুত্রশোক পেয়েছে, তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে! রামচন্দ্র নিকষাকে অভয়দান করে, সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে, নিকষা বল্লে, রাম এত দিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত লীলা দেখ্‌লাম, তাই আরও বাঁচ্‌বার সাধ আছে, যে তা হলে তোমার আরো কত লীলা দেখ্‌বো (সকলের হাস্য)।

(শিবনাথের প্রতি) "তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে শুদ্ধাত্মাদের না দেখ্‌লে কি নিয়ে থাক্‌ব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্ব্বজন্মের বন্ধু বলে বোধ হয়।

(জন্মান্তর।)

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, মহাশয় আপনি জন্মান্তর মানেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য্য আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝ্‌ব? অনেকে বলে গেছেন, তাই অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না। ভীষ্মদেব যখন দেহ ত্যাগ কর্‌বেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখ্‌লেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌ছে! অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, ভাই কি আশ্চর্য্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, যিনি অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদ্‌লেন! শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ কথা বলাতে তিনি বল্লেন, "কৃষ্ণ তুমি বেশ জান আমি সে জন্য কাঁদ্‌ছি না। আমি যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের তুমি—স্বয়ং ভগবান নিজে সারথী, তাদেরও দুঃখের বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে করে কাঁদ্‌ছি যে, ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

সমাজগৃহে এইবার সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। এতক্ষণে প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটা হইয়াছে। সন্ধ্যার চার পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইল। উদ্যানের বৃক্ষরাজি লতাপল্লব সব শরচ্চন্দ্রের বিমল কিরণে যেন ভাসিতে লাগিল। এদিকে সমাজগৃহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন—ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিল। সকলেই ভাবে মত্ত যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতে লাগিল। চারিদিকে গ্রামবাসীরা হরিনাম শুনিতে পাইল, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী ভক্ত শ্রীযুক্ত বেণীমাধবকে কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল!

কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'ভাগবতভক্তভগবান', জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, স্বাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম,

ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম। বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আয়োজন করিয়াছিলেন ও সমবেত সকল ভক্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাঠক মহাশয় এইখানে একবার সেই যোগিনী তন্ত্রের উদ্ধৃত শ্লোক গুলির বিচার করুন। মন্ত্রময় বর্ণ সকল জীবের অস্তিত্বে প্রমাণ স্বরূপ ইহা দেখান হইয়াছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বর্ণের বিভাগ নির্দ্দেশকালে কণ্ঠ্য তালব্য মূর্দ্ধন্য প্রভৃতি বিশেষণভেদে তাহার যে ব্যবহার হয় তাহাও কেবল উচ্চারণ স্থান লইয়া—উৎপত্তি স্থান লইয়া নহে। যেমন কণ্ঠ হইতে যাহার উচ্চারণ হয় তাহার নাম কণ্ঠ্য, তালু হইতে তালব্য ইত্যাদি। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি উচ্চারণের অর্থ উৎ + চারণ, অধোবিচরণশীল বর্ণ সকলকে ঊর্দ্ধে বিচরণ করান, সেই ঊর্দ্ধে বিচরণ যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষরূপে বহিঃপ্রকাশ, তখন অধোবিচরণে যে অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয়রূপে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অন্তঃপ্রকাশ আছে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। সেই গূঢ় সত্যই শাস্ত্রে পরিস্ফুটরূপে কথিত হইয়াছে।

অবৈশদ্যান্মুখস্রোতো মার্গস্যাবিশদাক্ষরং
অপ্যব্যক্তং প্রলপতি যদা সা কুণ্ডলী তদা।
মূলাধারে বিধ্বনতি সুষুম্নাং বেষ্টতে মুহুঃ॥ —প্রপঞ্চসার।

মুখস্থিত বাক্ প্রবাহের পথের অপরিষ্কার হেতু শিশু যে সময়ে অব্যক্ত এবং অস্পষ্ট ধ্বনি করে, মূলাধার কুহরবিলাসিনী কুলকুণ্ডলিনী তখন অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া বারংবার সুষুম্নাকে বেষ্টন করিয়া থাকেন—তাঁহার সেই অব্যক্ত ধ্বনির প্রতিধ্বনিই শিশুর কণ্ঠকুহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে।

সোঽন্তরাত্মা তদা দেবি! নাদাত্মা নদতে স্বয়ং।
যথা সংস্থান ভেদেন সম্ভূয় বর্ণতাং গতঃ॥ —যোগসার।

অর্থাৎ দেবি! তৎকালে নাদময় অন্তরাত্মা (কুলকুণ্ডলিনী) স্বয়ং নাদ করিতে থাকেন, তাঁহার সেই নাদ সমূহই সম্মিলিত হইয়া পরে বর্ণরূপে প্রতিভাত হয়।

চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দ ব্রহ্মেতি মে মতং
তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিণাং দেহমধ্যগং
বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্য পদ্যাদি ভেদতঃ॥ —সারদাতিলক।

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম, সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে অবস্থিত ইহাই আমার মত, সেই চৈতন্যময় শব্দব্রহ্মই কুণ্ডলিনীরূপ অবলম্বনে প্রাণিগণের দেহমধ্যগত হইয়া পুনর্ব্বার কণ্ঠ তালু দন্ত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে বায়ুভরে সঞ্চারিত হইয়া গদ্য পদ্যাদি ভেদে বর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েন।

শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবঃ সদাশিবঃ
অনাহতেষু চক্রেষু য শব্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ —বিশ্বসারতন্ত্র।

স্বয়ং সদাশিব তাঁহাকেই শব্দব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, অনাহত চক্রে সেই শব্দ অধিষ্ঠিত।

পরানন্দময়ং ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম বিভূষিতং
আত্মনো দেহমধ্যেতু সর্ব্ব মন্ত্রাত্মকং প্রিয়ে॥ —বিশ্বসারতন্ত্র।

জীবের আত্মদেহমধ্যেই আনন্দময় পরব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্ম বিভূষিত এবং সর্ব্বমন্ত্রাত্মক স্বরূপে অধিষ্ঠিত।

মন্ত্র সকল শব্দব্রহ্ম স্বরূপিনী চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনীরই স্বরূপ বিভূতি সুতরাং কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান হইতে তাহার উচ্চারণ (বহিঃ প্রকাশ) হয় বলিয়াই শব্দ বা মন্ত্র কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা নহে। ব্রহ্মরূপ শব্দের বস্তুতঃ উৎপত্তি না থাকিলেও মূলাধারই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব। আমরা যাহাকে শব্দ বা বর্ণ বলিয়া বুঝি তিনিই স্বয়ং জীবের সঞ্জীবনী শক্তি। শক্তিময় মন্ত্র সকল জীবের অস্তিত্বে নিত্য প্রমাণ। ব্রহ্মতেজঃ পরং হিতং, মন্ত্র সকল পরব্রহ্মতেজ স্বরূপ। দার্শনিক মতে শব্দ আকাশের গুণ। তন্ত্রমতে ইহা অতি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বভেদী প্রত্যক্ষপক্ষপাতী তন্ত্রের মতে শব্দ ব্রহ্মাণ্ডের জনক ভিন্ন কাহারও জন্য নহে। আকাশ হইতে শব্দের যে উদ্গম হয় তাহা বহিঃপ্রকাশ মাত্র বস্তুতঃ শব্দ নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ

অকারাদি ক্ষকারান্তা মাতৃকা বীজরূপিণী,
বিসর্গশ্চৈব বিন্দুশ্চ দ্বিসন্ধি ব্রহ্মবিগ্রহা।
" বর্ণাত্তু জায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুপ্রজাপতিঃ।
" রুদ্রশ্চ জায়তে দেবি! জগৎ সংহারকারকঃ॥ কামধেনুতন্ত্র।

অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী মাতৃকাশক্তিই এই নিখিল চরাচরের

বীজরূপিণী, তন্মধ্যে আবার বিসর্গশক্তি বিন্দু পুরুষ এবং উভয়ের সংযোগে প্রকৃতি পুরুষাত্মক অজপা মন্ত্রে অভিন্ন পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপিণী। দেবি! মন্ত্রময় হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং জগৎসংহারকারক রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন।

অকারাদি ক্ষকারান্তা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
সর্ব্বং চরাচরং বিশ্বং বর্ণাত্মা সূয়তে ধ্রুবং॥ —কামধেনু তন্ত্র।

অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী পরমা কুলকুণ্ডলিনী স্বয়ং এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন, ইহা ধ্রুবসত্য।

বেদানামীশ্বরঃ কর্ত্তা পুরাণানাং মহর্ষয়ঃ।
যন্নাম্ন্যাঃ শ্রূয়তে কর্ত্তা সয়ম্ভূ মাতৃকা ততঃ॥ —মাতৃকোদয়।

বেদের কর্ত্তা ঈশ্বর, পুরাণের কর্ত্তা মহর্ষিগণ, কিন্তু ইহাদের কেহ কর্ত্তা আছেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে অশ্রুতবার্ত্তা, অতএব বর্ণরূপিণী মাতৃকা দেবী কাহারও সৃষ্ট নহেন, স্বয়ম্ভূ।

এই জন্য বর্ণময়ী মন্ত্রদেবতা কুলকুণ্ডলিনীর নামান্তর "মাতৃকা"। অর্থাৎ তিনি এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জননিত্রী তাঁহার জনকজননী অসম্ভব, তাই তাঁহার নাম কেবল "মাতৃকা"। তিনি সকলেরই মা ভিন্ন কাহারও সন্তান নহেন।

বায়ুর ঘাতপ্রতিঘাতে আকাশমণ্ডলে যেমন শব্দতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, জীবের দেহমধ্যস্থ আকাশেও তদ্রূপ প্রাণবায়ুর ঘাতপ্রতিঘাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রবেশে ও নির্গমে শব্দের স্রোত প্রবাহিত হয়। যদি মূলতঃ নিত্য এবং স্বতন্ত্ররূপে আকাশে শব্দ সূক্ষ্মরূপে অন্তর্নিহিত না থাকে, তবে এ স্থূলরূপের অভিব্যক্তি অসম্ভব।

মহাদেব স্বয়ং বলিতেছেন, দেবীর নিত্যদেহে বর্ণরূপে মন্ত্র সকলও নিত্য ব্রহ্মরূপ তেজঃপুঞ্জ এবং তাঁহারই স্বরূপ। 'ফলরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপ মন্ত্র সকল তাঁহারই দেহক্ষেত্রে নিত্য বিরাজিত, তাহারই নাম জগতে বীজমন্ত্র। এ মন্ত্র, মন্ত্রের বীজ, যন্ত্রের বীজ, তন্ত্রের বীজ, দেবতার বীজ, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহারের বীজ, জীবের জীবনধারণের বীজ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের সিদ্ধি ও সাধনার বীজ, আকাশে যে শব্দের অঙ্কুরোদ্গম হয় তাহারও পূর্ব্বাতিপূর্ব্বকালীন চিরন্তন নিত্যবীজ। সংসারসাগরের পারপ্রান্তে, ব্রহ্মাণ্ডকটাহের বহিঃপ্রদেশে, সুরাসুরকিন্নরনর জীবজগতের, মনোবুদ্ধির অগোচরে, চরাচর গুরুর ত্রিলোচনগোচরে সেই অবাঙ্মনসগোচরা ব্রহ্মময়ী

কলেবরে যদি এই শব্দব্রহ্ম মণিমাণিক্য মন্ত্ররূপে নিত্য দেদীপ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে কি আজ অবকাশমাত্র সম্বল আকাশের বক্ষঃ ভেদ করিয়া শব্দের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় উৎস দিগদিগন্ত আলোকিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় বিকীর্ণ হইয়া পড়িত? শব্দের যাহা যাহা সূক্ষ্ম সূত্র, তাহা সেই অতলস্পর্শ অনন্তগভীর তত্ত্বসাগরের গম্ভীর গর্ভেই নিত্য নিগূঢ়। কাহারও সাধ্য নাই যে তিনি ভিন্ন তাহা প্রকাশ করিতে পারে। তবে যাঁহার জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সাধন সম্পত্তির ফলোন্মুখ হয় তিনিই সে ফলের অমৃতরস আস্বাদনে চরিতার্থ হইয়া—মন্ত্রের সেই জলন্ত জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি দেখিয়া আত্ম অস্তিত্ব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করেন।

ধ্বনি ও বর্ণ ভেদে শব্দ দ্বিবিধ। অকারাদি ক্ষকারান্ত অক্ষরমালায় যাহা অভিব্যক্ত তাহারই নাম "বর্ণ", আর যাহাতে অক্ষর মাত্রা অভিব্যক্ত হয় না, তাহারই নাম "ধ্বনি"। শব্দের এই দ্বিবিধ অবস্থার কারণ কেবল স্বরভেদ। শাব্দিক পণ্ডিতগণ স্বরের এই মাত্রা ভেদেই শব্দকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ ধ্বনি বা বর্ণভেদে স্বরূপতঃ শব্দের কোন ভেদ হয় না। মূলতঃ ধ্বনিই পদার্থ, শব্দ তাহার পরিণাম মাত্র। এই ধ্বনিই জীবের চৈতন্যময়ী সঞ্জীবনী শক্তির অসাধারণ সূক্ষ্ম স্বরূপ। ধ্বনিরূপেই জীবদেহে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব। লোক রাজ্যে অধর্ম্ম নিরাকরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপনে ভূভার হরণ জন্য ভগবান্ যেমন রামকৃষ্ণাদি রূপে অবতীর্ণ, ধর্ম্মরাজ্যেও তিনি তদ্রূপ যোগবিঘ্ন-নিরাকরণ পূর্ব্বক সমাধির অবলম্বনে বা তত্ত্বজ্ঞানে, অবিদ্যাবন্ধনচ্ছেদন জন্য শব্দব্রহ্ম শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ। রামকৃষ্ণাদির মূলস্বরূপ যেমন বৈকুণ্ঠে বা গোলকধামস্থিত চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজ শ্যামসুন্দরাদি মূর্ত্তি, শব্দব্রহ্ম শাস্ত্রেরও তদ্রূপ মূলস্বরূপ, চিন্ময়ীর চিন্ময় শ্যামসুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রতিলাবণ্যলহরীর তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় মন্ত্রমূর্ত্তি। ফলরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রারম্ভে সেই মন্ত্রময় জ্যোতিঃকলিকা বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দলদলে চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করেন এবং তাঁহারই সচ্চিদানন্দ মকরন্দের সৌরভভরে ত্রিভুবন আমোদিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে জীবদেহে অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন দেখা যাউক—

ষাণ্মাসিকেপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রাঙ্কঢ়ান্যতঃ পুরা।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, ষণ্মাসকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই জীবের হৃদয়ে ভ্রান্তির উদয় হয়, এজন্য বিধাতা কর্ত্তৃক অক্ষর সমস্ত সৃষ্ট এবং লিপিবিন্যাস-ক্রমে পত্রে আরোপিত হইয়াছে। সাধকগণ বুঝিবেন বিধাতা কর্ত্তৃক বেদও যেমন সৃষ্ট, অক্ষরও তদ্রূপ সৃষ্ট। মহেশ্বর মহেশ্বরীর হৃদয়াম্বুজে যেমন বর্ণ-পুঞ্জের যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, বিধাতা তদনুরূপেই লিপিবিন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কামধেনু প্রভৃতি তন্ত্রে অকারাদি বর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধক তাহাতেই এ তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে লক্ষ্য করিবেন। অক্ষর মালার বিন্দু, মাত্রা, রেখা, প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শক্তি সূর্য্য গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ ঐ সমস্ত রেখাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ফলতঃ লোক ব্যবহারে আমরা যে লিপিবিন্যাস প্রক্রিয়াকে (লেখাকে) অক্ষর বলিয়া জানি তাহা কেবল ঐ অ-ক্ষর ব্রহ্মের যন্ত্র বই আর কিছুই নহে। সাধনাক্ষেত্রে মৃণ্ময় পাষাণময় মূর্ত্তিকে যেমন দেবতাস্বরূপে ব্যবহার করা হয়, লেখার অধিকারে রেখাময় মন্ত্র সকলকেও তদ্রূপ অক্ষর বলিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধকের সাধনা প্রভাবে মন্ত্রশক্তি জাগরিত হইলে প্রতিমার ন্যায় তেজোময় রেখা মূর্ত্তির অভ্যন্তরে প্রত্যেক রেখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তখন রেখামূর্ত্তি ভেদ করিয়া নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দর্শন দেন। তৎপর মন্ত্রসিদ্ধ হইলে সমষ্টি মন্ত্রের অধীশ্বরী সচ্চিদানন্দময়ী উপাস্য দেবতা স্বয়ং স্ব স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের অভ্যুদয়ে যামিনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া অরুণের প্রখর রশ্মি যেমন দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়া আকাশ এবং পৃথিবীমণ্ডল আলোকিত করে এবং তাহারই অব্যবহিত পরে ধীরে ধীরে উদয়াচলশিখরসীমা সুরঞ্জিত করিয়া প্রতপ্ত কাঞ্চনচ্ছবি রবিমণ্ডল যেমন লোকলোচন গোচরে আবির্ভূত হয়েন এবং সন্ধ্যাবন্দন সমাহিত হৃদয় যোগীন্দ্রপুরুষগণ যেমন সেই তেজোমণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রফুল্লরক্তকমলসমাসীন রক্তাঙ্গরাগ শুভ্র সুন্দর সূর্য্যদেবকে প্রত্যহ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মময়ীর কৃপারূপ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের অভ্যুদয়েও তদ্রূপ অবিদ্যা কালরাত্রির মোহান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া মন্ত্রের তীব্র তেজ সাধকের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমদেবতার প্রেমে পুলকিত করিয়া তুলে। এই অবস্থার পরে পরেই সাধকের সহস্রার কমলদলে মন্ত্রমণ্ডলে যে দেবীগণ দলে দলে অপ্রার্থিতরূপে দর্শন প্রদান করেন। এইরূপে বিভূতিবর্গের

পূর্ণপ্রকাশের পর পূর্ণব্রহ্মসনাতনী তখন সেই দেবমণ্ডলীমণ্ডিত তেজোমণ্ডলের অভ্যন্তরে সাধকের ধ্যেয়মূর্ত্তি অবলম্বনে স্ব স্বরূপের প্রকাশ করেন। সাধক কৈবল্যময়ীর সেই কৈবল্যময় ভাবসাগরে মনপ্রাণ নিমজ্জিত করিয়া অগাধ শান্তির অন্তস্থলে চৈতন্যশয্যায় শয়ন করিয়া প্রগাঢ় আনন্দনিদ্রার উপভোগ করেন ইহাই অক্ষরের অক্ষর স্বরূপ। ফলতঃ প্রতিমাস্থ বা যন্ত্রস্থ দেবতা আর অঙ্কস্থ অক্ষর বা মন্ত্র একই বস্তু। সাধকের সাধনা প্রভাবে তাহাতে দেবতার আবির্ভাব এবং অভাবে তিরোভাব হয় এই মাত্র। মন্ত্রবর্ণে নাদ বিন্দুস্বর ব্যঞ্জনের যে সকল সম্বন্ধ, তাহাও মূর্ত্তিভেদে দেবতার স্বরূপের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। মন্ত্রজ্ঞ সাধকবর্গ অবশ্যই তাহা অবগত আছেন। নিতান্ত গুরুগম্য বলিয়া আমরা সাধারণতঃ সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। কোন কোন বর্ণে দেবতার কোন কোন স্বরূপ বা বিভূতি অধিষ্ঠিত, সামুদায়িক মন্ত্র ব্যতিরেকে কোন খণ্ডিত বর্ণে সেই পূর্ণ শক্তির প্রকাশ নাই। এজন্য যে কোন শব্দ বা বর্ণ মন্ত্র হইতে পারে না। লীলাময়ী দেবতা যে মন্ত্রে নিজের যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মন্ত্রই সেই স্বরূপের প্রকাশক, তাই সেই মন্ত্র তাঁহার সেই স্বরূপের নিজ মন্ত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। এই জন্যই সর্ব্বমন্ত্র-সিদ্ধিগুরু ভগবান্ ভূতভাবন ভগবতীকে বলিয়াছেন,

যদ্দেবো জায়তে বীজস্তস্য মূর্ত্তির্ভবেদ্ধ্রুবং।
দেবতায়াঃ শরীরং হি বীজাদুৎপদ্যতে প্রিয়ে॥

যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী যে দেবতা, সেই বীজ হইতে সেই দেবতার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইবেন, ইহা নিশ্চিত, যেহেতু দেবতার শরীর কেবল বীজমন্ত্র হইতেই উৎপন্ন হয়।

যস্য দেবস্য যদ্‌বীজং প্রফুল্লা কলিকা তথা
ধ্যাত্বা দেবীং যথাশক্ত্যা তস্মাদাবির্ভবেৎ স্বয়ং।
শক্তি র্বা বিষ্ণুদেবোবা শিবো বা সূর্য্য এব বা।
বীজাদুৎপ্যতে দেবি পরং ব্রহ্ম নিরঞ্জনং॥
বীজধ্যানং বিনা দেবি! কথমুৎপদ্যতে হরিঃ।
সদাশিবো মহাদেবঃ কথমুৎপদ্যতে স্বয়ং॥
সদাশিবস্য জননী বীজরূপা সনাতনী। —কামধেনুতন্ত্র।

যে দেবতার যে বীজ এবং প্রফুল্লা ও কালিকা [মন্ত্রশক্তি বিশেষ] দেবীকে

তদনুসারে যথাশক্তি ধ্যান করিলে সেই বীজমন্ত্র হইতেই শক্তি বিষ্ণু শিব সূর্য্য গণেশ প্রভৃতি দেবগণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন। বীজ হইতেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মের প্রকাশ, বীজধ্যান ব্যতিরেকে কিরূপে সদাশিব বা হরি সাধকের হৃদয়ে উৎপন্ন হইবেন? যেহেতু বীজরূপিণী সনাতনী সদাশিবেরও জননী। সাধকের সাধনালতার যাহা কিছু সিদ্ধিফল, সমস্তই এই বীজরূপিণী মহামন্ত্রশক্তির প্রতি নির্ভর করে, তাই দেশ কাল পাত্র ভেদে সেই বীজ বপনের বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাশি নক্ষত্র গ্রহ যোগ ইত্যাদি যে সকল দেবতা সাধকের শরীরক্ষেত্রে অন্তশ্চারিণী শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই সকল শক্তির গুণানুসারে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ প্রক্রিয়ায় কোন্ বীজ বপন করিলে শীঘ্র সুফল ফলিবে, তাহারই নির্দ্দেশস্বরূপ মন্ত্রবিচার মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে।

সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোরিঃ ক্রমাজ্ জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ॥
সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি।

বিচক্ষণগণ চক্রবিচারক্রমে মন্ত্রকে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ এবং অরি এই চতুর্বিধ ভেদে অবগত হইবেন। তন্মধ্যে সিদ্ধমন্ত্র যথাবিধি সাধিত হইলে যথাকালে (যে মন্ত্র সিদ্ধির জন্য যতকালের অপেক্ষা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে) সিদ্ধ হইবে। সাধ্যমন্ত্র, জপ এবং হোম উভয়ের দ্বারা সিদ্ধ হইবে। সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই সিদ্ধ হইবে (কিন্তু সাধকের সাধনা অনুসারে ফলের অভিব্যক্তি হইবে)। রিপুমন্ত্র সিদ্ধির মূলোচ্ছেদন করিবেন।

সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যার্ণাঃ সেবকাঃ স্মৃতাঃ।
সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়া শত্রবোঘাতকাঃ স্মৃতাঃ॥
জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সেবকোঽধিক সেবয়া।
পুষ্ণাতি পোষকোঽভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্ধ্রুবং॥

সিদ্ধ মন্ত্র সকলকে বান্ধব, সাধ্য মন্ত্র সকলকে সেবক, সুসিদ্ধ মন্ত্র সকলকে পোষক এবং শত্রু মন্ত্র সকলকে ঘাতক বলিয়া জানিবে। বন্ধুমন্ত্র যথাশাস্ত্র জপ দ্বারা সিদ্ধ হয়, সাধ্যমন্ত্র অধিক সেবায় সিদ্ধ হয়, পোষকমন্ত্র অধিক সেবা ব্যতিরেকে ও অভীষ্ট প্রদান করে এবং ঘাতকমন্ত্র নিশ্চয় সাধকের বিনাশ সাধন করে।

ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কোন কোন বিশেষ বিষয়ে মন্ত্রবিচার নাই এবং তাহার তত্ত্ব গুরুগম্য।

এ স্থলে সাধকবর্গের বিশেষ অনুধাবনের বিষয় এই যে পূজা পাঠ স্তব হোম ধ্যান ধারণা সমাধি ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার উপাসনা আর নিজ দীক্ষামন্ত্রের অবলম্বনে সিদ্ধি ও সাধনার উদ্দেশ্য এক হইলেও প্রক্রিয়া এক নহে। পূজা পাঠ স্তব ইত্যাদি দ্বারা সাধক দশ বৎসরে যে ফল লাভ করিবেন, উৎকট সাধনার প্রক্রিয়া প্রভাবে এক বৎসরে এক মাসে এক সপ্তাহে এমন কি এক দিনে ও মন্ত্রবলে সে ফল সিদ্ধ হইবে, কারণ পূজা স্তব ধ্যান ধারণা ইত্যাদি স্থলে কেবল সাধকের সাধনাশক্তির দ্বারা কার্য্য হইবে, আর মন্ত্র সাধনস্থলে সাধনাশক্তি, মন্ত্রশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন। দেশ কাল পাত্র অনুসারে সাধকের সাধনাশক্তি অনেক স্থলে অঙ্গহীন এবং কুণ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে কিন্তু মন্ত্রশক্তির অব্যাহত প্রভাব কোথাও কুণ্ঠিত হইবার নহে। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মন্ত্রের সর্ব্বত্র সমান অধিকার। সাধকের কামনা সাধু হোক আর অসাধু হোক মন্ত্রশক্তি তাহা বিচার করিবেন না। দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিলে অগ্নি যেমন তাহা সাদরে আত্মসাৎ করিবেন, আবার অপরের সর্ব্বনাশ কামনায় তাহার গৃহে অগ্নি জ্বালিয়া দিলেও তিনি যেমন সাদরে তাহা ভস্মসাৎ করিবেন, তদ্রূপ নিজের হোক বা অন্যের হোক মঙ্গল বা অমঙ্গল, যে কোন কামনায় হোক, সাধিত হইলেই মন্ত্রশক্তি সে কার্য্য সিদ্ধ করিবেন। তাহার জন্য স্বর্গ নরক যাহা ভোগ করিতে হয়, সাধক করিবেন, অগ্নির ন্যায় নিজ সর্ব্বদাহিকা এবং সর্ব্বপ্রকাশিকা শক্তির বিস্তার করিয়াই মন্ত্রশক্তি ক্ষান্ত হইবেন। সাধকের আত্মশক্তি বায়ু স্থানীয় এবং মন্ত্রশক্তি অগ্নিস্থানীয় এজন্য সাধকের আত্মশক্তি ক্ষীণ হইলেও মন্ত্রের দৈবশক্তি নিমেষ মধ্যে তাহা বিপুল করিয়া তুলিতে পারে।

আগ্নেয় তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে নভোমণ্ডলে যেমন বায়ুতরঙ্গে ঘনবেগ প্রবাহিত হয়, আবার সেই বেগশালী বায়ুতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া অগ্নিমণ্ডল যেমন দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়, তদ্রূপ মন্ত্রশক্তির ঘাত প্রতিঘাতেও সাধকের আত্মশক্তি তীব্রবেগে সম্বর্দ্ধিত হয়। তখন সেই বেগময়ী আত্মশক্তিই মন্ত্রশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাকে দ্বিগুণ সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। অগ্নি

যেমন কণিকামাত্র বায়ুকে দ্বার করিয়াই সূক্ষ্মরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া জড়ীভূত বায়ুস্তরকে বিক্ষুব্ধ এবং সহচর করিয়া নিজ প্রভায় ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিয়া নভোমণ্ডল ভেদ করিতে থাকেন, মন্ত্রশক্তিও তদ্রূপ সাধকের কণিকা মাত্র আত্মশক্তিকে দ্বার করিয়া সূক্ষ্মরূপে অবির্ভূত হইয়া সাধকের সেই জড় প্রায় আত্মশক্তিকে সঙ্কুচিত ও সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাহারই বেগে আত্মবিস্তার করিয়া এবং পরিশেষে সেই সাধকশক্তিকে সঙ্গে করিয়াই জীবহৃদয়-আলোকিত করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া দেন। মন্ত্রের এই অদ্ভুত প্রভাব আছে বলিয়াই অসাধ্যসাধন জীবের পক্ষে অসম্ভব নহে—নতুবা কি, জীব হইয়া শিবারাধ্য সাধ্যধনে কেহ কখনও আশা করিতে পারিত? জীবের এমন আত্মশক্তি কি আছে, যাহার বলে মন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে সে জৈবী শক্তিকে পরাভূত করিয়া দৈবীশক্তিতে পরিণত হইতে পারে? সংসারের বিশাল প্রান্তরে সিদ্ধির বিলম্ব-অন্ধকারে একমাত্র মন্ত্রই ক্ষয়োদয় রহিত চির শারদপূর্ণ চন্দ্র। জগদম্বার অপার করুণাই এ চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধবিমলোজ্জ্বল কিরণমালা, সাধু সাধক ভক্ত সাধিকাই তাহার একমাত্র চিরপিপাসু চকোর চকোরী। তাঁহারা জ্ঞান কর্ম্ম উভয় পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সংসারভূভাগ অতিক্রম করিয়া সাধনার বিস্তীর্ণগগণমণ্ডলে সর্ব্বোচ্চ কক্ষে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে সে সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাই সদানন্দ আনন্দময়ীকে বলিয়াছেন, "চকোরা এব জানন্তি নান্যে চন্দ্ররুচাং রুচিম্"।

মন্ত্র সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত আর কোন তত্ত্বই সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে। তন্ত্রশাস্ত্র বিলাসীর প্রমোদকানন নহে, ইহা চরাচরগুরু যোগীন্দ্রচূড়ামণির যোগসিদ্ধ তপোবন। কাহার সাধ্য তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে এই তেজঃপুঞ্জ বনকুঞ্জের একটি পত্র পুষ্প স্পর্শ করিতে পারে? নিজ ভুজবীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত যিনি এ বনে প্রবেশ করিবেন, অগ্নিমণ্ডলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায়, মরণোন্মুখ কন্দর্পের ন্যায়, তাঁহাকেই সংহারনাথের মহারুদ্রতেজে ভস্মীভূত হইতে হইবে। তাই আমরা এই পর্য্যন্ত আসিয়াই সভয়ে পশ্চাৎপদ।

ভরসা করি পাঠক মহাশয় এখন বুঝিতে পারিবেন, মূক কেন অক্ষর "উচ্চারণ" করিতে পারে না। বিধাতা যাহার অন্তরে অক্ষর দেন নাই সে কেমন করিয়া অক্ষর উচ্চারণ করিবে? বিধাতা দেন না কেন? সে

কর্ম্মফলের কথা। অপরাপর কারণের মধ্যে যাহারা পশু হইতে মানবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ঐরূপ হতভাগ্য, তাহাদের অক্ষর উচ্চারণ হয় না বা বাক্‌শক্তি নাই। পশুরা যে লোষ্ট্রসমতুল্য নহে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বিশেষতঃ প্রাণীতত্ত্ব আলোচনাকারী পণ্ডিতগণও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বিসপ ওয়েলডন্ তাঁহার আত্মার-অমরত্বপুস্তিকায় প্রমাণ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পশুদিগেরও আত্মা আছে এবং তাহা অমর। হিন্দু বলেন পশু হইতে মনুষ্যত্ব হয়—

স্থাবরা স্ত্রিংশলক্ষশ্চ জলজো নবলক্ষকঃ
কৃমিজা দশলক্ষশ্চ রুদ্র লক্ষশ্চ পক্ষিণঃ
পশবো বিংশলক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥ —কর্ম্মবিপাক।

ত্রিংশলক্ষ স্থাবর, নবলক্ষ জলজ, দশলক্ষ কৃমিজ, একাদশলক্ষ পক্ষী, বিংশলক্ষ পশু, চতুর্লক্ষ মানব এই চতুরশীতিলক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া তবে জীব দ্বিজত্ব লাভ করে।

পাঠক মহাশয় এখন আরও বুঝিতে পারিবেন, সেকেলে হিন্দুরা কেন সকল অক্ষরের মাত্রা (মাত্রার আরও অর্থ আছে) দিয়া লেখেন—গোটা গোটা লেখেন—ভাঙ্গা অক্ষর আদৌ লেখেন না। ভাঙ্গা অক্ষর লেখায় যে অভিশাপ আছে। এখন বুঝিবেন মন্ত্র পাঠের পর কেন হিন্দু বলেন—

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া, বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধিস্তু সদৈব জায়তাম্॥

যন্মাত্রা-বিন্দুবিন্দুদ্বিতয়-পদপদদ্বন্দ্ববর্ণাদি হীনং,
ভক্ত্যা ভক্ত্যানুপূর্ব্ব-প্রভবকৃতি বশাদ্ব্যক্তমব্যক্তমদ্য।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিত-মপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেঽস্মিন্
তৎসর্ব্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ॥

আমরা পূর্ব্বে যে তারকব্রহ্মনামকে শক্তিবীজ বলিয়াছি, পাঠক মহাশয় তাহা একবার বিবেচনা করিবেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

এই মন্ত্রেরই নাম তারকব্রহ্ম নাম বা মন্ত্র, এই মন্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে, রেখায় রেখায়, মাত্রায় মাত্রায় কি শক্তি কোন রূপে কোন মূর্ত্তিতে কোথায় নিহিত আছে তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। এক্ষণে সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। প্রহ্লাদ কেন 'ক' দেখিয়া কাঁদিয়াছিলেন—তাহা বুঝিতে পারা গেল।

বলিয়া দিতে হইবে না, আমরা সাধারণ ভাবে মন্ত্রের এবং পরে বিশেষ-রূপে দীক্ষা মন্ত্রের আলোচনা করিয়াছি।

আর একটি কথা পাঠক মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দি। বেদে দেখিয়াছেন, অমুক সূক্তে অমুক দেবতা অমুক ঋষি। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে সেই সূক্ত-মন্ত্রে সেই দেবতারই আহ্বান হইবে—সেই মন্ত্র বলে সেই দেবতার আবির্ভাব হইবে। আর অমুক ঋষি প্রথমে সেই মন্ত্র উচ্চারণে ও সেই মন্ত্র বলে সেই দেবতার আহ্বান কার্য্যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়া সেই ঋষির ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

রামায়ণ মহাভারতে বাণের কথা পড়িয়া নব্য বাবুরা বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া যান, আর মনে করেন গঞ্জিকা প্রসাদে কি অপরূপ কল্পনা ও রাগ সংসাধিত হইতে পারে। এই পার্থ অগ্নিবান এড়িলেন অমনি কর্ণ মেঘবাণে বৃষ্টি করিয়া অগ্নি নিবাইয়া দিলেন, এই কর্ণ সর্পবাণ ছাড়িলেন অমনি অর্জ্জুন গরুড়বানে তাহা নিবারণ করিলেন। ইহা কি কল্পনা?—উত্তর, না। ঋগ্বেদের "করোলারি" যেমন আয়ুর্ব্বেদ, সামবেদের যেমন গান্ধর্ব্ববেদ তেমনি যজুর্ব্বেদের করোলারি হইতেছে ধনুর্ব্বেদ। মন্ত্রের আহ্বানে দেবতা আসিয়া বাণের মুখে বসিতেন এবং সাধকের ঈপ্সিত কার্য্য করিয়া সাধককে কৃতার্থ করিতেন। এই ধনুর্ব্বেদের বিদ্যা গুরুমুখী ছিল। বিশ্বামিত্র রামকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য কুরুপাণ্ডবদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দেন, ইহা সকলেই জানেন। এই বিদ্যার নিদর্শন স্বরূপ এখন 'নলচালা' 'ভার-মারা' 'বাণ-মারা' আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলিসম্যান পত্রে একজন প্রত্যক্ষকারী ইংরেজ এই নলচালার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করেন। এবং কারণ কি কিছুই বলিতে পারেন নাই। কুম্ভকারের পোয়াণের সহস্র হাঁড়ি একটি মাত্র মন্ত্রের উচ্চারণে একেবারে তলদেশে ফুটা হইয়া যায়, এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বাণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

একদা রাবণ শুক্রাচার্য্যকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, ভবাদৃশ সদ্‌গুরু বিদ্যমানে কিরূপে আমার এতাদৃশ দুঃখরাশি উপস্থিত হইল? দৈত্যগুরু বলিলেন 'দেখ দশানন সম্প্রতি তুমি নির্জনে যাইয়া যত্নসহকারে এক হোম কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। যদি তাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে হোমানল হইতে বিশাল রথ, বাহন, শর, শরাসন ও তূণীর নিচয় উৎপন্ন হইবে এবং তদ্দ্বারা তুমি অজেয় হইয়া উঠিবে। এক্ষণে আমি মন্ত্রদান করিতেছি, গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র গিয়া হোমানুষ্ঠান কর।' রাবণ হোম করিয়াছিলেন কিন্তু অঙ্গদ ও হনুমানের কার্য্যে তাহা শেষ হয় নাই। পাঠক মহাশয় এখন বোধ হয় এই সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন। অন্ততঃ বিশ্বাস করিতে শিখুন চরমে মঙ্গল হইবে। ঋষিবাক্য মিথ্যা নহে।

এক্ষণে দীক্ষা-মন্ত্র সম্বন্ধে আরও একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

ক্রমশঃ।

হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ উকীল

শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের মৃত্যু উপলক্ষে।

"তুলসী যব্ জগ্‌মে আয়ো,
জগো হসে তোম্ রোয়্।
অ্যায়্‌সে কর্ণি কর্‌চলো কি,
তোম্ হসো জগো রোয়্॥" তুলসীদাস।

আঁধারে মগন কেন রে গগন বুঝি শশী খসিল রে।
কৌমুদীর রাশি পূর্ণিমার শশী ঐ আঁধারে ডুবিল রে॥
কোন্ রাহু আসি জ্যোৎস্নার রাশি সহসা গ্রাসিল রে।
আহা তারাদল হইয়া চঞ্চল মলিন মুখ ঢাকিল রে॥
হায় অকস্মাৎ অশনি নিপাত সহসা ধরণীতলে।
সুবর্ণ তরণী শশী গুণমণি ডুবিল অতল জলে॥

বাতাস না বয় সব শোকময় স্তব্ধ অবনীধাম।
দুরন্ত সে কাল না বুঝিয়া কাল মুছিল শশীর নাম॥
কাল-কীট আসি মরমেতে পশি কাটিল আমূল তার।
হৃদয় বিদরে গুরুশোক ভরে বহা নাহি যায় ভার॥
উজল রতন স্বদেশ ভূষণ খসিয়া পড়িল আজ।
হাহাকার রব করিতেছে সব পরিয়া শোকের সাজ॥

দুদিনের তরে আসিয়া সংসারে সাজালে খেলার ঘর।
কিবা খেলা খেলি ভব-খেলা ভুলি চলিলে এত সত্বর॥
সুন্দর মূরতি হেরিলে ভকতি আপনি উদয় মনে।
তব গুণ গাঁথা স্মরি পাই ব্যথা কাঁদি সজল নয়নে॥
হেন উচ্চ মন আছে বা কজন দয়ার আধার তুমি।
(তবে) হইয়া নিদয় কেন গুণময় ত্যজিলে মরত ভূমি॥
দেখ পাগলিনী তোমার ঘরণী চাহিলে না তার মুখ।
কচি কচি মেয়ে ব্যাকুলিত হ'য়ে কাঁদিয়ে ভাসায় বুক॥
ননীর পুতলি তব পুত্রগুলি কোথা পিতা বলি ডাকে।
আত্মীয় স্বজন সজল নয়ন আজ হারায়ে তোমাকে॥

দীন দুঃখী জন হে দীনপালন ছিল তব মুখ চেয়ে।
দেখ সকাতর কাঁদিছে বিস্তর সকলে অনাথ হ'য়ে॥
পর উপকার ব্রত যে তোমার হ'ল আজ উদ্‌যাপন।
জীবে হেন দয়া পর দুঃখে মায়া দেখি না কভু এমন॥
রাগ হিংসা দ্বেষ ঘৃণিত বিশেষ ধর্ম্মমতি বিচক্ষণ।
পিতৃমাতৃ ভক্তি শাস্ত্রেতে আসক্তি আহা ছিল বিলক্ষণ॥
মানীজনে মান জ্ঞানীরে সম্মান কে করিত তব মত।
তব বুদ্ধিবলে মোহিত সকলে করেছ উন্নতি কত॥
পরামর্শ দানে 'ব্যবহার' জ্ঞানে কে আছে তোমার ন্যায়।
তব বন্ধুগণ বিমর্ষ বদন করিতেছে হায় হায়॥

জীবন পবিত্র আদর্শ চরিত্র কোথায় পাইব আর।
জন সাধারণে তোমার বিহনে করিতেছে হাহাকার॥

উকীলের মাঝে পারিজাত সাজে যথা বিমল সৌরভ।
প্রতিভার বলে যে যশ লভিলে ঐহিত জীবনে তব,
অতুল গৌরবে সে যশ সৌরভে লভেছ অনন্তধাম।
ধন মান যাবে কিছুই না রবে (রবে) পীযূষ পূরিত নাম।
অমৃতের রাশি সে বিমল হাসি কত সুখ দিত চিতে।
সুমিষ্ট বচন সুধা বরিষণ (আর) না পশিবে শ্রবণেতে॥
বীণার ঝঙ্কার না শুনিব আর নীরব হ'ল এখনে।
ছিঁড়িল বীণার সাধের সে তার দগ্ধ হ'ল ঐ শ্মশানে॥
মূরতি মোহন হেরিতে নয়ন কভু না পাইবে আর।
চিরদিন তরে সার হইল রে উষ্ণ নয়ন আসার॥

নাট্যশালাসম ওহে দেবোপম বিভূষিত গৃহদ্বার।
ল'য়ে ফুলডালা সাজাইলে মালা দেউটী জ্বলিল সার॥
পূর্ণ অভিনয় না হ'তে সময় নিবিল আলোকমালা।
সকলি রহিল আঁধারে ডুবিল সুসজ্জিত নাট্যশালা॥
কিম্বা ভগবান্ জীবে দয়াবান্ আহ্বানিছেন তোমারে।
'কর্ম্ম' শেষ করি লীলা পরিহরি গেলে স্বরগের দ্বারে॥
স্বরগের দ্বার খুলিয়া সত্বর আসে দেব দূতগণ।
মন্দারের মালা দেয় দেববালা করিয়া অতি যতন॥
উজল রতনে বিবিধ ভূষণে সাজাইয়া দেবগণে
রত্নসিংহাসনে সে "শশিভূষণে" লয় অমর ভবনে॥
তবে কেন আর বৃথা হাহাকার সকলি ত মায়াময়।
শোক পরিহর নিজ "কর্ম্ম" কর যবে মরণ নিশ্চয়॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

কোন্ পথে যাই ?

'কোন্ পথে যাই'?—সে দিন আমার মন বড় ভাল ছিল না। সংসারের নানা জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষুব্ধ প্রাণে বিষণ্ণ বদনে পথিপার্শ্বস্থিত ভবনে বসিয়া জীবনের নানা কথা ভাবিতেছিলাম। এমন সময় শুনিতে পাইলাম 'কোন্ পথে যাই?' মনুষ্যের জীবনে এমন একটী মুহূর্ত্ত আছে, যখন এক বিন্দু আঘাত মাত্র শরীরের সমস্ত যন্ত্র আমূল আলোড়িত হইয়া উঠে। সে দিন বুঝি আমার সেই মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল। তাই ঐ কথা গুলি শুনিবা-মাত্র আমার সমস্ত প্রাণটা চমকিয়া উঠিল। বিদ্যুৎজ্যোতি যেমন মেঘ-মালাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বায়ুরাশিকে বিকম্পিত করিয়া গিরিগুহাতল পর্য্যন্ত আলোকময় করিয়া তুলে ঐ কথা গুলি সেরূপ আমার ভিতরের অন্ধকারকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্ন করিল। আমি মস্তক উঠাইয়া চাহিয়া দেখিলাম। একজন পথিক পথিমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিন্তিত বদনে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে ঐ কথা বলি-তেছে 'এখন কোন্ পথে যাই?' বর্ত্মটী এইখানে দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে তাই পথিক পথ স্থির করিতে না পারিয়া সঙ্কটে পড়িয়াছে।

বিদ্যুৎ হানিয়া নিবিয়া গেলে, আকাশ পাতাল গুহা, দ্বিগুণ অন্ধকারে পরিণত হয়। তেমনই আমার প্রাণটী মুহূর্ত্ত জন্য প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়া পরক্ষণেই গাঢ়তররূপে আঁধারময় হইয়া গেল। 'কোন্ পথে যাই?' আজ আমারও ত এই দশা! আজ আমিও ত সংসারের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া মুখ ভার করিয়া ঐ কথাই ভাবিতেছিলাম—তবে অত স্পষ্ট করিয়া, কথাগুলি অমন গুছাইয়া, ঠিক করিতে পারি নাই। ঐ পথিকের মনের কথা ঠিক আমারই মনের কথা। নতুবা উহার কথায় আমার প্রাণ কম্পিত হইল কেন?

'কোন্ পথে যাই?'—এ কি বিষম সমস্যা! এ কি কঠিন প্রশ্ন! পথিক অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। কিন্তু আমি তাহা ভাবিয়া-ছিলাম। মানুষ জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ঐ কথা কি ভাবিতেছে না? এ জগতে কিছু ত স্থির থাকিবার নহে। সময় সকলকেই ত টানিয়া লইয়া যাইতেছে—এ গতির যে মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। এই বিষম আকর্ষণে পড়িয়া

সকলেই ভাবিতেছে 'কোন্ পথে যাই'? ঐ আকাশে চন্দ্র সূর্য্য, অগণ্য তারকারাশি; এই ধরণীতলে ফল ফুল বৃক্ষ লতা সকলেই সময়ের আকর্ষণে বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে হয় না, এখন 'কোন্ পথে যাই'? কালের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গন্তব্যপথ স্থির হইয়াছে। তাহাদের স্রষ্টা সেই প্রথম দিবসে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আজ সময়চক্রের অগণনীয় আবর্ত্তনের পরও তাহারা সেই পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে। তাহারা তোমার আমার ন্যায় পথ হারাইয়া বিহ্বল চিত্তে দাঁড়াইয়া থাকে না। হায় মনুষ্য আত্ম অহঙ্কারে ইহাদিগকেই জড় বলে! বস্তুতঃ জড় ত আমরাই। পদে পদে আমরা পথ হারা জড় নিশ্চল। মনুষ্যকে জীবনের প্রথম দিনে বিরাট অঙ্গুলি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সে পথ মনুষ্য নিমেষ পরেই ভুলিয়া গিয়াছিল। পথ ভুলিয়াছিল, অন্ধকারে পড়িয়াছিল, আঁধারে বিপথে চলিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পরিক্লিষ্ট হইয়াছিল, তখন হারাণ পথ মনে পড়িয়াছিল, তখন আবার তাহা পাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। দুর্গম বন্ধুর পথ হইতে সরল পথ বাহির করা কেবল অহং রশ্মির কর্ম্ম নহে, একজন পরিচালকের প্রয়োজন। মনুষ্য সেই বিরাট অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া অহং আলোকে ধাঁধায় পড়িয়া গেল। হারাণ পথ ত বাহির হইল না।

ভ্রমেই ভ্রম জন্মে। মানুষ কোরাণ, বাইবল, জেন্দাবেস্তা প্রচার করিল। প্রথমের একটী ভূল পাঁচটী হইয়া বাড়িয়া গেল। উপনিষদ সাঙ্খ্য পাতঞ্জল কোরাণ বাইবলের টীকা টিপ্পনী কত কি বাহির হইল কিন্তু গোল মিটিল কি? গোল মিটিল! হরি হরি গোল ত বাড়িয়া গিয়াছে! অন্ধকার ঘনস্তূপ মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সেই ঘনস্তূপ ভেদ করিয়া আশার একটিমাত্র ক্ষীণ রশ্মিও জীবনের একটি কোণকেও আলো-কিত করে না। কেবল অন্ধকার, দিগন্তব্যাপী ঘন অন্ধকার। তুমি আঁধারে অন্ধ, আমিও তাই। তুমি আমায় কোথায় লইয়া যাইবে ভাই? তুমি অহং বাতি জ্বালিয়াছ, তাহা দেখিতেছি। কিন্তু ঐ আলো যে 'সুমুখ আঁধার' করিবে তাহা কি ভাব নাই?

শ্রীদঃ

বসন্তসেনা।

[সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক হইতে অনুবাদিত।]

প্রথম-অঙ্ক।

[সূত্রধারের প্রবেশ।]

নান্দী।

পর্য্যঙ্ক-আসনে বদ্ধ দ্বিগুণভুজগে, জানুদ্বয় যাঁর;
কুম্ভক-সাধনে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান, করি পরিহার;—
আত্মায় পরম ব্রহ্ম হেরিছেন যিনি, তত্ত্ব দৃষ্টি-বলে;
লয়-কালে ব্রহ্মচিন্তা সে মহাদেবের; পালুন সকলে।

আর— শ্যাম-জলধরোপম নীলকণ্ঠ কণ্ঠ; সবে পালুন সর্ব্বথা;
বিদ্যুতের রেখাসম সদাশোভা পায়, যাহে গৌরীভুজলতা।

[নান্দী পাঠানন্তর]

সূত্র। সভ্যগণের কৌতূহলনিবারক এ পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? মহাশয়দিগকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতেছি যে আমরা মৃচ্ছকটিক নামক প্রক রণ অভিনয় করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়াছি। ইহার কবি—

শূদ্রক নামেতে ব্রাহ্মণের মুখ্যতম,
গুণবান্ রূপবান্ পূর্ণচন্দ্রোপম,
ধীরোদ্ধত গতি যাঁর গজ-বর-সম,
চকোরের মত যাঁর চক্ষুঃ মনোরম।

আর— ঋগ্বেদ সামবেদ করি অধ্যয়ন,
হস্তী-শিক্ষা নৃত্য-গীত অঙ্কে বিচক্ষণ,
জ্ঞানচক্ষুঃ লাভ করি শিবের কৃপায়,
নিযোজিয়া পুত্রে রাজ-লক্ষ্মীর সেবায়,
মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ করি সমাপন,
দশাধিক শতবর্ষ ধরিয়ে জীবন,
অনন্তর নৃপবর লীলা সাঙ্গ করি,
প্রবেশেন অগ্নিমাঝে ভব পরিহরি।

আর— সমরে আসক্তি অতি, প্রমাদ-বিহীন-মতি,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ তপস্বীপ্রবর;
শত্রু হস্তী সনে খেলা, অপূর্ব্ব যাঁহার লীলা,
ছিলেন শূদ্রক নৃপ প্রশান্ত-অন্তর।

তাঁহার রচিত এই মৃচ্ছকটিক—

বণিক ব্রাহ্মণ উজ্জয়িণী ধামে,
দরিদ্র যুবক চারুদত্ত নামে—
খ্যাত, যাঁর গুণে বসন্ত-শোভনা,
আসক্তা গণিকা শ্রীবসন্তসেনা।

তাদের সুরত-লীলা রীতি নীতি ব্যবহার,
অবশ্য ঘটিবে যাহা, খলের স্বভাব আর,
র'চেছেন নৃপবর করি কত বিবেচনা।

(অগ্রসর হইয়া ও দেখিয়া) অয়ে! আমাদের এই রঙ্গালয় শূন্য! অভিনেতৃগণ কোথায় গেল? (চিন্তা করিয়া) অঃ—বু'ঝেছি—

অপুত্রের গৃহশূন্য, সাধু মিত্র নাই যার,
দিক্ শূন্য অবোধের, সব শূন্য অভাগার।

আমি গান ক'রেছি, এই গ্রীষ্মকালে বহুক্ষণ গান ক'রে ক্ষুধায় আমার চোক্ দুটো প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে শুষ্ক পদ্মবীজের মত খট্ খট্ কচ্ছে। তবে এখন গৃহিণীকে ডে'কে জিজ্ঞাসা করা যাক্ কিছু প্রতির্ভোজ্য আছে কি না। (এই আমি প্রয়োগ ও প্রয়োজন বশতঃ প্রাকৃত ভাষী হ'লেম)। অঃ—কি কষ্ট! অনেকক্ষণ গান ক'রে ক্ষুধায় আমার শরীরটা শুক্‌নো পদ্মনালের মত হ'য়ে গেছে। তবে এখন ঘরে গিয়ে দেখি গৃহিণী কিছু প্রস্তুত ক'রেছে কি না। (অগ্রসর হইয়া ও দেখিয়া) এই আমাদের ঘর, তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিয়া) অঃ কি আশ্চর্য্য! এ কি? আমাদের ঘরে যে মহৎ আয়োজন দেখা যাচ্ছে! চা'ল ধোয়া জলে পথ ভেসে গেছে, লোহার কড়া ঘসায় মাটী কাল হ'য়ে তিলক-ভূষিতা যুবতীর মত শোভা পাচ্ছে, গন্ধে ক্ষুধা বে'ড়ে উ'ঠে আমায় বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। তবে কি পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত ধন লাভ হ'য়েছে? না কি আমিই ক্ষুধায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্নময় দেখ্‌ছি? আমাদের ঘরে খাবার কিছু নাই, ক্ষুধায় আমার প্রাণ যাচ্ছে। এ দিকে আবার নূতন আয়োজন দেখা যাচ্ছে। একজন বাট্‌না বাট্‌ছে,

আর একজন মালা গাঁথ্‌ছে। (চিন্তা করিয়া) এ—কি? আচ্ছা, গৃহিণীকে ডে'কে প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানা যাক্। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আর্য্যে! একবার এ দিকে এ'স।

নটী। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্য! এই আমি এ'য়েছি।

সূত্র। আর্য্যে! তোমার মঙ্গল তো?

নটী। আর্য্য! অনুমতি করুন কি কত্তে হ'বে?

সূত্র। আর্য্যে! ("অনেকক্ষণ গান ক'রে" ইত্যাদি বলিয়া) আমাদের ঘরে কিছু খাবার আছে কি না?

নটী। আর্য্য! সব আছে।

সূত্র। কি কি আছে?

নটী। পায়স, ঘি, দৈ, ভাত ইত্যাদি, আপনার খাবার ভাল তার সবই আছে। দেবতারা এইরূপই আশীর্ব্বাদ করুন।

সূত্র। কি! আমাদের ঘরে সবই আছে? না পরিহাস কর্‌চ?

নটী। (স্বগত) আচ্ছা একটু পরিহাসই করা যাক্। (প্রকাশ্যে) আর্য্য! আছে—দোকানে।

সূত্র। (সক্রোধে) আঃ অনার্য্যে! তোরও এইরূপ আশা ভঙ্গ হবে, অভাবে পড়্‌বি; যেহেতু এখন আমাকে ঢিলের মত উচ্চে তু'লে ফেলে দিলি।

নটী। আর্য্য! ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন, আমি পরিহাস ক'রে ব'লেছি।

সূত্র। তবে—এ সব নূতন আয়োজন দেখা যাচ্ছে? একজন বাট্‌না বাট্‌ছে, আর একজন মালা গাঁথ্‌ছে আর এই পঞ্চ বর্ণ কুসুমশোভিতা ভূমি।

নটী। আর্য্য! উপবাস কচ্চি।

সূত্র। এ উপবাসের নাম কি?

নটী। ইহার নাম "অভিরূপ-পতি"।

সূত্র। আর্য্যে! এ কি ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক?

নটী। আর্য্য! পারলৌকিক।

সূত্র। (সক্রোধে) দেখুন দেখুন মহাশয়রা! আমার ভাত খরচ ক'রে পরকালের পতির যোগাড় কচ্চে।

নটী। আর্য্য প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, জন্মান্তরেও আপনিই আমার পতি হবেন, এই জন্যই উপবাস কচ্চি।

সূত্র। আচ্ছা, এ উপবাস কত্তে কে বলেছে?

নটী। আপনারই বন্ধু চূর্ণবৃদ্ধ।

সূত্র। (সক্রোধে) আঃ বান্দীর বাচ্ছা চূর্ণবৃদ্ধ! পালকরাজা কবে তাকে নব-বধূর চুলের মত ছেদন কর্‌বে? তাই আমি দেখ্‌বো।

নটী। আর্য্য! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আপনারই পারলৌকিক এই উপবাস কচ্চি। (পদতলে পতন)।

সূত্র। আর্য্যে! উঠ, উঠ, বল এই উপবাসে কি করা আবশ্যক?

নটী। আমাদের যোগ্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক।

সূত্র। আচ্ছা, তবে তুমি যাও, আমি আমাদের যোগ্য-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কচ্চি।

নটী। যে আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্তা)।

সূত্র। (অগ্রসর হইয়া) অহো! সমৃদ্ধিশালী এই উজ্জয়িনীতে আমাদের যোগ্য ব্রাহ্মণ কোথায় পাব? (দেখিয়া) এই চারুদত্তের মিত্র এদিকেই আস্‌ছেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করা যাক্। আর্য্য! মৈত্রেয়! আমাদের ঘরে আহার করিতে আপনি সম্মত হউন।

(নেপথ্যে) ওহে! তুমি অন্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কর; আমি এইক্ষণ ব্যস্ত আছি।

সূত্র। মহাশয়! ভোজন প্রস্তুত, কোন ব্যাঘাত নাই, বিশেষতঃ কিছু দক্ষিণাও হবে।

(আবার নেপথ্যে) ওহে! তুমি যখন প্রথমেই আদিষ্ট হ'য়েছ, তবে আর কেন পুনঃ পুনঃ আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কচ্চ?

সূত্র। এ আমাকে প্রত্যাদেশ কল্লে। আচ্ছা, অন্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করি। (নিষ্ক্রান্ত)।

প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ।

ঘুমঘোর।

সে কি ঘুম ঘোর ?
সাধের সে ফুলমালা,
পরাণে পরাণ ঢালা,—
আজো যে কাহিনী লেখা মরমেতে মোর !
সে কি ঘুম ঘোর ?

সে কি ঘুম ঘোর ?
উজল উজলপারা,
আকাশে হীরারতারা,
যবে গণিতাম দুঁহে সুখে হ'য়ে ভোর !
সে কি ঘুম ঘোর ?

সে কি ঘুম ঘোর ?
ফুটন্ত গোলাপগুলি,
বাতাসে পড়িত ঢুলি,
নাচিয়া নাচিয়া সেই কম-কায়ে তোর !
সে কি ঘুম ঘোর !

সে কি ঘুম ঘোর ?
তোরে ফুল ভূষা দিয়া,
ফুল দেবী সাজাইয়া,
পলক বিহীন চোখে চেয়ে থাকা মোর !
সে কি ঘুম ঘোর ?

সে কি ঘুম ঘোর ?
তোর ওই মুখ চেয়ে,
অমৃত যাইত ছেয়ে,
যে দিন এ ক্ষুদ্র হৃদি ক্ষুদ্র প্রাণ মোর !
সে কি ঘুম ঘোর ?

সে কি ঘুম ঘোর ?
স্তব্ধ আঁখিপথ দিয়া,
প্রাণ যেত বাহিরিয়া,
পড়িত আবেগে লুটে ওচরণে তোর !
সে কি ঘুম ঘোর ?

সে কি ঘুম ঘোর ?
হৃত প্রাণে ভর করি,
অমিয়া লইত হরি'
প্রাণের উচ্ছ্বাসে যবে নয়ন চকোর,
সে কি ঘুম ঘোর ?

সে কি ঘুম ঘোর ?
যদি তাহা ঘুম ঘোর,
থাক সে কুহেলি মোর,
ঘুমঘোর বিনা তবে কিবা আছে মোর ?
সবি ঘুম ঘোর !

(ইহা) যদি ঘুম ঘোর,
এই ঘোরে ডুবে র'য়ে,
পলকে যাইবে ব'য়ে,
এমনি এমনি সখি শত জন্ম মোর,
থাক ঘুম ঘোর।

মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা রচয়িত্রী।

মূলরের পত্র।

বাঁচিয়া থাকিলে অনেক দেখা যায়। আচার্য্য মোক্ষমূলর এখন মিশনরী—খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। বড় আশা করিয়া নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের চাঁই রেবঃ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে পত্র লিখিয়াছেন, বলিতেছেন, 'আর কেন, প্রাণ কি বাঁচে শুধু আঁখিরই মিলনে? এস আলিঙ্গন কর, আলিঙ্গন করি। তোমরা যে খৃষ্টান্ তা জানি, তোমরাই তা বলিয়াছ, আমরাও তা বুঝিয়াছি। আর বিলম্ব সহে না প্রাণে।' পত্রখানির তারিখ ১৫ই জুন, ১৮৯৯, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—মজুমদার মহাশয় টীকা টীপ্পনী যোগ করিয়াছেন।

বাধ্য হইয়া একটু ইংরেজী তুলিয়া দিতে হইল। অনুবাদে রসটুকু চুঁইয়া যাইবে।

Try to remove the differences that still exist among yourselves, and to settle how much of your ancient religion you are willing to give up, if not as utterly false, still as antiquated. * *

I am quite aware that you may truly retort, that we also, I mean the followers of Christ, have many differences among us, and should remove them and agree among ourselves, before we can reasonably expect that you will listen to us. * *

You have surrendered polytheism, idolatry, and your belief in the divine inspirations of the Veda. What are your remaining differences compared with what you have already given up?

Take then the New Testament and read it for yourselves and judge for yourselves whether the words of Christ as contained in it satisfy you or not.

I know that you yourself, as well as Ram Mohan Roy and Keshub Chundra Sen, have done that.

There is no necessity whatever of your being formally received into the membership of one or the other Sect of the Christian Church.

Have a "Baptism" as Upannyana if you please, as an outward sign of that new life.

You have nothing to do with popes, bishops, priests, ministers, *et hoc genus omne.*

In your case I should certainly say, try whether you cannot join the Church of England as lay members.

I am myself a devoted member of the English Church.

ইহার ভাবার্থ দিলাম। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিসম্বাদ আছে, তাহার মীমাংসা কর। তোমাদের পুরাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া যদি নাও ত্যাগ কর, অতি পুরাতন বলিয়া কতটা ত্যাগ করিবে কতটা রাখিবে ঠিক করিয়া লও। "খৃষ্টানদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায় আছে, বিবাদ বিসম্বাদ আছে, অগ্রে আপনার ঘর সামলাও পরে আমাদিগকে খৃষ্টান হইতে বলিও" —এ কথা বলিয়া জবাব দিতে পার জানি।

তোমরা ত বহু দেবদেবী, পৌত্তলিকতা ও বেদের অপৌরুষেয়তা ত্যাগ করিয়াছ, ঢের করিয়াছ। একটু বাকি থাকে কেন?

এখন ধর, নিউটেষ্টামেণ্ট লও, পড়, ভাব, বিচার করিয়া দেখ, খৃষ্টের বাক্য তোমাকে সন্তোষ দান করে কি না। জানি, রামমোহন রায় কেশব

চন্দ্র সেন আর স্বয়ং তুমি এ কাজ করিয়াছ। তোমাদের কোন খৃষ্টান সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। তবে "ব্যাপ্তাইজ" হওয়াটা চাই। একটা ব্যাপ্তাইজ—উপনয়ন সৃষ্টি করিতে পার। লোকে চিহ্ন দেখিয়া বুঝিবে যে নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে।

পোপ, বিসপ, পুরোহিত, মিনিষ্টার এ সব দলে তোমাদের প্রয়োজন কি? তোমরা চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের নানুষ্ঠানিক সভ্য হইতে পার।

আমি নিজে সেই সম্প্রদায়ের একজন অনুরাগী সভ্য।

পাঠক মহাশয় পত্রখানির মর্ম্ম বুঝিলেন? সমস্ত পত্রখানি তুলিবার বা মর্ম্মানুবাদ করিবার আমাদের স্থান ও সময় নাই কিন্তু তথাপি সারসংগ্রহের আর কিছুই বাকি রহিল না। এক কথায়, 'খৃষ্টান হও আর আমি যে সম্প্রদায়ের সেই সম্প্রদায় ভুক্ত হও।'

সাধু সাধু !!! মোক্ষমূলর সংস্কৃত শাস্ত্র ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন কি না যে একটি লোককে ধর্ম্মপথে আনিতে পারিলেই স্বর্গবাসের অধিকারী হওয়া যায় তাই সেন্সসের রিপোর্ট দেখিয়া একেবারে ব্রাহ্মণের দলকে দল আকর্ষণ করিতেছেন। ইংরেজদের কার্য্যের কেমন একটা সামঞ্জস্য আছে—কেমন একটা মীমাংসা আছে, কেমন একটা সহানুভূতি আছে—কেমন একটা স্বদেশানুরাগ প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা আপনাদের কার্য্য (তাহা যে কার্য্য হৌক না কেন) করিয়া থাকেন। কি ছোট কি বড় কি ধনী কি দরিদ্র কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান সকলেই বুঝেন যে ভারতরাণীকে খৃষ্টান করিতে পারিলে ইংরেজের পরম লাভ। ভাব ভাষা ত এক হইয়া গিয়াছে; আবার ব্যবহার ত অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এখন ধর্ম্মটা এক হইলেই সাক্ষণ নর্ম্মানের মত প্রাণের মিলটা হয়। সেই জন্যই প্রথম হইতেই চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মাঝে রৌপ্য সূত্রাকারা, গিরি নির্ঝরিণী নিদারুণ বাধা পাইয়াছেন, সম্মুখে প্রকাণ্ড পর্ব্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। তাই আজ মোক্ষমূলররূপ ডিনামাইটের প্রয়োজন—পর্ব্বত উড়াইতে হইবে। কিন্তু আমাদের কি সাবধান হওয়া উচিৎ নহে? মুখসটি পড়িয়া গিয়াছে তাই পাঠক একবার মুখখানি বাতির আলোকে দেখিয়া লউন। সাবধান! সাবধান !!

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

৭৯

গীত—মালশী।

এই দীন পামরে কবে করিবে কৃপা জননি!
কালে কালে গত কাল, মহাকাল মন মোহিনি!
অজ্ঞানে শৈশব কাল, নিমিষে মা গত হোল,
পেয়ে কাল যৌবন কাল, তাহে কাল হোল কামিনী।
সে কাল কামিনী সঙ্গে, সদা সুখ রসরঙ্গে,
ম'জে অসঙ্গ প্রসঙ্গে, কাটালেম্ দিবাযামিনী!
অন্তে হোলে জরাক্রান্ত, এসে ভীষণ কৃতান্ত,
করিতে মা জীবনান্ত, কি উপায় হ'বে ঈশানি!
দীনের এই ভিক্ষা একান্তে, শ্রীদুর্গা চরণে অন্তে,
স্থান দিবে মা পদপ্রান্তে, কৃতান্ত ভয় বারিণি!

৮০

গীত—কামোদ।

বাঁশীটি থুইয়া যাও তোমার বদলে। ধ্রু
যদি বাঁশী সঙ্গে নিবা, নিরবধি বাজাইবা,
বাঁশীর স্বরে আসিব কামিনী।
কংসরাজা দুষ্ট বরে, তোমারে মারিব ধ'রে,
নিশ্চয় মরিমু অভাগিনী॥
বন্ধের বাঁশী যত কৈল, গোকুলে খাঁথার থুইল,
বাঁশী নয়রে মোর প্রাণের বৈরী।
কিবা বাঁশী মোর দেও, নতু মোরে সঙ্গে নেও,
তবে সে বিদায় দিতাম পারি॥ (সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ।)

৮১

আমার কি হবে কালিকে!
জীবনযাত্রা গত মাগো করি আজি কাল্কিকে।
(মা!) মজিয়ে বিষয় সম্পদে, না ভজিলেম ঐ পদে,
পড়েছি ঘোর বিপদে, নৃমুণ্ডমালিকে!

এ ভবসিন্ধু অকুল, সাঁতারি না পাই কূল,
কুলকুণ্ডলিনী কুলনগবালিকে!
প্রাণ যায় গো শঙ্করি! না পেলেম শ্রীপদতরী,
শ্রীষষ্ঠীচরণ-তরী ত্রিলোকতারিকে![1]

৮২

গীত—মায়ূরী।

চলহ সখী নাগরি! মান তুমি পরিহরি,
দেখ আসি নন্দকি রায়।
ধৃত কুলব্রজনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর ক্ষেপেন্ত শ্যাম গায়॥
ক্ষণে যায় যমুনার জলে, ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে,
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীটি বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান, ত্যাজ মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়॥
কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাধে শ্যামপদে,
বিলম্ব করিতে না যুয়ায়॥

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

আলো, ১৩০৬ সাল, ভাদ্র, ১ম সংখ্যা। ১ম বর্ষ। কলিকাতা ইডেন হিন্দু-হোষ্টেল হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র ও সমালোচন। পূর্ণ পরিচয় জন্য প্রবন্ধগুলির নামোল্লেখ আবশ্যক। আলো (পদ্য), নিবেদন, পরাজপ্যে, আলোক-শোষণ, যোগভঙ্গ (পদ্য), বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, মরণের প্রতি (পদ্য), প্রদর্শনী, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, আকাঙ্ক্ষা (পদ্য)। চারিটী পদ্য আছে, নাম দেখিয়া বাকি প্রবন্ধগুলির স্বরূপ বুঝা যাইতেছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে

[1] "ষষ্ঠীচরণ" ইনি জম্বুরাজ-কবিরাজ প্রসিদ্ধ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার। নিবাস চট্টগ্রাম সুচক্রদণ্ডী। যৌবনের প্রাক্কালে দারিদ্র্যদুঃখে পীড়িত হইয়া ইনি স্বদেশ হইতে পলায়ন করতঃ জম্বুরাজের কবিরাজ হয়েন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগত হয়েন। আজ কয়েক বৎসর হইল, কাশীধামে ইহার কাল হইয়াছে। শুনিতেছি, তাঁহার ভ্রাতা বাবু পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইংরাজীতে তাঁহার অদ্ভুত জীবনকাহিনী বিবৃত করিতেছেন। তিনি এ রকম আরো বহু গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইডেন হিন্দুহোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়া এই "আলো" প্রকাশ করিয়াছেন। দুই এক সংখ্যা না দেখিলে ঠিক বুঝা যাইবে না। তবে এরূপ কাগজ নূতন নহে। কাম্ব্রিজ ছাত্রবৃন্দের, অক্ষ-ফোর্ড ছাত্রবৃন্দের এক একখানি কাগজ আছে। আমাদের যত দূর স্মরণ হয়, এইরূপ এক একখানি কাগজের নাম "ঈগল"। এরূপ পত্রে অধ্যাপকের যোগ থাকিলে বিশেষ সুবিধাজনক হয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় নিবেদনে দেখিলাম "কিন্তু আমাদের প্রধান লক্ষ্য, দেশপ্রাণ সুশিক্ষিত নব যুবকগণকে মাতৃভাষার সেবাব্রতে ব্রতী করা।" এরূপ লক্ষ্য হইলে একজন বঙ্গের কৃতীসন্তানকে সম্পাদকত্বে বরণ করিতে হয় ও একখানি কাঁচি উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়। সম্পাদকের কি কর্ত্তব্য কার্য্য হইবে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তবে আমরা একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি যে এরূপ পত্রে অধিক পদ্য প্রকাশিত হওয়া উচিৎ নহে, পরিচালকগণ ভাষার দিকে একটু দৃষ্টি রাখিবেন। আর এতেও একটু দৃষ্টি ত চাই

"চাই, তোরে পূজি! চরিতে ও ইতিহাসে
অখণ্ড কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণা সমা!
দর্শনের বিজ্ঞানের সহস্রার মাঝে
কুলকুণ্ডলিনী রূপে!

কমলা, শ্রাবণ। সমাজ-বিজ্ঞান, আশায় নিরাশ (পদ্য), খেয়াল, ফুল (পদ্য), লক্ষ্মী (ক্রমশঃ গল্প,—ক্রমশঃ), সোহাগ (পদ্য), যক্ষের ধন (এও ক্রমশঃ গল্প,—ক্রমশঃ), বিবিধ ও সংবাদ। কমলা নাকি চঞ্চলা তাই বিজ্ঞাপনের মধ্যে একস্থানে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী দেখিলাম। "অতি স্বল্প মূল্যে (১৲ বার্ষিক) সাধারণের মাসিক পত্রিকা পাঠের সুবিধার নিমিত্ত কমলার আবির্ভাব। * * অধিকন্তু সুবিধা এই যে কমলার গ্রাহকগণ অতিরিক্ত আর কিছুই ব্যয় না করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে পাইবেন।

(১) কমলার মূল্যস্বরূপ যত টাকা আদায় হইবে তাহার অর্দ্ধেক টাকায় বড় বড় ফরাশী, জার্ম্মান, ইংরাজ ও এ দেশীয় লটারির টিকিট কেনা হইবে।

(২) প্রতি বৎসরেই এইরূপ টিকিট কেনা হইবে। গ্রাহক সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইবে। ১০০ গ্রাহকে একটা দল এবং কোন দলের

নামে টাকা উঠিলে সকল দলের গ্রাহকগণকেই সমভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা অপেক্ষা টাকা কম হইলে যে দলের নামে টাকা উঠিবে কেবল সেই দলের গ্রাহকগণকেই টাকা বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

পাঠক মহাশয় উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারিয়াছেন? বার বৎসর পূর্ব্বে ফরাশিডাঙ্গা হইতে এইরূপে শশীভূষণ বাবু "বীবর" পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী সরস্বতীকে একস্থানে রাখা নিতান্ত কঠিন। কমলা বলিতেছেন ভীষ্মের মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু নহে। আবার, "আমাদিগের শাস্ত্র একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকে জ্ঞান শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্যান্য শিল্প বিদ্যাকে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করেন।" ইহাতে আশ্চর্য্য হইলাম না*। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলাম বিশেষ দ্রষ্টব্য দেখিয়া "সহরে টাকা আদায় হয় নাই বলিয়াই, এবার লটারির টিকিট ক্রয় করা হইল না।"

সিন্ধু হিন্দু সপ্তা হপ্তা এক যদি হয়,
গ্রাহকে গ্রাসকে তবে ভেদ কেন রয়?

সাহিত্য, আষাঢ়। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সুন্দর ছবি আছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন প্রয়াণের কয়ছত্র তুলিয়া দিলে বেশ হইত।

ভাতে যথা সত্য হেম উদে যথা রবি।
সেই দেব নিকেতনে বাস করে কবি॥

প্রবন্ধের মধ্যে বিবাহের উৎপত্তি, ভাগবতাচার্য্য, তুলনায় সমালোচন, বঙ্গদেশে নূতন ইতিহাস চর্চ্চা, ইংরেজের জয় ও অন্যান্য গ্রন্থ (সমালোচন), নবীন পান্থ (কবিতা), সাজাহানের মৃত্যু, সহযোগী সাহিত্য (ডাক্তার লিটনার—তিব্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত), কালনিদ্রা, মাসিক সাহিত্য সমালোচন। 'বিবাহের উৎপত্তিতে পাশ্চাত্য মতের অনুশীলন অর্থাৎ মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় স্ত্রীপুরুষের সংগতি যে অবাধ ও নির্ব্বিকার ছিল তাহার বিচার। ভগবতাচার্য্য—লেখক বলিতেছেন 'মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর সম্ভবতঃ বৃন্দাবন দাসই বাঙ্গালায় সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবত ১৪৫৭ শকে (১৫৩৮ খৃঃ) রচিত হয়। ইহা হইতে ভাগবতাচার্য্য ১৪৫০ শকে (১৫২৮ খৃঃ) কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী রচনা করেন, এরূপ অনুমান করিলে সম্ভবতঃ গুরুতর ভ্রম হইবে না। এই হিসাবে, এক শ্রীকৃষ্ণবিজয় ব্যতীত অপর কোন বৈষ্ণব

*গীতা তৃতীয় অধ্যায় ৪১ শ্লোক দেখুন।

গ্রন্থ প্রেমতরঙ্গিনীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৪০২ শকে সমাপ্ত হয়।' তুলনায় সমালোচন আমাদের ভাল লাগে নাই। হলুদ বেশী। নূতন ইতিহাস চর্চ্চার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা। ইংরেজের জয় ইত্যাদি—আমরা গ্রন্থ সমালোচনই ভালবাসি, গ্রন্থকারের সমালোচন স্থান বিশেষে ভাল লাগিতে পারে। কালনিদ্রা বেশ। সাহিত্যে পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ আছে।

ভারতী, শ্রাবণ। বাল্মীকি-মহিমা (কবিতা), পত্নীহারা, বঙ্গমাতার কর্ত্তব্য, জন্মান্তরে (পদ্য), গুজরাটে হিন্দু পার্ব্বণ, সুশীল মাইক্রোব, উত্তর-জ্যামিতি-কথা, পেনে প্রীতি, ৺সার রমেশচন্দ্র মিত্র। 'বাল্মীকি-মহিমা' হইতে একটু নমুনা দেখুন—

আচম্বিতে শুনে ঋষি অশরীরী বাণী—
"হের, বৎস, কর আজি সার্থক নয়ন।
নিশি দিন অনুধ্যান কর তুমি যাঁর,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে সেই ব্রহ্মাণ্ডের রাণী!
ভকতি, শকতি ইনি, জ্যোতি বা জীবন—
রামের বনিতা সীতা, প্রতিভা তোমার।"

বঙ্গমাতার কর্ত্তব্য ছাড়া সকলগুলিই ভাল লাগিল।

পন্থা, জ্যৈষ্ঠ। এই প্রবন্ধগুলি আছে। শ্রীহরিস্তোত্রম্, জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, সাধনা, স্বপ্নেদীক্ষা, আরোগ্য, আমি কি চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পন্থা ভাল। কিন্তু সম্পাদক কৃষ্ণধন বাবুকে আমরা আরও দুইটা কথা বলিতে চাই। তাঁহার জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ্য পত্রে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ভিতরের ব্যাপার জানেন তাঁহারা বুঝিতেছেন যে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ, অনেক কথা বলা হয় নাই—বলিবার যো নাই, লাফাইয়া লাফাইয়া বলিতে হইয়াছে, আসল কথাটাও উল্টাইয়া গিয়াছে। আর যাঁহারা ভিতরের সন্ধান জানেন না তাঁহারা ত প্রবন্ধের বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিবেন না, না বুঝিবেন আবাহন না বুঝিবেন বিসর্জ্জন, এ কথা স্থির নিশ্চয়। শাস্ত্রে যাহা সাধারণ্যে বলিতে নিষেধ আছে, যে নিষেধ সকলে মানিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণধন বাবু তাহাই প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন। একবার আমরা কৃষ্ণধন বাবুকে সাবধান করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি তাহা শুনেন নাই। যাহার

বিচার নাই যাহার বিচার চলে না, তাহার বিচার করিতে বসিয়াছেন। কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "যার ত্রিলোচন না গেলে তত্ত্ব আমি তত্ত্ব পাব কে রে"। সাধকের যাহা কেবল মাত্র ভোগের জিনিষ যাহার ভোগ সাধক নিজেই বর্ণনা করিতে অক্ষম তাহার বিচার বা প্রকাশ রামছাগলের বক্ষের স্তনের ন্যায়। এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহই সাধু হইবেন না। শঙ্কর যেখানে পশ্চাৎপদ সেখানে পাণ্ডিত্যের কথাই নাই। "আরোগ্য" "সাধনা" ভাল।

পন্থা, আষাঢ়। ভাল। "চিদাকাশে সৃষ্টি প্রকরণের চিত্র" একটু অস্পষ্ট হইয়াছে। পন্থা ভাবে ভোর হইয়া আছেন। নিজের প্রকাশে নিজেই আশ্চর্য্য।

সাবিত্রী, ভাদ্র। প্রথমেই সাবিত্রী উপাখ্যান (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর), তারপর পতিসেবা, নিত্যমিলন, বাল্মীকি রামায়ণ (পদ্যানুবাদ), গৃহাশ্রমী সাধু, নারীজীবন, আমার গৃহিণী (পদ্য-ক্রমশঃ)। এই প্রবন্ধগুলি আছে। ক্রমশ প্রবন্ধ কমাইতে হইবে। মোটের উপর ভাল।

প্রয়াস, ৯ম সংখ্যা। অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। প্রথমেই ৺বিহারী লাল চক্রবর্ত্তীর ধূমকেতু। একটু তুলিয়া দিলাম—সময়োচিত কি না?

রাজা আর রাজ অনুচর
বিষম কঠোর স্বার্থপর
কেবল নিজের তরে
নিদারুণ কর্ম্ম করে
বাধাইয়া দারুণ সমর।

পরের দেশেতে ঢুকে
পরের ছেলের বুকে
মারে রুখে আগুণের গুলি
কেনরে কি দোষ তোর
করিয়াছে রে পামর
মানুষ, মানুষে যাও ভুলি?

এ পশুত্বে বীরত্বের নামে
আজো সবে পূজ্য ধরাধামে
ভীষণ রক্তের নদী
বহিতেছে নিরবধি
রাক্ষসেরা মেতেছে সংগ্রামে।

'নাট্য-শিল্প প্রসঙ্গে' অতিবিস্তৃতি দোষ, অনেক বাজে কথা, কাজের কথা কম। বরং ইহার অপেক্ষা 'সাধারণ শিক্ষা' ভাল। লেখক বলিতেছেন "আধুনিক শিক্ষার ফলে দেশের কিছুই উন্নতি হয় নাই।" রোগ ধরা পড়িয়াছে। "ভূতের বাড়ী" একটি ভূতের গল্প। গল্পটি কিন্তু আমাদের বিবেচনায় শেষ হয় নাই। মিঃ দে ভূত মানিতেন কি না পরে মানিলেন কি না তাহা বুঝা গেল না। ইহাতে রসভঙ্গ হয়, পাঠকের তৃপ্তির ত্রুটি হয়; কারণ অনেকেই ভূত মানিবেন কি না মানিবেন, তাহা জানেন না। আমাদের ত কথাই নাই। অমাবস্যার সত্বদখলী ভূতযোনী আমরা পূর্ণিমায় অধিকার করিয়া বসিয়াছি। রণজিৎ সিংহের ন্যায় বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছি "সব ভূত হো যাগা"। "হজমি গুলি"র লেখক ধোঁকায় পড়িয়াছেন, কাজে ও কর্ত্তব্যে। তিনি পিসির দত্ত জিনিষ অহিফেন মনে করিয়া খাইয়াছিলেন সত্য কিন্তু বস্তুত তাহা হুঁকার জাটের কাট্, পিসি গুলি পাকাইয়াদিলেন এই মাত্র। তার উপর অত জলোদুধ খেলে ও "আম্র-আস্বাদন" করিলে কি আর নেশার কিছু থাকে? চোখগুণো যে সাদা ফ্যাকৃফেকে? বঙ্কিম দীনবন্ধুর কথা যদি লেখক গুলিতে পাইতেন তাহা হইলে আচ্ছা করিয়া মতীহার দিয়া সাঁবড়ি সহযোগে গাঁজায় দম মারিতেন। অপর প্রবন্ধগুলি মন্দ নহে। প্রয়াস সংবাদ দিতেছেন, রাজনারায়ণ বসুর গত আশ্বিন মাসে মৃত্যু হইয়াছে। জীবনী দেন নাই। যাহা হোক প্রয়াসের সুর কড়া—গলা না ভাঙ্গিলেই হইল।

পুণ্য, ফাল্গুণ, চৈত্র একত্রে। এবারকার পুণ্যে এই প্রবন্ধগুলি আছে। নব্যবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত, সনাতন গোস্বামীর পদাবলী, ফুলচাঁদ (জয়পুরী উপকথা), দাক্ষিণাত্যে রাঠোড় বংশ (সচিত্র), তামাক (সচিত্র), নবহিতোপদেশ জাতীয় সঙ্গীত (সচিত্র), বৃটীষমিউজিয়ম (সচিত্র), রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত (স্বরলিপি), রেখাক্ষর বর্ণমালা, খাদ্যপাক,—(রসভোগ সন্দেশ; করমচার হিন্দুস্থানী আচার; আঙ্গুর চপ।), রুষিয়া ও ইংলণ্ডের বাণিজ্য, একটুতে এত (গল্প), সমালোচনা। "স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাতে" অনেক পুরাতন সংবাদ আছে। ১৮২০ সালে সাহেব লোকেরা (বোধ হয় মিশনরিরা) নন্দন বাগানে জুবেনাইল পাঠশালা নামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা সার রাধাকান্ত দেব তাঁহার "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থে

লিখিয়াছেন যে তাহাতে প্রথমে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করে নাই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সময় কলিকাতায় প্রায় ৫০টা স্ত্রীপাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। মিশনরিরা বিলাতের চাঁদার টাকায় এই সব করিয়াছিলেন। রাজা বৈদ্যনাথও ২০০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত তাঁহার উক্ত পুস্তকে বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের শিক্ষার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অনসূয়া, বাহ্বট রাজার কন্যা দোপদী, ভগবতী, লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী, খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী, হঠী বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী, এই পুস্তকের উত্তর স্বরূপ পনর বৎসর পরে "স্ত্রীদুরাচার" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিটন সাহেব [বেথুন]ই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্ব প্রথম স্ত্রীলোকের জন্য রীতিমত বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বৎসরে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর ছাত্রী সংগ্রহ করিয়া দিতেন। বেথুন বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার পরে সরকার গ্রহণ করেন। বেথুন বিদ্যালয়ে প্রথমে তিনটি মাত্র বালিকা জুটে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা দুইটি ও পাটুলীর চাটুয্যে বংশীয় বাঁশবেড়ের ৺হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে কিন্তু লেখক অকারণ "শিশুবোধকে"র উপর রাগ করিয়াছেন। এই শিশুবোধকের কৃপায় লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন করিয়া খাইতেছেন। "নব হিতোপদেশ" বুঝিতে পারিলাম না। "জাতীয় সঙ্গীতে" কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করিয়া বলা উচিৎ ছিল। "রেখাক্ষর বর্ণমালায়" বাহাদুরী আছে। নমুনা দেখুন—

ইঞা গণপতির বন্দনা এবং বিসর্জ্জন
ইঞারে প্রণমি! ইনি গণেশঠাকুর।
নাক দিয়া বাহিরয় বাজখাঞি সুর॥
চবর্গের দেউড়িতে ভো হইয়া বসি
ইঞা ইঞো করিছেন গঞ্জিকায় রসি
কাজ নাই কর্ম্ম নাই ছড়াইয়া ঠ্যাঞ
ভাবে ভোর হঞিয়া ডাকেন কোলাব্যাঙ
চৈতন্য-চরিতে দেন মাঝে মাঝে ডুব।
হ'ঞা খা'ঞা পেয়ে তথি আজ্ঞাজমে খুব॥

বাহাদুরী সকল কাজেই আছে কি না? মনে করিয়াছিলাম, ইংরেজের কথা স্মরণ করাইয়া দিব "যে ভগবানকে লইয়া কখনও পরিহাস করিও না।" তখনই মনে পড়িল এ "পুণ্যের" কথা। সমালোচনায় শ্যামাধব রায়ের 'রস

সাগরের' জীবন চরিত দেখিলাম। রস সাগরের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১১৯৮ সাল-১২৫১) নদীয়ার রাজা গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে ঐ উপাধি দেন। তিনি মুখে মুখে দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন, কবিত্বও বেশ ছিল। কিন্তু এখন অনেকে তাঁর নাম পর্য্যন্ত জানেন না। তাঁহার রচনার নমুনা দেখুন। মহারাজ বলিলেন "টুক্ টুক্ টুক্"। কবি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

দেবাসুর যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী।
পদভরে টলমল রসাতল ক্ষিতি॥
অধৈর্য্য দেখিয়া হর, পেতে দিলেন বুক।
হরহৃদে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥
কৈলাসেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
বৃষিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
যুদ্ধকালে সুর অরি পেতে দিল বুক।
অসুরের কাঁদে পদ টুক্ টুক্ টুক্॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণপদে।
রাধাকৃষ্ণ বিনে তার অন্য নাহি হৃদে॥
নয়ন মুদিয়া দেখে সকলি কোতুক।
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥
পথমধ্যে দাঁড়াইয়া পরমসুন্দরী।
ভুবনমোহন রূপ যেন বিদ্যাধরী॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুখ।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্॥

একদিন ডাকহরকরা ঘাটে আসিয়া মুকুন্দ মাঝিকে ডাকিতেছে। রস সাগর তখন গঙ্গাস্নান করিতেছেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণও স্নান করিতেছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ কবির দিকে চাহিয়া বলিলেন "মুকুন্দ মুরারে"

রস সাগর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

পাপের পুলিন্দা বয়ে ভগ্ন হন পারে।
নিয়মিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে॥
নায়েতে নাহিক মাঝি ডাক রসনারে।
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে॥

এবারকার পুণ্য ভাল। পরিচালক মহাশয়গণের যত্ন ও উদ্যম পত্রে পত্রে প্রকাশ পাইতেছে। ক্রমে গাম্ভীর্য্য আসিতেছে। পুণ্যের ছবিগুলি বেশ। অনেকগুলি আছে—১। রাঠোড়গণের তথমা, ২। কলম্বস্, ৩। সুর ওয়াল্টার র‍্যালে, ৩। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। বিলাতী যাদুঘর, ৬। ঞ (গণেশ)।

হিমালয়কন্দরে সাধু দর্শন।

আমি সংসারের জ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ মানসে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ৺কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমার অধ্যয়নের যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেল। কাশীধামেও যখন সন্ন্যাস গ্রহণের আমার কোন সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না, তখন আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া হিমালয় অভিমুখে ছুটিলাম। মনে মনে এই সঙ্কল্প যে হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিব এবং কোন মহাত্মাকে দেখিলে চরণে লোটাইয়া পড়িব এবং যতক্ষণ তিনি দয়া না করিবেন ততক্ষণ শ্রীচরণ ছাড়িব না।

এইরূপ সঙ্কল্পরজ্জুতে মত্ত মনমাতঙ্গকে বন্ধন করিয়া আমি ঘুরিতে ঘুরিতে হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলাম। সেখানে আমার একজন পরিচিত বাঙ্গালি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দুই একদিন অবস্থানের পর সেখানে তীর্থশ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য একটি দিন স্থির করিলাম। উভয়েই আমরা একদিনে তীর্থকার্য্য করিব স্থির হইল। বলিতে ভুলিয়াছি, ৺কাশীধামে আমি ভাস্করানন্দ স্বামী ও বিশুদ্ধানন্দ স্বামী উভয়ের নিকটেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট আমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আমার ভোজ্যাদি উৎসর্গ হইয়াছে এবং সেই পরিচিত বাঙ্গালিবাবুটির ভোজ্যাদি উৎসর্গ হইতেছে এমন সময় সহসা এক অপরূপ দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল। মাথায় পাতার মুকুট, কোমরে বল্কল, জন্মদ্বার প্রভৃতি গুপ্তস্থান সকল বল্কলে আবৃত পরমাসুন্দরী এক যুবতী আসিয়া তথা উপস্থিত হইলেন। সেরূপ সুগঠন সুসৌষ্টব এবং রূপলাবণ্য আমি কখন দেখি নাই। আবার সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া সাধনালব্ধ এক অদ্ভুত জ্যোতি ক্রীড়া করিতেছিল —যেন ক্ষণে ক্ষণে আপাদমস্তক ব্যাপিয়া বিদ্যুত ক্রীড়া করিতেছে। আমাদের নিকটে আসিয়াই মাতার গতিরোধ হইল। আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। আমি চরণ ধরিয়া বলিলাম "জননি আমার একটি ঋচার অর্থ

করিয়া দিউন"। আমার শোনা ছিল যে হিমালয়ের হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে দলবদ্ধ হইয়া মায়ীরা কখন কখন নামিয়া থাকেন। তাঁহারা যে কোথায় থাকেন তাহা কেহ জানে না। এই আছেন, আবার কোথায় চলিয়া যান। তাঁহারা সকলে সিদ্ধসাধিকা। শুনিয়াছি পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের অধিকার কালে প্রায়ই তাঁহারা দলে দলে নামিতেন, এখন ইংরেজাধিকারকালে কখন কখন দূরে দূরে দর্শন দিয়া থাকেন।

মাতার আজ্ঞা লইয়া আমি আমার ঋচাটি বলিলাম—

যা মাতা ময়দানবাদি শুভজাঃ নির্ম্মাণ সীমাপুরে।
স্বাধিষ্ঠান নিকেতনে রসদলে বৈকুণ্ঠমূলে ময়া॥
জন্মদ্বারবিকারভাবলহরী বেদপ্রভা ভাব্যতে।
কন্দর্পার্পিত শান্তিযোনী জননি বিষ্ণুপ্রিয়া শাঙ্করি॥

শুনিয়া মাতা বলিলেন "এই কথা প্রকৃতিবাদীর কথা, সাংখ্যযোগ মতে। অতএব অথর্ব্ববেদের মিলন (সাংখ্যযোগ মতে) সাধারণের (এমন কি মুসলমানের পর্য্যন্ত) উপাস্য যে গায়ত্রী তাহা বলি শুন। তুমিও তা জান।"

বরেণ্যং প্রকৃতির্ভর্গং সবিতুস্তস্য ধীমহি।
মাতা পিতরো জগতঃ ধীয়োয়োন প্রচোদয়াৎ॥

মাতা বলিলেন তোমাকে ত দেখিতেছি বৈদান্তিক কিন্তু এ ত প্রকৃতিবাদীর কথা। এই কথা বলিয়া মাতা কালবিলম্ব না করিয়া কোন উত্তর না দিয়া প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিলেন। আমি উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম, ইচ্ছা যে মাতাকে ঐ দ্রব্যাদি দিয়া কৃতার্থ হই। কিয়দ্দূর গমনের পর, আমার হৃদয়ের আশাপ্রদীপ যখন নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে, সহসা দেবী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। হাঁসিয়া বলিলেন "আমি আর কিছু বলিব না, ঋষিকেশ পর্ব্বতে গিয়া যদি এক মহাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পার, তাহা হইলে অনেক কথার সদুত্তর পাইবে।" আমি চরণে পড়িয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলে মায়ী বলিলেন 'যাও ঋষিকেশে যাও, তোমার অদৃষ্টে সেই সাধু-দর্শন-লাভ-ফল রহিয়াছে।' তখন দয়াময়ী মাতা করুণাকটাক্ষে চাহিয়া আমাকে ঋষিকেশে সেই মহাত্মার আশ্রমগুহা গমনের পথটি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। গুহাটি চিনিয়া লইবার উপায়ও বলিয়া দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন যে ঋষিকেশের সেই মহাত্মার

বয়স প্রায় চারিশত বৎসর। আমি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিলাম না। মনে করিলাম পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে বুঝি বিধি এতদিনে আমার প্রতি সদয় হইলেন। যেরূপে পারি শরীর পতন করিয়াও সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিব এবং সেই পরম করুণাময় সাধু মহাত্মার চরণ পরাগে শরীর পবিত্র করিয়া মানবজনম সার্থক করিব। আর যদি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে সেই পরমাত্মার রাজ্যে একটি প্রজাস্বরূপ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন মনের সুখে অতিবাহিত করিয়া দিব।

যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। সিমলা পাহাড়ের একটি বাঙ্গালি বাবু আমাকে একটি পট্টু প্রদান করিলেন। যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া শ্রীদুর্গা শ্রীহরি বার বার স্মরণ করিয়া একদিন প্রাতে সেই সাধুর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম সত্য কিন্তু একবারও মনে হয় নাই যে সাধুদর্শন ভাগ্যে ঘটিবে না। বিশ্বাস টলে নাই।

সেই দুর্গম গিরি-পথ অতিক্রম করিতে যে দারুণ কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি নাই। সে কষ্ট বর্ণনায় পাঠক মহাশয়ের কি ফলোদয় হইবে? তবে একটা কথা বলা উচিৎ বিবেচনা হইতেছে, আমাদের দেশে ক্রোশেকের যে পরিমাণ এখানে তাহা নহে। এখানে ক্রোশের পরিমাণ কম। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন গো শব্দ করিলে যতদূর হইতে ঐ শব্দ শ্রবণগোচর হইবে গো-স্থান হইতে সেই দূরস্থান এক ক্রোশ হইবে। ঠিক কত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল বলিতে পারি না, তবে লোকে বলেন যে ঋষিকেশের সেই স্থান হরিদ্বার হইতে প্রায় বার ক্রোশ হইবে।

আর চারি দণ্ড মাত্র বেলা আছে, তার পরেই প্রকৃতিসতী রজনী দত্ত তিমিরবসনে সজ্জিত হইবেন। তখন যে স্থানে আমি দণ্ডায়মান সে স্থানের শোভা বর্ণনা করিতে কালিদাসের রসময়ী লেখনীর প্রয়োজন। যদিও রজনী সমাগমে আমার অদৃষ্টে কি ঘটিবে এই চিন্তায় মন আমূল আলোড়িত হইতেছিল তথাপি গিরিবর হিমালয়ের ক্রোড়স্থ ঋষিকেশের সানুদেশের সেই নৈসর্গিক শোভা আমাকে চিত্রার্পিতের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিল। অদূরে সম্মুখে দেখিলাম যে অতি উচ্চ গোমুখী পর্ব্বত হইতে অসংখ্য মুক্তাহারের মুক্তাবলী অবিরত ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। স্বভাব—কবি ভবভূতির

"ঝাঙ্কৃত" শব্দটি যে কি তাহা এত দিনে আমার হৃদয় গ্রহণ করিল। সুরধুনীর বাল্যলীলা যে দেখিতে পাইব তাহা কখন মনেও করি নাই। দেখিলাম প্রায় চারি বিঘা জমী লইয়া একটি সরোবরের ন্যায় হইয়াছে। গঙ্গাদেবী গোমুখী পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া যেন সেখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর আবার যেন হরিদ্বার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষশিরে মেঘ, বায়ু হিল্লোল প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিলাম—দেখিলাম যেন সকলই তপোমগ্ন। যেন সেখানে মুখ খুলিয়া শব্দ করিয়া কথা কহা একটি মহাপাতক।

স্বভাবের শোভার ঘোর ভাবাবেশে আমি কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলাম। ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে কে যেন কর্ণে কর্ণে বলিল "কি করিতেছ, সন্ধ্যা আগত প্রায়, মহাপুরুষের গুহা অন্বেষণ কর"। স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ব্বত সানুদেশে এক স্থানে সম্মুখে একটি শিবা-গহ্বর পরিলক্ষিত হইল। বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিলাম, যাহার জন্য আমার এত অন্বেষণ তাহা আমারই সম্মুখে, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু তখন সেখানে এমন একটি মাত্রও প্রাণীর দর্শন পাইলাম না যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ নিবারণ করিতে পারি। এ দিকে গোধূলিও যায় যায়। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া সেই গুহায় বিশেষ সতর্কতার সহিত অবতরণ করিতে লাগিলাম। যেন কে নির্জ্জনে সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। কিয়দ্দূর গমনের পর একটি প্রকাণ্ড কন্দরে উপনীত হইলাম। মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরাবলী প্রকোষ্ঠ আমি অনেক রাজভবনে দেখিয়াছি বটে কিন্তু এমনটি কোথাও কখনও দেখি নাই বা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। প্রস্তরময় পর্ব্বতগুহায় দণ্ডায়মান রহিয়াছি জানি কিন্তু দেখিতেছি কি? দেখিতেছি যেন চতুর্দ্দিকে দর্পণ-নিবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে আমি দণ্ডায়মান। আর ঐ সমস্ত প্রস্তর দর্পণ সহস্রাধারে আমার প্রতিকৃতি আঁকিয়া লইতেছে। এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অদ্ভুত স্বর্গোপম পবিত্র আশ্রম আমি আর কখনও দেখি নাই। হৃদয়ে আপনা হইতে একটি আনন্দ প্রবাহ সবেগে ছুটিতে লাগিল। ধমনীতে ধমনীতে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া শোণিত-তরঙ্গ নাচিতে লাগিল। মস্তক ঘুরিতে লাগিল। আনন্দে চক্ষু আপনা হইতে বুঝিয়া আসিতে লাগিল। যেন প্রথম নিদ্রা

আগম সুখে স্বপ্নে স্বর্গে একটি প্রকোষ্ঠ দেখিতেছি। এমন সময় সহসা—এ কি? গুহা-প্রকোষ্ঠের একটি পার্শ্ব হইতে শ্বেতশ্মশ্রুল সুদীর্ঘাবয়ব সুদৃঢ় সুঠাম সুরূপ বলবান অনিন্দ্য গৌরকান্তি কোমল অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এক মহাপুরুষ সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন! আমি আত্মহারা হইয়া নিমেষ মধ্যে মহাপুরুষের শ্রীচরণে পড়িয়া গেলাম।

তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তখনই কোথা হইতে সন্ন্যাসীর বেশধারী আর একটি বাঙ্গালি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে শুনিয়াছিলাম তিনি রঙ্গপুর জেলার সদরালা ছিলেন, এক্ষণে সংসার-বিরাগী পুণ্যপ্রয়াসী সন্ন্যাসী এবং যোগী। মহাপুরুষ আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, আমি তাঁহার প্রশ্নের যতদূর পারি উত্তর প্রদান করিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলেন আমি গৌড়ব্রাহ্মণ এবং সামবেদী। ভিন্ন বেদের গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, এ কথাও বলিলাম। তখন তিনি আমার দীক্ষা বীজ মন্ত্রটি বলিয়া দিলেন এবং অনেক গোপনীয় মনের কথা বলিয়া দিলেন। আমি বুঝিলাম যে যথার্থই একজন মহাপুরুষ আমার সম্মুখে উপস্থিত। আমি একেবারে অবাক্। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড অতীত হইয়াছে। চন্দ্রদেব উদয় হইয়াছেন। বিমল কৌমুদী সঞ্চারে জলস্থল আকাশ ও চতুর্দ্দিক রজতময়, বৃক্ষ লতা গুল্মাদি স্নেহময়। স্বভাবের কি অপূর্ব্ব শোভা! সদাগতি নৈশ কুসুমগন্ধভার বহনে আজ মৃদুগতি। নিসর্গসুন্দরী যেন স্নান করিয়া তপে বসিতেছেন। পরমাত্মার রাজ্য বটে!

মহাপুরুষ বলিলেন স্নান কর, এখন কথা থাক্। সেই সরোবরটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিলেন। আমি মহাবিপদে পড়িলাম। সেই দারুণ শীতে রাত্রিকালে সেই বরফজলে কি করিয়া স্নান করি। মনে হইল একেবারে জমিয়া যাইব। মহাপুরুষ মনের কথা বুঝিলেন, বলিলেন চেলা লোক করিবে। তখনই কোথা হইতে একটি দুইটি করিয়া চেলা লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাই সব করিলেন, আমার স্নানান্তে আমাকে একেবারে দুই তিনখানি কম্বলে জড়াইয়া ফেলিলেন। অগ্নি জ্বালিয়া আমাকে সেক দিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলাম।

তখন ইঙ্গিতমাত্রে একজন শিষ্য কোথা হইতে পুঁইশাকের ন্যায় কি

লতা আনিয়া দিলেন। দেবোদ্দেশে উৎসর্গের পর কিয়দংশ তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। আমাকে কিয়দংশ প্রদান করিয়া মহাপুরুষ আজ্ঞা করিলেন, "সৎকার লও, কুণ্ডলিনীকে উৎসর্গ করিয়া দাও"। বুঝিলাম রস পান করিতে বলিতেছেন। শিষ্যেরাই রস বাহির করিয়া দিলেন। আমি কুণ্ডলিনীকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া ধন্য হইলাম। শুনিলাম ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার আহার তৃষ্ণা শৌচক্রিয়া প্রভৃতির কোনরূপ চেষ্টা থাকিবে না। মনে মনে বুঝিলাম যে মহাপুরুষের কৃপায় আমি আজ দেবদুর্ল্লভ সোমরস পান করিয়া মানবজনম সার্থক করিতেছি। এইরূপে অতিথি সৎকার হইল।

অতিথিসৎকারের পর গুহামধ্যে কথারম্ভ হইল।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাধারণতঃ লোকে এক দেবতার মন্ত্র লইয়া সেই দেবতারই উপাসনা করিয়া থাকেন। সাধক মনে করেন সেই দেবতাই তাঁহার সকল দেবতা। তাই দেব রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন "কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী"। এ কথাও জানা আছে যে এক দেবতার উপাসনা করিয়া গেলেও সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে সাধককে একবার একবার সকল দেবতার সাধনা করিতে হয়। যিনি কালীমন্ত্রে দীক্ষিত, সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে দশ-মহাবিদ্যার প্রত্যেক বিদ্যারই সাধনা করিতে হইবে—তাহা ব্যতীত অপর দেবতাও আছেন। কি গূঢ় উদ্দেশ্য সংসাধন কল্পে ঋষিগণ এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বলা সুকঠিন নহে। কিন্তু এক্ষণে সে বিচারের আবশ্যকতার উপলব্ধি হইল না।

এখন পঞ্চায়তনী দীক্ষা বুঝিতে পারা যাইবে। "অনেক সিদ্ধবংশে* পঞ্চায়তনী দীক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই দীক্ষার নাম শুনিয়া অনেকে বিষম বিস্ময় বোধও করিয়া থাকেন—কারন শিব শক্তি সূর্য্য বিষ্ণু গণেশ এই

*তন্ত্রতত্ত্ব।

পঞ্চ দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পঞ্চ দেবতাকে সমান ভক্তিতে উপাসনা করা বড়ই বিড়ম্বনার কথা। সমান ভক্তিতে উপাসনা করিতে হইলে সত্য সত্যই বিড়ম্বনার কথা, বাস্তবিক কিন্তু সমানভাবে উপাসনা নহে। সকল উপাসকেরই উপাসনায় পঞ্চায়তন আছে। মণ্ডলের মধ্যস্থানে নিজ ইষ্টদেবতার এবং তাঁহারই চতুষ্পার্শ্বে অপর দেবতা চতুষ্টয়ের অধিষ্টান, তবে পঞ্চায়তনী দীক্ষায় বিশেষ এই যে তাঁহারা গুরু-মুখ হইতে পঞ্চ দেবতার মন্ত্রই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্য দীক্ষায় কেবল একের মন্ত্রই গৃহীত হইয়া থাকে। কোন এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই সাধকের সকল মন্ত্রে অধিকার জন্মে। যদি ও পঞ্চদেবতার মন্ত্রে দীক্ষার অভাবে সে অধিকারের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, তথাপি গুরুমুখ হইতে গ্রহণ করিলে সে অধিকার আরও শীঘ্র ফলপ্রদ হয়, এই পর্য্যন্ত বিশেষ। দ্বিতীয়তঃ সাধনসিদ্ধ অভিন্ন-বুদ্ধি কুলতিলক সাধকগণ নিজ ভবিষ্যবংশের কল্যাণ চিন্তায় ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, দেবদ্বেষ মহাপাতকে বংশ উৎসন্ন হওয়া বড়ই অপরিণামদর্শিতার ফল। তাই তাঁহারা পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, পঞ্চ দেবতার মন্ত্রেই দীক্ষিত হইতে হইবে, অর্থাৎ ইহা যেন কাহারও মনে না হয় যে আমি শাক্ত, বিষ্ণু আমার উপাস্য দেবতা নহেন, সুতরাং বিষ্ণুকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবার প্রয়োজন নাই, অথবা আমি বৈষ্ণব, শক্তি আমার উপাস্য দেবতা নহেন, সুতরাং শক্তির উপাসনা আমার পক্ষে বিফল। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই পঞ্চ উপাসনার অধিকার লাভ করেন। তান্ত্রিক দীক্ষায় সেই অধিকার ফলোন্মুখ হয় এই মাত্র বিশেষ। গায়ত্রী দীক্ষায় যে তত্ত্বের বীজবপন হয়, তান্ত্রিক দীক্ষা তাহারই অঙ্কুরিত অবস্থা। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

যাত্রাবলি বিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিক পর্ব্বসু
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রতধারণং।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ।

বার্ষিক সমস্ত পর্ব্বে আমার যাত্রা বলি বিধান (পূজানুষ্ঠান) বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষার গ্রহণ এবং আমার ব্রত ধারণ করিবে।

বৈদিক স্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়ানামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥

বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্র (পৌরাণিক) এই ত্রিবিধ আমার উপাসনা, সুতরাং বেদ তন্ত্র পুরাণ এই শাস্ত্র ত্রয়েরই বিহিত বিধির দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান্ এই বিধিকেই যুগভেদে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন—

শ্রুতি স্মৃতি বিধানেন পূজা কার্য্যা যুগত্রয়ে।
আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌচান্য বিধানতঃ॥

—কুব্জিকাতন্ত্র।

শ্রুতিবিহিত এবং স্মৃতিবিহিত বিধি দ্বারা সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে দেবগণের পূজা করিবে, কলিযুগে কেবল তন্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা দেবোপাসনা করিবে। তন্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উপাসনা করিলে দেবগণ প্রসন্ন হয়েন না।

তন্ত্রান্তরে আরও স্পষ্ট।

কৃতে তু বৈদিকো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্মতঃ।

সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, ত্রেতাযুগে স্মৃতি বিহিত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

তন্ত্রোক্তং ধ্যানমন্ত্রঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ।
বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে।
ন শস্তং চঞ্চলাপাঙ্গি কদাচিদ্ ভারতে কলৌ।

—পুরশ্চরণ রসোল্লাস।

অর্থাৎ কলিযুগে ভারতবর্ষে তন্ত্রোক্তধ্যানমন্ত্রই প্রশস্ত। হে চঞ্চলাপাঙ্গি, বরাননে! বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত এবং পুরাণোক্ত ধ্যান মন্ত্রাদি কলিযুগে ভারতবর্ষে কদাচ প্রশস্ত নহে।

বিনা হ্যাগমমার্গেন কলৌনাস্তি গতিঃপ্রিয়ে!
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

প্রিয়ে! আগমোক্ত পথ ভিন্ন কলিযুগে অন্য গতি নাই। শিবে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বে আমাকর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে জ্ঞানী আগমোক্ত বিধি দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন।

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধা স্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনা ইবোরগাঃ।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয় সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥

কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সমস্ত স্বতএব সিদ্ধ, শীঘ্র ফলপ্রদ, এবং জপ যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মে প্রশস্ত। বেদোক্ত মন্ত্র সকল সত্যাদি যুগে সফল ছিলেন, কলিযুগে তাঁহারা বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য এবং মৃতপ্রায়, ভিত্তিচিত্রিত পুত্তলিকা সকল সর্ব্বেন্দ্রিয় সমন্বিত হইলেও যেমন স্ব স্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপারে অসমর্থ, তদ্রূপ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র সমস্তও কলিযুগে স্ব স্ব কার্য্য সাধনে অসমর্থ।

ঠিক এই কথাই দেব রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছিলেন। বেদ-মন্ত্র ও বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন "বাদসাহী আমলের টাকা এখন আর চলে না"। কেবল একমাত্র গায়ত্রী সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না।

ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয় কর্ম্মণি॥
ততোত্র কথিতং দেবি! দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ।
গায়ত্র্যামধিকারোস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ॥
তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্‌ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ এই ব্রহ্মরূপিণী সাবিত্রী যেরূপ বৈদিকী, সেইরূপই তান্ত্রিকী, অর্থাৎ বৈদিক তান্ত্রিক উভয় কর্ম্মেই প্রশস্তা। দেবি সেই জন্যই প্রবল কলিকালে দ্বিজাতীগণের বৈদিকমন্ত্রের মধ্যে কেবল গায়ত্রীমন্ত্রেই নিত্যোপসনার অধিকার আছে। তাহাতেও কলিযুগে ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর আদিতে প্রণব, ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্মীবীজ, এবং বৈশ্যের সরস্বতী বীজ দিতে হইবে।

গায়ত্রী প্রথমা দীক্ষা আত্মজ্ঞান প্রদীপিকা।
অতোহি প্রথমা পূজা গায়ত্র্যাঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

দীক্ষানুসারেণ ততো হন্যঞ্চ সমুপাসতে।
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে চৈতত্তত্ত্বং প্রশস্যতে॥

—আগম সন্দর্ভ।

অর্থাৎ গায়ত্রী গ্রহণই আত্মজ্ঞান প্রবোধিকা প্রথমা দীক্ষা। অতএব প্রথমে গায়ত্রীরই উপাসনা, পরে তান্ত্রিক দীক্ষা অনুসারে অন্যের (ইষ্টদেবতার) উপাসনা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির পক্ষে ইহাই প্রশস্ত তত্ত্ব—অর্থাৎ প্রথমে উপনয়ন সংস্কারে গায়ত্রীদীক্ষা গ্রহণ করিয়াই পরে তন্ত্রানুসারে ইষ্টদেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারের অভাবহেতু একমাত্র তান্ত্রিক দীক্ষাই বিহিত। এই গায়ত্রী দীক্ষা বৈদিক হইলেও কলি যুগে তন্ত্রোক্তরূপেই গ্রাহ্য।

এখন দীক্ষার প্রয়োজন? শাস্ত্র বলেন প্রয়োজন আছে।

অনীশ্বরস্য মর্ত্তস্য নাস্তিত্রাতা যথা ভুবি।
তথা দীক্ষাবিহীনস্য নেহ স্বামী পরত্রচ॥

—দত্তাত্রেয় যামল।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে স্বীকার না করে জগতে তাহার যেমন কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, দীক্ষাহীন পুরুষেরও তদ্রূপ কি ইহলোকে কি পরলোকে রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই।

নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।
ন তীর্থক্ষেত্রগমনৈ র্ন চ শারীর যন্ত্রণৈঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ।

—কুলার্ণব।

অর্থাৎ অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা নিয়ম ব্রত তীর্থক্ষেত্রগমন শরীরসংযম প্রভৃতি কোন কার্য্যই সফল হয় না, অতএব সর্ব্ব প্রযত্ন সহকারে গুরু দ্বারা দীক্ষিত হইবে।

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথা চাদীক্ষিতানাঞ্চ মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতং॥

—গৌতমীয়।

অনুপনীত দ্বিজগণের যেমন নিজ কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার নাই এবং

উপনয়নের পরে যেমন তাহাতে অধিকার জন্মে, তদ্রূপ অদীক্ষিত দ্বিজগণেরও মন্ত্রজপ এবং দেবার্চ্চনা প্রভৃতিতে অধিকার নাই এবং দীক্ষার পরেই তাহাতে অধিকার জন্মে। অতএব উপনয়নের পরে দ্বিজগণ আত্মাকে শিবোক্ত (তন্ত্র) শাস্ত্রানুসারে পুনঃ সংস্কৃত করিবেন।

গুরুকরণ দীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে আরও কথা বলিবার আছে কিন্তু এক্ষণে মন্ত্র সম্বন্ধে বলিতে যে টুকু প্রয়োজন তাহাই দেখান হইল।

বৈদিক মন্ত্র কেবল গায়ত্রী সম্বন্ধে বলিয়াছি কিন্তু এতদ্ভিন্ন তন্ত্রোক্ত দশ সংস্কারাদি কার্য্যে যে সকল বৈদিক মন্ত্রের নির্দ্দেশ আছে, তান্ত্রিকবিধি প্রসঙ্গে মহেশ্বর মহেশ্বরীর মুখে তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে বলিয়াই সে সমস্ত মন্ত্র বৈদিক হইলেও তান্ত্রিক হইয়া গিয়াছে এজন্য কলিযুগে সে সকল মন্ত্র দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিফল হইবে না।

সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধি র্ন জায়তে।
নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাদ্ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি॥
অতো বিপ্রাদিভি র্বর্ণৈ স্ব স্ব বর্ণোক্ত সংক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ॥
জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃ পরং॥
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ।
শূদ্রানাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে॥
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ।
নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ॥
কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভব বর্ত্মনা।
যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু॥
পূর্বৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি নগ্না প্রিয়ে।
সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু॥
বিপ্রাদি বর্ণ ভেদেষু ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ।
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু তত্তৎ কর্ম্মসু কালিকে॥
প্রণবাদ্যাং স্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ।
কলৌ তু পরমেশানি! তৈরেব মনুভির্নরাঃ॥

মায়াদ্যৈ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ।
নিগমাগম তন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ॥
সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ।
অথোচ্যতে মহামায়ে! গর্ভাধানাদিকা ক্রিয়া॥
তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু।

অর্থাৎ দেবি! সংস্কার ব্যতিরেকে দেহশুদ্ধি হয় না, এজন্য অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে অধিকারী নহে, অতএব ইহপরকালের কল্যাণকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণকর্ত্তৃক নিজ নিজ জাত্যুক্ত সংস্কার সকল সর্ব্বথা যত্নপূর্ব্বক কর্ত্তব্য। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সম্বন্ধে এই দশ সংস্কার শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শূদ্র এবং শূদ্রভিন্ন (অধমশূদ্র)গণের উপনয়ন নাই, তাহাদিগের নয়টি মাত্রই সংস্কার, কেবল দ্বিজাতীগণের দশ সংস্কার। বরারোহে! এই দশ সংস্কার এবং এতদ্‌ভিন্ন নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য সমস্ত কর্ম্মই শাম্ভব পথ (তান্ত্রিক রীতি) অনুসারে সম্পন্ন করিবে। প্রিয়ে, যে যে কর্ম্মের যে যে বিধান, তাহা পূর্ব্বেই বেদকর্ত্তা ব্রহ্মার স্বরূপে আমা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। সমস্ত সংস্কারকার্য্যে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্যকর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে মন্ত্র সকলও প্রকাশিত হইয়াছে। কালিকে! সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেই সেই মন্ত্রের আদিতে প্রণব প্রয়োগ থাকিবে। পরমেশ্বরি! কলিযুগে শঙ্করশাসন (তন্ত্রশাস্ত্র) অনুসারে মানবগণ সেই সেই মন্ত্রেরই প্রথমে মায়াবীজ প্রয়োগ করিয়া সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। নিগম আগম তন্ত্র (গৌতম সনৎকুমার প্রভৃতি) বেদ এবং সংহিতা সমূহে সমস্ত মন্ত্র আমা কর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে। কেবল যুগভেদে তাহার প্রয়োগ পৃথক্ পৃথক্ হইবে। মহামায়ে! অনন্তর গর্ভাধানাদি ক্রিয়া কথিত হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথমে ঋতু-সংস্কার এবং তৎপরে ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয় শ্রবণ কর।

সর্ব্বথা সত্যপূতাত্মা মন্মুখেরিতবর্ত্মনা
সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোদিতান্॥ ১
দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণ তর্পণং
ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।

জাতকর্ম্ম তথা নাম চূড়াকরণ মেব চ।
মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতং॥ ২
তীর্থশ্রাদ্ধং কৃষোৎসর্গং শারদোৎসব মেব চ।
যাত্রাং গৃহ প্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদি ধারণং।
বাপী কূপ তড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ।
গৃহারম্ভ প্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা
দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃতাং তথৈব চ।
ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ.
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
ময়োক্তেন বিধানেন তৎসর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ॥ ৩
ন কুর্য্যাদ্ যদিমোহেন দুর্মত্যা শ্রদ্ধয়াপি বা
বিনষ্টঃ সর্ব্ব কর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ॥ ৪
যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি! প্রবলে কলৌ
যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্‌ভবেৎ॥ ৫
মন্মতা সম্মতা দীক্ষা সাধক প্রাণ ঘাতিনী।
পূজাপি বিফলা দেবি! হুতং ভস্মার্পণং যথা।
দেবতা কুপিতা তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥ ৬
কলিকালে প্রবৃদ্ধেতু জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে।
যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ৭
ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ৮
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তো ব্রাত্যো মানবকো ভবেৎ।
কেবলং সূত্র বাহোঽসৌ চাণ্ডালাদধমোপি সঃ॥ ৯
উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা।
উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে।
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে॥ ১০
তদ্ধস্তাদন্নতোয়াদি নৈব গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ।
পিতরোপি ন গৃহ্ণন্তি যৎ স্তৎ মলপূয়বৎ॥ ১১
তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ।
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাধিকারস্ত জায়তে॥ ১২

অশাস্তবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনং চরেৎ।
ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন।
ইহামূত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ॥ ১৩
আগমোক্ত বিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ
তত্তোয়ং শোনিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ
তস্মান্মর্ত্ত্যঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ॥ ১৪
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
অশাস্তবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি! নিরর্থকং॥ ১৫
অস্তু তাবৎ পরোধর্ম্মঃ পূর্ব্ব ধর্ম্মোপি নশ্যতি।
শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ॥ ১৬
মদুদীরিতমার্গেন নিত্যনৈমিত্ত কর্ম্মণাং।
সাধনং যন্মহেশানি! তদেব তবসাধনং॥ ১৭
বিশেষারাধনং তত্র মন্ত্রযন্ত্রাদি সংযুতং
ভেষজং কলিরোগানাং শ্রূয়তাং গদতো মম॥ ১৮

"সর্ব্বথা সত্য আচরণে পবিত্রাত্মা হইয়া কলিযুগে মানবগণ মনুমুখনির্গতপথ (তন্ত্র) অনুসারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ, তর্পণ, ব্রত (উপনয়ন), বিবাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃশ্রাদ্ধ এ সমস্তই তন্ত্রানুসারে নির্ব্বাহ করিবে। ২ তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদীয় উৎসর, যাত্রা গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্রাদি ধারণ, বাপী কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, প্রতিপদাদি প্রত্যেক তিথি বিশেষে বিহিত কর্ম্ম, গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতাস্থাপন, দিবাকৃত্য, রাত্রিকৃত্য, পর্ব্বকৃত্য, ঋতুকৃত্য, মাসকৃত্য, বর্ষকৃত্য এতদ্ভিন্ন যাহাকিছু নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য এবং ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য সে সমস্তই মনুমুখ কথিত বিধান অনুসারে সাধন করিবে। ৩। মোহবশতঃ বা দুর্ম্মতি বা অশ্রদ্ধা বশতঃ যদি এই সকল কার্য্য তান্ত্রিক বিধানানুসারে নির্ব্বাহ না করে, তবে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া জীব পরলোকে বিষ্ঠারাশি মধ্যে কৃমিজন্ম লাভ করে। ৪। মহেশ্বরি প্রবল কলিকালে যদি আমার মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে,

তাহাই তাহার বিপরীত ফলের নিমিত্ত হইবে। ৫। কলিযুগে মন্ত্রতের অসম্মতা (শাস্ত্রান্তরে উক্তা) দীক্ষা সাধকের প্রাণঘাতিনী হইবে। তাহার অনুষ্ঠিত পূজা বিফলা এবং তৎকৃত হোম ও ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে, দেবতা তাহার প্রতি কুপিতা হইবেন এবং পদে পদে তাহার বিঘ্ন ঘটিবে। ৬। অম্বিকে! কলিকালে প্রবৃদ্ধ হইলে আমার নিজ মুখনির্গত শাস্ত্রের আজ্ঞা জানিয়াও যদি অন্য শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠাতা মহাপাতকী হইবে। ৭। বিশেষতঃ উপনয়ন এবং বিবাহ যদি অন্য মার্গ দ্বারা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব কাল পর্য্যন্ত মানব ঘোর নরকে বাস করিবে। ৮। অন্য শাস্ত্রানুসারে উপনয়ন হইলে সে উপনয়নে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে, উপনীত মানবক ব্রাত্য (পতিত) এবং চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইয়া নিজ কণ্ঠে সূত্র মাত্র বহন করিবে। ৯। অন্য শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ হইলে সেই বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মতঃ গর্হিতা হইবে। কুলনায়কে! বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পাপী হইবে। সেই স্ত্রীতে গমন করিলে তাহার বেশ্যাগমন জন্য পাপ দিনে দিনে সঞ্চিত হইবে। ১০ তাহার স্বহস্তদত্ত অন্নতোয়াদি দেবগণ এবং পিতৃগণ গ্রহণ করিবেন না, যেহেতু তাহার অন্ন মলবৎ জলপূয়বৎ। ১১। সেই স্ত্রীপুরুষ উভয়ের অংশে উৎপাদিত সন্তান কানীন (অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত) এবং সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইবে, দৈবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে এবং কুলাচারে, তাহার অধিকার হইবে না। ১২। শাম্ভব (শম্ভু কথিত) পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি দেবতার স্থাপন করে, তাহা হইলে সেই দেবমূর্ত্তিতে কখনও দেবতার আবির্ভাব হইবে না, সুতরাং পরলোকের জন্য তাহাতে কোন ফল নাই, ইহলোকের ফলের মধ্যেও কেবল কায়ক্লেশ ও ধনক্ষয়। ১৩। 'আগমোক্ত বিধি পরিত্যাগ করিয়া যদি নর শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ বিফল হইবে এবং শ্রাদ্ধকারী পুরুষ পিতৃলোকের সহিত নরক গমন করিবে। তাহার দত্ত জল শোণিত সমান এবং তাহার পিণ্ড মলময় হইবে, এজন্য মানব প্রযত্ন সহকারে শঙ্করনির্দ্দিষ্ট মত আশ্রয় করিবে। ১৪। দেবি! অধিক আর কি বলিব, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, শাম্ভব পথ পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, সে সমস্তই নিরর্থক হইবে। ভাবীধর্ম্ম দূরে থাক্, পূর্ব্ব ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, শাম্ভব-আচারহীন হইলে নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। ১৬। মহেশ্বরি! মদুক্ত

পথ অনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান, তাহাই তোমার সাধন, তন্মধ্যে তোমার মন্ত্র যন্ত্রাদিযুক্ত যে আরাধন, তাহাই বিশেষ সাধন, কলিকাল জন্য ভবরোগের সেই মহৌষধ আমি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ত্রৈলোক্যকল্যাণনিধান ভগবানের এই সকল আজ্ঞা অনুসারে সাধকবর্গ ইহাও দেখিয়া লইবেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের বিপুল প্রচারের অভাবে আর্য্যজাতির কি অপরিবর্ত্তনীয় সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে।"

তন্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা কত? অনেকেরই মত এক লক্ষ। কেহ কেহ বলেন এক লক্ষরও অধিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখনও নব নব তন্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে। পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য এই স্থানে প্রচলিত তন্ত্র গ্রন্থ সকলের আংশিক নামোল্লেখ হইল।

তন্ত্রের নাম।

অ

অদ্বৈত তন্ত্র, অন্নদা কল্প, অন্নপূর্ণা কল্প, অঘোর ভৈরব, অঘোর ভৈরবী, অভিচারকবচ।

আ

আকাশ ভৈরব, আগমসঙ্কল্পদ্রুম, আগমতত্ত্ববিলাস, আগমদ্বৈতনির্ণয়, আগমসন্দর্ভ, আগমসার, আদিত্যহৃদয়, আগমার্ণব।

ই

ইন্দ্রজালতন্ত্র।

উ

উত্তরকামাখ্যা, উত্তরতন্ত্র, উৎপত্তি তন্ত্র, উমাযামল, উড্ডামরেশ্বর, ঊর্দ্ধাম্নায়।

এ

একজটা, একবীরাতন্ত্র, একবীরাকল্প।

ক

কালীবিলাস, কঙ্কালমালিনী, কালীতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, কামধেনুতন্ত্র, কালীকুলসর্ব্বস্ব, কুমারীতন্ত্র, কৃকলাস দীপিকা, কালোত্তর, কুব্জিকাতন্ত্র, কুলোড্ডীয়, কুলার্ণব, কুলমূলাবতার, কুলসূত্র, কমলাতন্ত্র, কমলা বিলাস, কাত্যায়ণীতন্ত্র, কালিকার্চ্চন চন্দ্রিকা, কালীকল্প, কালীকুসদ্ভাব, কালীকুলামৃত, কালীকুলার্ণব, কালীক্রম, কালীহৃদয়, কুমারীকল্প, কুলচূড়ামণি, কুল

প্রকাশ, কুলসার, কুলসুন্দর, কুলাচার, কৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা, কৌলার্চ্চনদীপিকা, কৌলাবলী, কর্ণ ভৈরব, কালীকোল্লাস, কুলকল্পলতা, কামাখ্যাদর্পণ, কৌমারীবিলাস, কামরূপদীপিকা, কামেশ্বর তন্ত্র, কামাখ্যাপ্রয়োগ, কাত্যায়নীকল্প, কৌলকৃত্য তত্ত্ব, কৃত্যাতত্ত্ব, কৃত্যাপ্রয়োগ, ক্রমচন্দ্রিকা, ক্রমদীপিকা, ক্রিয়াযোগসার, ক্রিয়াসার।

গ

গণেশবিমর্ষিনী, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, গায়ত্রীতন্ত্র, গুপ্তদীক্ষা, গুপ্তসাধন, গুপ্তার্ণব, গুরুতন্ত্র, গূঢ়ার্থদীপিকা, গৌতমীতন্ত্র, গৌরীযামল, গৌরীতন্ত্র।

ঘ

ঘেরণ্ডসংহিতা।

চ

চিন্তামণি, চীনাচার, চক্রবিচার, চীনতন্ত্র যামল, চণ্ডিকার্চ্চন চন্দ্রিকা, চামুণ্ডা তন্ত্র, চক্রেশ্বর, চক্রমুকুর।

ড

ডামর, ডামরসূত্র।

ত

তোড়লতন্ত্র, তারারহস্য, তন্ত্রকৌমুদী, তন্ত্রচূড়ামণি, তন্ত্রদীপিকা, তন্ত্রপ্রমোদ, তন্ত্ররত্ন, তন্ত্ররাজ, তন্ত্রসাগরসংহিতা, তন্ত্রসার, তন্ত্রাদর্শ, তান্ত্রিকদর্পণ, তারাখণ্ড, তারানিগম, তারাতন্ত্র, তারাপ্রদীপ, তারাভক্তিসুধার্ণব, তারার্ণব, তারাসার, ত্রিপুরাকল্প, ত্রিপুরার্ণব, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, ত্রৈলোক্যসম্মোহন, ত্রিপুরাসার।

দ

দক্ষিণামূর্ত্তি, দক্ষিণামূর্ত্তিকল্প, দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা, দত্তাত্রেয়যামল, দুর্গাকল্প, দেবীযামল, দেব্যাগম।

ন

নির্ব্বাণতন্ত্র, নবরত্নেশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, নীলতন্ত্র, নারায়ণায়ক, নিরুত্তর, নারদীয়, নিগমতন্ত্র, নৃসিংহকল্প, নিগমতত্ত্বরত্ন, নির্ব্বাণসংহিতা, নিবন্ধতন্ত্র, নাগাদিন, নিগমকল্পদ্রুম, নিগমকল্পলতা, নিগমসার, নন্দিকেশ্বর সংহিতা, নারদপঞ্চরাত্র, নারায়ণীতন্ত্র, নিগমকল্পসার, নিগমতত্ত্বসার, নিত্যাপ্রয়োগসার।

প

পুরশ্চরণ রত্নোল্লাস, পুরশ্চরণ চন্দ্রিকা, পিচ্ছিলা তন্ত্র, প্রপঞ্চসার, পারমেশ্বর তন্ত্র, পরমহংস পটল, পরদেবী রহস্য, পুরশ্চরণ বোধিনী, পূজাসার, প্রয়োগসার, পীঠরত্নাকর, পার্ব্বতীতন্ত্র।

ফ

ফেরুতন্ত্র, ফেৎকারিণী।

ব

বীরভদ্র, বীজচিন্তামণি, বিশ্বসার, বরদা তন্ত্র, বাসুদেব রহস্য, বারাহী, বৃহদ্ গোতমীয়, বর্ণোদ্ধৃতি, বিষ্ণুযামল, বৃহন্নীল, বৃহদ্‌যোনি, বিষ্ণুরহস্য, বামকেশ্বর, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মযামল, বর্ণবিলাস, বুদ্ধতন্ত্র, বালাবিলাস, ব্রহ্মাণ্ড, বামদেব, বর্ণ ভৈরব, বায়বীয়সংহিতা, বিদ্যানন্দ নিবন্ধ, বিদ্যোৎপত্তি, বিমলা, বীরতন্ত্র, বৃহৎতন্ত্রসার, বৃহত্তোতলা, বৃহৎশ্রীক্রমসংগ্রহ, বৃহদ্রুদ্রযামল, বৃহন্নির্ব্বাণ, বৃহন্মায়াতন্ত্র, বেহায়সী মন্ত্রকোষ, ব্যোমকেশ সংহিতা, ব্যোমরত্ন, বিজয়া।

ভ

ভৈরবতন্ত্র, ভৈরবী, ভূতডামর, ভগবদ্‌ভক্তিবিলাস, ভাবচূড়ামণি, ভীমপরাক্রম, ভুবনেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী পারিজাত, ভূতশুদ্ধি, ভৈরবকোষ, ভৈরব যামল, ভৈরব সংহিতা, ভৈরবানন্দসার।

ম

মুণ্ডমালা, মহিষমর্দ্দিনী, মায়াতন্ত্র, মাতৃকাভেদ, মাতৃকোদয়, মহানির্ব্বাণ, মালিনীবিজয়, মহানীল, মহাকাল সংহিতা, মৎস্যসূক্ত, মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশ, মন্ত্রদর্পণ, মন্ত্র মহোদধি, মন্ত্র মুক্তাবলী, মন্ত্ররত্ন, মন্ত্ররত্নাবলী, মহাকপিল পঞ্চরাত্র, মহাকাল মোহিনী, মহানীল, মহালিঙ্গেশ্বর, মানসোল্লাস, মালিনী, মৃড়াণী, মেরু, মাতঙ্গী।

য

যক্ষিণী, যোগিনী, যোনি, যোগসার, যোগার্ণব, যোগিনীহৃদয়, যোগস্বরোদয়, যক্ষডামর, যোগচিন্তামণি।

র

রাধাতন্ত্র, রেবতী, রুদ্রযামল, রামার্চ্চণ চন্দ্রিকা, রাজরাজেশ্বরী, রেবা।

ল

লক্ষসাগর, লক্ষ্মীকুলার্ণব, লিঙ্গার্চ্চণ।

শ

শাবর, শক্তিসঙ্গম, শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব, শক্তিযামল, শক্তি, শম্ভুসংহিতা, শাক্তক্রম, শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী, শাম্ভবী, শারদা, শ্যামা রহস্য, শারদাতিলক, শাশ্বত তন্ত্র, শিখরিণী, শিবতাণ্ডব, শিবধর্ম্ম, শিবরহস্য, শিবসংগ্রহ, শৈবরত্ন, শৈবাগম, শ্যামাকল্পলতা, শিবসূত্র, শ্যামা প্রদীপ, শ্যামার্চ্চণ চন্দ্রিকা, শ্যামাসপর্য্যাক্রম, শ্যামাসপর্য্যাবিধি, শ্রীকুলার্ণব, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শ্রীরাম সংগ্রহ, শ্যামাসপর্য্যা।

ষ

ষোড়শী সংহিতা, ষট্‌কর্ম্মদীপিকা, ষট্‌কর্ম্ম দীধিতি।

স

সরস্বতী তন্ত্র, সারদা, স্বতন্ত্র, সম্মোহন, সনৎকুমার, সারচিন্তামণি, স্কন্দযামল, সারসংগ্রহ, সারসমুচ্চয়, স্বারস্বত, সিংহবাহিনী, সিদ্ধলহরী, সিদ্ধবিদ্যাদীপিকা, সিদ্ধান্তসার, সিদ্ধেশ্বরী, সোমশম্ভু, সচ্ছন্দমাহেশ্বর, সিদ্ধি তন্ত্র, সময়া, সময়াপরতন্ত্র।

হ

হংস, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, হরগৌরী সংবাদ, হনুমৎ কল্প।

জ্ঞ

জ্ঞান, জ্ঞানার্ণব।

তুমি।

তুমি বুঝি ভেবেছ এখন,—
প্রেম পুণ্য প্রীতি আঁকা,
মন্দার-মাধুরী মাখা,
সেই যে অমৃতময় তোমার বদন,—
হইয়াছি চির তরে আমি বিস্মরণ!

সে মুখ কি ভুলিবার হায়,—
কোন মূর্খ হেন অন্ধ,
লভিবে পরমানন্দ,
অমূল্য পরশমণি দলিয়া হেলায়।
কেমনে ভুলিব সখি! ভোলা নাকি যায়?

আঁখি মাঝে ওই রূপ রাশি,
নীরব প্রহরী মত,
জাগিতেছে অবিরত,
ও অমৃত গন্ধ আসে মলয়ায় ভাসি।
জ্যোছনা তোমারি কথা নিতি কহে আসি।
প্রকৃতির মধুমাখা বাঁশী,
আসিয়া কানের মাঝে,
ওই নাম লয়ে বাজে,
বাঁধে এ পরাণ দিয়া কি অজানা ফাঁসী!
সাধে কি উধাও প্রাণ এতই উদাসী।
রও তুমি দূর নিরালায়,
বিরহের গলা ধ'রে,
অসীম সোহাগ ভরে,
মিলন লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়।
শত বা সহস্র দূর কিবা আসে যায়।
এইত মিলন মধুময়,—
নাহি ইথে হা হুতাশ,
প্রাণ ভাঙা দীর্ঘ শ্বাস,
নাহিক কামনা গন্ধ নাহি লোক ভয়।
দেবত্ব মাধুরী নিতি এ মিলনে বয়।
নাহি চাই ধরার মিলন,
আমি চাহি হেন রূপে,
হৃদি মাঝে চুপে চুপে,
ও চরণে ডুবে যাবে এ তুচ্ছ জীবন।
হৃদয়ে এমনি তুমি দিবে দরশন।
আমি চাহি এমনি মিলন,
হবে না চোখের দেখা,
মরমে মরমে লেখা,

লক্ষ যোজনেতে রবি নলিনী যেমন।
তা'তেই অমৃতানন্দে মাতিবে জীবন।
তুমি শুধু জাগিবে হিয়ায়,
যেন কভু ভালবেসে,
দাঁড়ায়োনা কাছে এসে,
ভালবাসিবারে শুধু দিওগো আমায়,
মানসেতে পুষ্পাঞ্জলি আমি দিব পায়।
তুমি কাছে হেরিলে আমায়,—
সুধায়োনা স্নেহ-বোলে,
যেয়োগো চরণে দ'লে,
করোনা ব্যেনেনী মোরে প্রেম-ব্যবসায়।
(তুমি শুধু) প্রেম-প্রতিমা হ'য়ে ব'সো এ হিয়ায়।

মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা রচয়িত্রী।

কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল।

চট্টগ্রামের প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আমরা হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ, বাণযুদ্ধ, একাদশীমাহাত্ম্য, ধ্রুবচরিত্র, ধর্ম্মেতিহাস, মনসামঙ্গল, তুলসীচরিত্র, রাধিকামঙ্গল, সূর্য্যব্রত পাঁচালী, হরিবংশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ পুঁথি ছাড়া বহুতর চৌতিশাখ্য সন্দর্ভ ও প্রাচীন পদাবলী ও বার মাস্যা হস্তগত হইয়াছে। এ সকল ব্যতীত চট্টগ্রামে মুদ্রিত মুসলমান মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজির গ্রন্থ সকল পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুত্বের বহির্ভূত বিষয়েও রাশি রাশি প্রাচীন অপ্রকাশিত পুঁথি এখানে পাওয়া যায়। লয়লা মজনু, মুক্তল হোছন, মুছার ছওয়াল, যোগকলিন্দর, সিরাজকুলুপ প্রভৃতি। এ সকল অধিকাংশই ইস্‌লাম ধর্ম্মনীতি এবং জ্ঞানগর্ভ পরমার্থ-উপদেশসম্বলীয়। সকল গ্রন্থের ভাষাই প্রাচীনকালের খাঁটি বাঙ্গালা। লয়না মজনুর

মুখবন্ধে সুকবি দৌলত উজির চট্টগ্রামের এক অদ্ভুত প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের নিকট যে পুঁথিখানি আছে, তাহার একখানি পাত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। উক্ত কবিকৃত এই গ্রন্থের অন্য একখানি নকলও সুপ্রাপ্য নহে।

চট্টগ্রাম কবিত্বের প্রিয় নিকেতন। ইহার প্রাকৃতিক সুষমা কবিপ্রতিভার বিকাশ পক্ষে উপযোগিনী। প্রাচীনকালে চট্টগ্রামের প্রতি পল্লীতেই একজন না একজন কবি জন্মিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম সেই দেবদুর্লভ কবি-প্রতিভার ক্রমিক অভিব্যক্তি জগৎকে দেখাইয়া আসিতেছেন। আমাদের সাগরাম্বরা পার্ব্বতী চট্টগ্রামভূমি কল্যাণী। চট্টলের কিম্বদন্তীতে ইহাকে "পরীস্থান" বলে। কল্যাণীর কল্যাণময় গর্ভে কত কত "ঈশ্বরের শিষ্য" জন্ম গ্রহণ করিয়া কালসাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? কালের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া যাঁহারা আজও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা আজও অপরিজ্ঞাত—অনাদৃত! তাঁহাদের আজও কোন সদ্গতির উপায় দেখি না। না, এ স্বার্থবিষেভরা বাঙ্গালায় তাঁহাদের মুক্তি নাই। অহো! আজ কিনা সেই কবিগণ সামান্য হাড়ি-ডোমের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসংখ্য কীটের আহার যোগাইতেছেন!

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় "রাধিকামঙ্গল" নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার রচয়িতার নাম কৃষ্ণরাম দত্ত। কবির এই নামটুকু ভিন্ন অন্য কোনরূপ পরিচয় গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কৃষ্ণরাম দত্তে কহে রাধিকামঙ্গল।
শুনিলে পাতক হরে শরীর নির্ম্মল॥

এবং কোথাও বা,— রাধিকামঙ্গল গীত রস অনুপাম।
পাইতে পরমপদ ভণে কৃষ্ণরাম॥

গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই রকম ভণিতা। প্রাচীনকালে কবিগণ কাহারো না কাহারো আদেশে, উপদেশে বা অনুরোধে অথবা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কাব্য লিখিতেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। তখন দেশের ধনপতিরা সকলেই কবিগণকে বিশেষ সমাদর করিতেন। কিন্তু হায়! আজ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন ঘরের পয়সা খরচ করিয়া কবি হইয়া কেবল সমালোচনার তাড়না ভিন্ন কবির আর লাভ কিছু আছে কি?

এই গ্রন্থে নানাবিধ রাগরাগিণীসহ কেবল পয়ার ও ত্রিপদীছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। ত্রিপদী ছন্দে কোনরূপ যতিবৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। নিম্নে যতি ভঙ্গের দৃষ্টান্ত দেখুন—

(১) কি ক্ষেণে হরিয়া নিল যাদব জগদীশ।
তার মুণ্ডেতে ভাঙ্গি পড়ুক কুলিশ॥
(২) ভয়ে কম্পমান হৈল যতেক গোপগণ।

প্রশ্নের 'কি' শব্দের স্থলে সর্ব্বত্র 'নি' লিখিত হইয়াছে। যথা—

'কুশলে নি,' 'আর নি,' 'তবে নি'।

যাদু, গোয়ালগণ, বন্ধুরে, রাখাল, আজি, গোবিন্দ, মোর, মা, কেলায়, প্রভৃতির পরিবর্ত্তে কোথাও বা যতিভঙ্গ ভয়ে যাদুয়া, গোয়ালেরগণ, বন্ধরে, রাখোয়াল, আজুকা, গোবিন্দাই, মোহর, মাও, পেলায় লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—

(১) কোলের যাদুয়া, লৈ গেল হরিয়া, মরি মুই দুঃখ লাগি।
(২) হেন কালে দেখিলেক গোয়ালেরগণ।
(৩) আর নি বন্ধরে মুই দেখিমু নয়নে।
(৪) ধেনু চরাইতে ফেরে সঙ্গে রাখোয়াল।
(৫) আজুকা হইব শূন্য গোয়াল নগর।
(৬) পৃথিবীতে তবে মুই রহিতে নাই ঠাঁই।
অশেষ বিশেষ দুঃখ দিছে গোবিন্দাই॥
(৭) মনে ভাবে মোহর পুরাইল মনোরথ।
(৮) কে মোরে বলিব মাও কার মুখ চাইমু।

এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহা আর এখন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন,—আওয়াস, সঙ্গিতা, খাঁথার, উয়ারি, ছাওয়াল, দড়াইনু, ঠান, পাতিয়ান, ঝাটাই, অথান্তর, মেলানি।

আওয়াস=গৃহ; যথা,—"আওয়াস বাহির হৈল হইয়া সন্তোষ"।

এই শব্দটী "পদ্মাবতী"তে কবিবর আলাওল সাহেব ও ব্যবহার করিয়াছেন—

"তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আওয়াস।
সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ॥"

সঙ্গিতা—এই শব্দটী যে 'সংহিতা' শব্দের দুষ্ট উচ্চারণ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

খাঁখার = কলঙ্ক। "দুই কুলে করিল খাঁখার"।

উয়ারি = গৃহ। "কাঞ্চনে জড়িত সব নগর উয়ারি।
ইন্দ্রমণি স্তম্ভ যেন স্তম্ভ সারি সারি॥"

কবিবর দৌলত কাজির রচিত "লোর চন্দ্রানী"তে এই শব্দটী একাধিকবার প্রযুক্ত হইয়াছে। "মোর ঘরে আন যদি সেই বনচারী।
পুড়িয়া করিব ছালি সকল উয়ারি॥"

ঠান = শোভা; "রাধার শরীর তেজ অপরূপ ঠান।
দেখিয়া সকল লোক ভয়ে কম্পমান॥"

"পদ্মাবতীতে" যথা,—"দেখিয়া বদন ঠান মনে ধন্ধ বাসি।
দিনে দিনে ক্ষীণ হয় পূর্ণিমার শশী॥"

চট্টগ্রামের প্রাচীন পদাবলীতে যথা;—

"অধর রঙ্গিমা, ভুরুর ভঙ্গিমা,
চূড়াটী বান্ধ্যাছে ঠানে॥"

ঝাটাই = ঝটিতি, যথা,—

"কুবুজিকে সম্বোধিয়া বোলে দুই ভাই।
অগরু চন্দনগন্ধ দেয়ত ঝাটাই॥"

অথান্তর = বিপদ, জঞ্জাল কিন্তু এখানে অন্যথা।

যথা; "দিব্য করি কহি আমি নহে অথান্তর।"

এবং "তোমার বচন কিছু নহে অথান্তর।"

পাতিয়ান = আশ্বাস, প্রবোধ।

মেলানি = বিদায়।

সপ্তম্যন্ত 'স্থানে' স্থলে কোথাও 'স্থানএ,' প্রথমান্ত "রাধিকা" স্থলে "রাধিকাএ" প্রথম পুরুষের ক্রিয়া 'খেলায়' স্থলে 'খেলাই', 'হইবে' স্থলে 'হইব', ষষ্ঠ্যন্ত 'মোর' স্থলে 'মোহে' এবং কর্ত্তায় প্রায়ই সপ্তমী ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, ব্যাসের স্থানএ', 'যেন মতে রাধিকায় ভাবিলা সন্তাপ।' 'আজুকা হইব শূন্য গোয়াল নগর।' "হেন না করিও সখি দিব্য লাগে মোহে।" "ইন্দ্রে পাইল লাজ।" ইত্যাদি।

কি হবে উপায় স্থলে কি হউক উপায় এবং 'আমার চেয়ে' অর্থে 'আমাতু' ব্যবহৃত হইয়াছে। এই 'আমাতু' 'তোমাতু' প্রভৃতি চট্টগ্রামে এখনও ব্যবহার হইয়া থাকে।

বন্দি, করি, শুনেন, বঞ্চিনু, যাইব, হৈতে, দেখি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র, বন্দোঁ বা বন্দম, করোঁ, শুনেন্ত, বঞ্চিলুম্ বা বঞ্চিলু, যাইমু হোন্তে, দেখম্ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বালক অর্থে বালা শব্দের বহুবার ব্যবহার হইয়াছে। যথা,—

'মায়া করি নন্দবালা হরিলেন চেন।'

'নিষ্ঠুর নন্দের বালা, বাহিরে ভিতরে কালা,
তার সঙ্গে পিরীতি বিষম।'

'ডাকাইত নন্দের বালা কথা বোলে মন্দ।'

গ্রন্থকার কোথায় বসতি করিতেন, তাহা কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাঁহার ব্যবহৃত অনেক শব্দ এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সাহিত্যবিদ্ মাত্রেই জানেন, প্রাচীন কবিগণ সকলেই গড্ডালিকা প্রবাহের মত একে অন্যের পদানুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় বিস্তর সাদৃশ্য আছে। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধেও তাই। তবে ইহার উৎপত্তি স্থান কোথায়? যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সংসার খুজিয়াছেন, তাঁহারা ইহা প্রাপ্ত হয়েন নাই। বোধ হয়, ইহা চট্টগ্রামেই রচিত হইয়াছে। কারণ এইখানে ইহার ৩।৫টী কপি ইতিমধ্যে বাহির হইয়াছে।

কবি সংস্কৃত জানিতেন। সংস্কৃত না জানিলে এমন বাঙ্গালা লেখা অসম্ভব। রচনা সরল, প্রাঞ্জল এবং সাধাসিধে। স্থানে স্থানে মধুর।

নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধার করিলাম—
শ্রীরাধিকা উদ্ধবকে বলিতেছেন।

শ্রীরাগ।

যখনে কালীয়া চান্দ আছিল কিশোর।
কামিনীমোহনবেশে চিত্ত নিল মোর॥
যমুনা জলেতে যাইচে যত গোপীগণ।
বাজায় মোহন বাঁশী থাকি বৃন্দাবন॥
শরীর পুলক হয় মুরলীর সানে।
মরম বিদরে মীন কেবল কৃপনে॥

যদি সে জানিতুঁ মুই না হইতুঁ ক্ষেম।
তবে কেনে তার সনে বাড়াইতুঁ প্রেম॥
কি খেণে পিরীতি কৈল চিকনিয়া কালা।
গলায় গাঁথিয়া দিল কলঙ্কের মালা॥
আমার পরশমণি বিধি নিল হরি।
হেন সাধ করে মনে বিষ ভক্ষি মরি॥

*　　*　　*
*　　*　　*

অবশ্য ত্যজিমু প্রাণ নাথের যে শোকে।
হৃদয়ে রহিল দুঃখ হাসিবেক লোকে॥
কৃষ্ণরাম দত্তে কহে শুন ধনি রাই।
তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী নাগর কানাই॥
সেই যে নিলাজ কালা কত জানে কান্দ।
যখনে পিরীতি কৈল হাতে দিয়া চান্দ॥
যখনে আমারে ছাড়ি গেল দূর দেশ।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হৈল শেষ॥
এথাতে আসিয়া প্রভু রহিত মধুপুরী।
চরণে চিকুর বান্ধি নহি দিতুঁ ছাড়ি॥
মথুরার পুরীখান মোর অঙ্গে বিষ।
পাপিষ্ঠ লোকের হিয়া পাষাণ সদৃশ॥
ইন্দু বিনে কুমুদ কোথাতে পরকাশ।
জলধর বিনে যেন চাতক নৈরাশ॥
দিনমণি বিনে যেন ব্যর্থ অরবিন্দ।
কেমতে রহিব ঘরে বিদেশে গোবিন্দ॥
হতভাগ্যবতী আমি জীবনের ধিক্।
হতে হোন্তে হারাইলু রসের মাণিক॥

*　　*　　*
*　　*　　*

সিন্ধুরাম দুন করি বিধু করি দূর।
আনল ভরিয়া মুই ভক্ষিমু প্রচুর॥

*　　*　　*

রাগ—ধানশী।

উদ্ধব হে হাম নারী কেমন মুগধী।
প্রভু গেল দূর দেশ,　　ভাবিতে পাঞ্জর শেষ,
কেনে হেন কৈল মোরে বিধি॥
স্মরিয়া পূর্ব্বের নেহা,　　বিদরে দারুণ দেহা,
পুড়িয়া মরিমু শোকানলে।
কহিও বান্ধব আগে,　　রাধার শপথ লাগে,
নির্ব্বাণ করউক প্রেমজ্বালে॥
নহে বা ত্যজিমু প্রাণ,　　মনে কৈলু অনুমান,
নারিবধ রহিব তাহায়।
কি মোর কর্ম্মের লেখা,　　পুনি না হইল দেখা,
তবে নাকি হইব উপায়॥
নিষ্ঠুর নন্দের বালা,　　বাহিরে ভিতরে কালা,
তার সঙ্গে পিরীতি বিষম।
সাধিয়া আপনা কাজ,　　পরিণামে দিলা লাজ,
কামশরে বিদরে মরম॥
কৃষ্ণরাম দত্ত বাণী,　　শুন রাধা ঠাকুরাণি,
প্রেম না ছাড়িব নারায়ণ।
তুমি বড় ভাগ্যবতী,　　ভজিলা অখিলের পতি,
পাইবা প্রভুর দরশন॥

আমরা বাছি নাই। গ্রন্থের সর্ব্বত্র এ রকম সুললিত রচনা। কোন্ স্থানটী রাখিয়া কোন্ স্থান উদ্ধৃত করিব, ভাবিয়া পাই না। এই নমুনা হইতেই কবির কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ব্রজপুরী হইতে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, শ্রীরাধিকা প্রিয়সখী শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করেন। শ্রীমতী যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তীব্র গঞ্জনাবাক্য বলিয়াছিলেন।

শ্রীমতী বোলেন প্রভু কর অবধান।
কৃপা করি সুন্দরীরে প্রাণ দেও দান॥

জানিলু রাধিকা হোন্তে পাইছ রুপসী।
নয়নেগোচরে দেখি কাসি আর কুসী॥
যতেক রমণী তোর রাধিকার দাসী।
এহাতে ভুলিয়া রৈছ মনে উঠে হাসি॥
রাধা হেন রসবতী কোন্ পুণ্যে পাও।
ঘৃত হেন বস্তু এড়ি ঘোল প্রতি ধাও॥
এই মাত্র বলিবা রাধিকা গোপ বধূ।
পূর্ব্ব কথা কেনে সব পাসরিলা যদু?
গোয়ালের অন্ন খাই হৈয়াছ এত বড়।
আপনা না চিনি কেনে অহঙ্কার কর?
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননী খাইছ এত দিন।
তথা হোন্তে চলি আইলা কান্ধে করি ঋণ।
যখনে পিরীতি কৈলা সোহাগে আগল।
তিল আধ না দেখিলে হৈয়াছ পাগল।
সাধিয়া আপনা কাজ গোঁয়াইলা কাল।
হেন নারী দেখ এবে নয়ানের শাল॥
অনায়াসে ডুবাইলা মনয়ার সিন্ধু।
এবে সে জানিলুঁ মুই সময়ের বন্ধু॥

শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কাছে কাঁদিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ উদ্ধবকে রাধিকা আনয়নার্থ ব্রজপুরী প্রেরণ করিলেন।

শ্রীআবদুল করিম।

দেবী।

গত ভাদ্র মাসের "ভারতী"তে "দেবী" শিরোবচনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পটি এই।

কালীকিঙ্কর রায় নামে একজন পরম পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক শক্তি উপাসক জমীদার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র তারাপ্রসাদ ও উমাপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ তারাপ্রসাদ, স্ত্রীর নাম হরসুন্দরী। হরসুন্দরী একটি খোকার মা। কনিষ্ঠ উমাপ্রসাদের বয়স কুড়ি বৎসর, তাঁর স্ত্রীর নাম দয়াময়ী। উমাপ্রসাদের নবীন স্ত্রী, নবীন প্রণয়। খোকা কাকীমার ন্যাও-ট। ভোররাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে খোকা কাকীমার কাছে আসিয়া খাবার খায় ইত্যাদি। দয়াময়ীর হাতে কালীকিঙ্করের পূজার ব্যাপার, আয়োজনাদির ভার ছিল। উমাপ্রসাদ সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ্ করিয়া পারশী পড়িতেছেন। ইচ্ছা স্ত্রীকে লইয়া বিদেশে গিয়া চাকরী করেন, কেন না তাহা হইলে সর্ব্বদা স্ত্রীর সঙ্গসুখে সুখী হইবেন। তাহার বাড়ীতে সে সুখ ঘটে না—ঘটে কেবল রাত্রে, তাহাতে তাহার মন উঠে না, ভরপুর হয় না।

একদিন পৌষমাসের দীর্ঘ রজনী অবসানে নিদ্রাভঙ্গে উমাপ্রসাদ স্ত্রীর সহিত পরিহাস-রস-আস্বাদন করিতেছেন এবং চাকরী সম্বন্ধে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন, খোকা তখনও কেন আসিল না তাহার কারণ বুঝাইতেছেন, মধ্যে মধ্যে দুইটি একটি চুম্বনও গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দয়াময়ী বলিয়া উঠিল "মনটা আমার কেমন হয়ে গেছে * * মনে হচ্চে যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না"। যাহা হোক উভয়ে আবার নিদ্রাভিভূত হইল।

সহসা আহ্নিক পূজারবেশে উমাপ্রসাদের রুদ্ধ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া পিতা ডাকিল "উমা"। স্বর যেন কেমন কেমন। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া উমা দ্বার খুলিয়া দিল। মনে একটা বিপদের ভয়। বাবা ত এমন সময় কখন আসেন না। ছোট বউমার তত্ত্ব লইয়া কালীকিঙ্কর একেবারে ছোট বউয়ের পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। উমার বিস্ময়ের সীমা নাই। দুই চারিটা কথার পর কালী উমাকে বলিলেন "বউমাকে প্রণাম কর। বাবা আমার বড় সৌভাগ্য, যে কুলে জন্মেছি তা পবিত্র হল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, এতদিন যে সাধনা আরাধনা করিলাম, তাহা নিষ্ফল হয় নি। মা

জগন্ময়ী কৃপা করে আমার ঘরে ছোট বউমার মূর্ত্তিতে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হল"।

দয়াময়ী ছিল মানবী সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইলেন। ঠাকুরঘরে তাহার স্থান হইল। পূজা হোম বলিদান চণ্ডীপাঠ আরতি হইতে লাগিল। পাড়ায় গ্রামে চাকলায় কথা রাষ্ট্র হইল। দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কত লোকের কত কঠিন পীড়া দয়াময়ী আরোগ্য করিলেন। কত মৃতপ্রায় ব্যক্তি জীবন পাইল। সকলে বিশ্বাস করিল দেবী—বিশ্বাস করিল না কেবল তারাপ্রসাদের স্ত্রী, বাটীর বড়বধূ—খোকার মা হরসুন্দরী। দয়াময়ী প্রথমে কেবল কাঁদিয়াছিলেন কিন্তু এখন আর কাঁদেন না। উমা বাড়ী ছাড়া।

একদিন রাত্রে উমাপ্রসাদ আস্তে আস্তে ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া দয়াময়ীর কম্বলে বসিয়া তাহাকে জাগ্রত করিল। অনেক কথার পর দয়া স্বামীর সঙ্গে পলাইতে স্বীকৃত হইলেন। দিন সাত পরে শনিবার গভীর নিশায় পলায়ন স্থির হইল।

বন্দোবস্ত অনুসারে উমাপ্রসাদ যখন আবার দয়ার ঘরে ঢুকিল, তখন দয়াময়ী পলাইতে চাহিলেন না, তিনি বলিলেন, এত লোকে আমায় দেবী বলিতেছে, আমি যাইব না। উমাপ্রসাদ বুঝাইল যে দয়া দুর্গা হইলে তিনি স্বয়ং মহাদেব। দয়া এ তর্ক যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া পলাইতে স্বীকার হইলেন। কিন্তু নদীতীরে নৌকা পর্য্যন্ত গিয়া আর গেলেন না। দেবীত্বে একা ফিরিয়া আসিলেন। নৈশ অন্ধকার উমাপ্রসাদকে মুছিয়া ফেলিল।

খোকার বড় অসুখ। বড়বধূ ঔষধ দিতে চায়। কিন্তু তারাপ্রসাদ কালীকিঙ্কর উভয়ে নারাজ। বড়বউ দ্বারে দ্বারে পাড়ায় পাড়ায় ফিরিল কেহই তাহাকে ঔষধ দিল না, সাহায্য করিল না, দয়াময়ী নিজে খোকাকে আরোগ্য করিবেন বলিলেন। খোকা কিন্তু আরাম হইল না। খোকা দয়াময়ীর পদপ্রান্তে মরিয়া গেল।

যখন খোকার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইল, তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিল, বলিল "রাক্ষসি, খোকাকে নিলি, কিছুতেই মায়া ত্যাগ করিতে পারিলি নি!"

খোকার মা যা মুখে আসিল বলিয়া গালি দিল। বলিল "দেবী কখনও ছেলে খায়?"

কালীকিঙ্কর ছল ছল নেত্রে বলিলেন "মা খোকাকে ফিরিয়ে দে, এখনও দেহ নষ্ট হয় নি। ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।"

যমরাজা খোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না। তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্দ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারা দিন চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। আরতি হইল যেমন তেমন করিয়া।

* * * *

পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ!—পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

এই ত গেল গল্প। এখন ইহার তাৎপর্য্য কি? লেখক নিজে তাৎপর্য্য কি তাহা বলেন নাই। আমি না হয় তাঁহার মনের কথাটা টানিয়া বলি, যে, কালীকিঙ্করের বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত, দয়াময়ী কখন দেবী হয়েন নাই, দেবী ছিলেন না সামান্যা মানবী, তাই খোকাকে বাঁচাইতে না পারিয়া গলায় দড়ী দিয়াছেন। কেমন—এই কি না?

প্রবন্ধ সম্বন্ধে অপর কথা বলিবার পূর্ব্বে আমি একটা কথা বলা উচিৎ মনে করিতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক ভারতী পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কিছু মাত্র দুঃখিত হন নাই। ভারতী ব্রাহ্মদলের পত্রিকা হিন্দুধর্ম্মের গ্লানিকর কথা ইহাতে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াই থাকে। ভারতী প্রকাশ না করিলে লেখক অপর কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, এমন অনেক হিন্দু আখ্যাধারী মহাত্মা আছেন, যাঁহারা এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। আর ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কি হিন্দুরা একযোগে ভারতীকে ত্যাগ করিবেন?—জানি তাহাও নহে—তাহাও হইবে না। এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশে সমাজের কি অনিষ্ট তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে একথা জানা আছে যে যথার্থ ধার্ম্মিক কোন ব্যক্তি

(তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হৌন না কেন) অপর কোন ব্যক্তির মনে কোন প্রকারে কষ্ট দেন না। আবার সেই অপর ব্যক্তি যদি অপর ধর্ম্মাবলম্বী হয়েন তবে ধার্ম্মিক মহাত্মা আরও সাবধান হয়েন, সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করেন। আমার ধর্ম্মকে আমি যতটা ভালবাসি তিনি মনে করেন অপর ধর্ম্মাবলম্বী হয়ত তাহার ধর্ম্মকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখিলেই মনে আপনা হইতে সন্দেহ আসে, বুঝি ব্যঙ্গকারী নিজের ধর্ম্মকেই ভাল বাসিতে সেখেন নাই। এই গেল ধার্ম্মিকের কথা।

এইবার সমাজের কথা। এই যে দেবী-লেখক—হয় ইনি দয়াময়ীর কালীকিঙ্করের আরোপিত দেবীত্বে বিশ্বাস করেন আর না হয় দেবীত্বে বিশ্বাস করেন না। যদি বিশ্বাস করেন বা করিতেন তাহা হইলে ইঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, দেবী হইয়া কেন গলায়দড়ী দিলেন তাহার মীমাংসা করা। আর যদি বিশ্বাস না করেন বা করিতেন তবে আরো ভাল করিয়া গালি দেওয়া। কিন্তু এই দুইটি কার্য্যেরই মূলে একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে, সেটি এই—যে গল্পটি সত্য। লেখক কি তাহা বিশ্বাস করেন? তিনি যদি গল্পটি সত্য বলিয়া না বিশ্বাস করেন তবে তাঁহার গল্পটি ছাপিবার আদৌ অধিকার নাই। বড়ই দুঃখের কথা বঙ্গের লেখকগণ ভুলিয়া যান যে লেখকের একটা দায়িত্ব আছে। আদালতে মিথ্যা কথা বলিলে জেল হয়, সমাজে মিথ্যা কথা বলিলে লোকে মিথ্যুক বলিয়া জানে ও কেহ বিশ্বাস করে না। আর ছাপিয়া মিথ্যা কথা বলিলে একটা সম্প্রদায়কে যদৃচ্ছা গালি দিলে, তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত দিলে তাহার কি কিছু দণ্ড নাই নাকি? পিনাল কোডের ধারা আছে। তবে হিন্দু ক্ষমা করিয়া কিছু বলেন না এই যথেষ্ট। কিন্তু সাহিত্য তাহা উপেক্ষা করিবেন কেন? এই জন্যই ত সম্পাদকের প্রয়োজন। যিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানেন না, তিনি সম্পাদক হইবার উপযুক্ত নহেন। ভারতীর কি সম্পাদক নাই?

পূর্ণিমা (১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ,) দারোগার দপ্তর সমালোচনা উপলক্ষে একবার এই কথা বলিয়াছিল "একজন কুলনারী সপত্নী-সুলভ বিদ্বেষবশে, নিজ সপত্নীকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস স্বীয় স্বামীকে খাওয়াইয়াছিল, আর পরে সেই কথা স্বামীকে এবং সকলকে বলিল। ইহা যদি কাল্পনিক কথা হয় তবে প্রকাশক * * বাবুকে জিজ্ঞাসা করি তিনি অনর্থক অমূলক বঙ্গ-কুলনারীকে

এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গ সমাজকে পৈশাচিক পাপে কলঙ্কিত করেন কেন? এইরূপ কলঙ্ক আরোপে তিনি সমাজদ্রোহী। আর যদি এই গল্প প্রকৃত ঘটনা হয়, তাহা হইলে, তাঁহাকে বিনয়ে বলি, তিনি যেন নায়ক নায়িকাদের প্রকৃত নাম ধাম, ঠাঁই ঠিকানা, আমাদিগকে পাঠাইয়া দেন। আমরা তাহা প্রকাশ করিব না, কেবল গোপনে অনুসন্ধান করিয়া গল্প ঘটনা মূলক বুঝিলে * * বাবুর উপর আমরা যে সমাজদ্রোহিতার গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছি, তাহার প্রত্যাহার করিব এবং তিনি প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিব।"

এখন ধরিয়া লওয়া যাউক গল্পটি সত্য। কালীকিঙ্কর যে দয়াময়ীকে দেবী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের বিকাশ মাত্র। হিন্দুসমাজ চিরকালই স্ত্রীকে দেবী বলিয়া জানেন, স্বতপরত—ধর্ম্মত-শাস্ত্রত-সমাজত। দেবীগণ সাধ করিয়া সেই আসন ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া আর পুরুষগণ সেই আসনে এখনও কুল-লক্ষ্মীদিগকে আবার বসাইতে পারেন নাই বলিয়া ভারতের আজিও এ দুর্দ্দশা। জগদম্বা মা আমার লাল সাটী পরিয়া রুলী লোহা ও শাখা হাতে দিয়া এলোচুলে অলক্তকরঞ্জিত শ্রীচরণে ও ত্রিনয়নে শোভা পান। পাঠক কি কখনও এ দৃশ্য ঘরে পরে দেখেন নাই? এই দেবীত্বের ঘনিষ্ঠতা বিজ্ঞাপন করিবার জন্যই আজিও হিন্দুস্থানী ললনারা কপালে তৃতীয় নয়নের চিহ্ন স্বরূপ অলঙ্কারবিশেষ আর অস্মদ্দেশের বর্ষীয়সীরা কপালে উল্কী ধারণ করিয়া থাকেন? এ ত গেল সাজের কথা, শাস্ত্রে কি বলে? বালিকা কালিকাশ্চৈব—না, সে কথা আর তুলিব না। সাধকপ্রধান রামপ্রসাদ না গাহিয়াছেন?

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্‌ব কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারীরে।
যেমন অনুজ লক্ষণ সঙ্গে, (তবু) জানকী তার সমিভ্যারে॥
জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে॥

পাঠক কি সাধক কমলাকান্তের গান শুনেন নাই?

সদানন্দময়ি কালি মহাকালের মনমোহিনী।

তুমি আপন সুখে আপনি নাচ মা আপনি দাও মা করতালি॥
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না মাগো মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥

আর একটি গানও আছে। "জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।" কেন, কি জন্য, কি গূঢ় নীতি বিকাশের জন্য, খোকার প্রাণ দেবী রক্ষা করিলেন না আর নিজে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিলেন তাহা তুমি আমি কি বুঝির? আমরা বুঝিতে না পারি কিন্তু ভক্তে বুঝিতে পারে, আর ভক্তে বুঝিতে পারে বলিয়াই আজিও এত পাপস্রোতেও এত গো হত্যার পরেও ভারত টেঁকিয়া আছে। মায়ের গলায় দড়ীটা কি বিশ্বরূপ ছাড়া? না গলায় দড়ী দিলে তাঁর প্রাণ যায়। যে মা হাসিতে হাসিতে নিজের মুণ্ড নিজে কাটিয়া নিজের রুধির নিজে পান করিতেছেন, সেই ঘোরারূপিণী ছিন্নমস্তার পুত্র ভক্তদিগের দেবীর গলায় দড়ীর কথা শুনিয়া একবার মাত্র ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসি প্রকটিত হইবে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় উষ্ণ অশ্রু ধরণী প্লাবিত করিবে। এ মর্ম্ম যাতনা বুঝিবে কে?

যদি বল ভাই সকলই অলঙ্কার—কিছুই কিছু নয়, সকলি তোমার ভ্রান্তি। তাহা হইলেও সাধক দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত তারস্বরে গাহিব—

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কি বা কার॥
সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন সঞ্চার॥
জগন্মাতা জগন্ময়ী, যখন কাতর হই,
বলি এস ব্রহ্মময়ী, করগো নিস্তার॥
জড়জীব জড় করি, যাঁহার সাধনা করি,
ধ্যান জ্ঞান জল ফল সকলি ত তাঁর॥

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

ভারতী, ভাদ্র। এই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে—চৌর-পঞ্চাশিকা, দেবী, বর্ষার গান, গুজরাটে ভূত ছাড়ানো, কিষ্কিন্ধ্যা, গেগেনশাইন, জৈন সম্প্রদায়, দ্বাদশত্বীকার্য্য বর্জ্জিত জ্যামিতি, পল্লীগ্রাম প্রসঙ্গ, শান্তিচর্চ্চা। তন্মধ্যে দুইটি পদ্য চৌর-পঞ্চাশিকা ও বর্ষার গান। প্রথমটি ভাল। মনে পড়িল একদিন এই ভারতীতেই একবার "বর্ষামঙ্গল" পাঠ করিয়াছিলাম।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা!
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা!

আর এই বর্ষার গান দেখুন—

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ টাপ,
বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপ ঝাপ!
প্রবল ঝড় বহে, আম্র কাঁঠাল সব,
পড়িছে চারিদিকে ধুপ ধাপ!
বজ্র কড় কড় ডাকে, গিন্নী শুয়ে বৌমাকে
কাপড় তোল বড়ি তোল ঘন হাঁকে,
অমনি ছাদের উপর দুপ দাপ!

বলিতে ভুলিয়াছি মল্লার রাগ আছে, রূপক তাল আছে। "দেবী" গল্পে আবার কিছু সমাজের উপর কটাক্ষ, হিন্দুর বিশ্বাসের উপর কটাক্ষ। হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়া ভারতী প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেছেন! "গুজরাটে ভূত ছাড়ানো"য় দেখিলাম "ভারতবর্ষে দেবতা অপেক্ষা অপদেবতার অত্যাচার অনেক অধিক। সংখ্যায় অধিক কোন্ দল তাহা মানুষের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা কঠিন। দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটী হইলে অপদেবতা বোধ করি তাহা অপেক্ষা অল্প হইবে না ইত্যাদি।" অনুমানের প্রয়োজন কি? সেন্সস রিপোর্ট দেখিলেই লেঠা চুকিয়া যাইত। গুজরাটে ভূত ছাড়ান অনেকটা

বঙ্গদেশের মত কিন্তু লেখক বলিতেছেন "গুজরাটী ভূত মহাশয়েরা আমাদের বঙ্গভূমির ভূতেদের অপেক্ষা দুর্দ্দান্ত কি না আমার এই অল্প কালের প্রবাসে তাহার কোন পরিচয় পাই নাই।" অপেক্ষা করুন। বার তিথি নক্ষত্রের ঠিক যোজনা হইলেই—ধরা পড়িবে আর ওঝা মহাশয়ও ঠিক আসিয়া দেখা দিবেন। "কিষ্কিন্ধ্যা" প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন, কিষ্কিন্ধ্যা কোথায়? বলিতেছেন মহর্ষি (বাল্মীকি) বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যা মধ্যভারতের কোনও স্থানে অবস্থিত থাকাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।" মহারাষ্ট্র লেখক কি এই করিলেন? গেগেনশাইন—কি? একখণ্ড গোলাকার আলোক মাত্র; ইহার আয়োতন চন্দ্রাপেক্ষাও বৃহৎ কিন্তু অতি ক্ষীণ, মুক্তনেত্রে দেখা যায় না। দেখিতে নীহারিকার ন্যায়, শীতকালে সুস্পষ্ট ইহা সূর্য্যাস্তের সমকালে পূর্ব্বগগণে উদয় হইয়া সূর্য্যোদয়ের সমকালে পশ্চিমগগণে অস্তগমন করে। পৃথিবীর যেদিকে সূর্য্য থাকে গেগেনশাইন তাহার বিপরীত দিকে থাকে। সেই জন্য কেহ কেহ ইহাকে Ante Sun "বিকল্পসূর্য্য" বলেন। বার্ণার্ড সাহেব এই আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। গেগেনশাইনের উৎপত্তি বিষয়ে আরো অনেক প্রকারের মতামত প্রচারিত হইতেছে। জৈন সম্প্রদায়—সম্বন্ধে গুটীকত প্রয়োজনীয় কথা। বেশ। কর্ণেল টড বলেন জৈনধর্ম্ম মধ্য আসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। জৈনদের মধ্যে চারি জন বুধ (বুদ্ধ বা তীর্থঙ্কর) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশপ্রতিষ্ঠাতা প্রথম বুধ পূঃ খৃঃ ২৫৫০; দ্বিতীয় বুধ নেমিনাথ পূঃ খৃঃ ১১২০; তৃতীয় বুধ পার্শ্বনাথ পূঃ খৃঃ ৬৫০ আর চতুর্থ বুধ মহাবীর (বর্দ্ধমান) পূঃ খৃঃ ৫৩৩ অব্দে অবতীর্ণ হয়েন। জৈনেরা এই চারি জন ব্যতীত আরও কুড়ি জন বুধ বা তীর্থঙ্করের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তীর্থঙ্করেরা মনুষ্য ছিলেন তবে তপস্যা দ্বারা নির্ব্বাণ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। কথিত আছে, ব্রাহ্মণেরা জৈনদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য অনলকুণ্ড হইতে চারিটি বীর ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেন। যথা, (১) প্রমার, (২) পুরীহর, (৩) চোলুক বা শোলাঙ্কী, (৪) চৌহান। কিন্তু কালের কুটীল গতিতে আজি জৈন মন্দিরে দেবতার পূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছেন। তাঁহাদের দান গ্রহণ করিবার জন্য "ভাজক" ব্রাহ্মণ আছেন। বিবাহকার্য্যে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। বিবাহে হোম হয়। জৈনদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত। হিন্দুদের ন্যায় ইহারা তীর্থ পর্য্যটন করেন। তবে

ইহাদের তীর্থস্থান ও দেবতা সকল স্বতন্ত্র। হিন্দুদের ন্যায় ইহাদের বালকদের "চূড়াকরণ" হয়। ইহাদের মৃতকে অগ্নিসাৎ করেন, বার দিন অশৌচ পালন করেন, আদ্যশ্রাদ্ধ ও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধও করিয়া থাকেন, অশৌচান্তে ইহারা মস্তকাদি মুণ্ডন করেন না তবে শোকবস্ত্র পরিধান করেন। ইহারা গঙ্গাদেবী, কালিকা দেবী, গণেশজীকে পূজা করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে পরমেশ্বর নির্গুণ ও নির্লিপ্ত জগৎ অনাদি, পরমেশ্বর অনাদি ও কর্ম্ম অনাদি একমাত্র কর্ম্মই মানুষের সুখ দুঃখ ও জন্ম মৃত্যুর কারণ। কর্ম্মের হস্তে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে—সৎকর্ম্ম কর, পবিত্র থাক, সর্ব্বজীবে দয়া কর, কাহাকেও অকারণ কষ্ট দিও না এবং মুক্তির জন্য ভগবান্ তীর্থঙ্করগণের নিকট প্রার্থনা কর এবং তাঁহাদিগকে পূজা কর। এইরূপ করিলে নির্ব্বাণ পাইবে, মোক্ষ লাভ করিবে। এই জন্যই জৈনদের মন্দিরে মন্দিরে তীর্থঙ্করের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই তীর্থঙ্করদিগের পূজা আরাধনা ও জৈনদিগের তীর্থপর্য্যটন। জৈনধর্ম্মের বিশেষত্ব সর্ব্ব জীবে দয়া বা "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" ইহারা একটা সামান্য পিপীলিকা মাড়াইলে যে কষ্ট পান তাহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না, শত শত কুক্কুরকে পালন করিয়া ইহারা তাহাদিগকে প্রত্যহ রুটী ও কচুরী খাওয়াইয়া থাকেন। অনেক জৈন ছারপোকাকে নিজ দেহের রক্ত পান করান। একবার লেখক একটি সুন্দরী জৈন বালিকার সম্মুখে একটি পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিতেছিল, ক্ষুদ্র বালিকা তাহা দেখিয়া যেরূপ ব্যগ্রভাবে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাহার হস্তরোধ করিয়াছিল, তাহা সে এ জন্মেও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। বলিতে কি হৃদয়ের সুকুমারবৃত্তি নিচয়ের উৎকর্ষে আমি তাহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়াছিলাম। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে "কুসুমকোমল প্রাণা" বঙ্গললনার করকমলে বঁটির দ্বারা ছিন্নার্দ্ধমুণ্ড ধড়ফড়ায়মান রোহিতের দেহ ও হত্যানন্দোৎফুল্ল সম্মুখবর্ত্তী "সুকুমার" বালকবালিকাদের মুখারবিন্দ মনে করিয়াছিলাম।" দ্বাদশস্বীকার্য্য বর্জ্জিত জ্যামিতি—আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে বুঝিতে পারিলাম না। "পল্লীগ্রাম প্রসঙ্গ", ভাল। কিছুদিন পরে কলিকাতার যাদুঘরে বেলকের মাছ, কলার ডাল ও কোঁচের ঝাল দেখিতে হইবে। "শান্তিচর্চ্চা" এও ভাল। ম্যাডাম সেলেঙ্কা (জার্ম্মাণ) য়ুরোপের হেগ সহরে যে শান্তি সমিতি বসিয়াছিল, তাহাতে ভারতের নারীগণকে আহ্বান করিয়া-

ছিলেন। শান্তিকার্য্যে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন। ভারতীর লেখক এই আহ্বানে হাঁসিবেন কি কাঁদিবেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই বলিতেছেন—"মাডাম সেলেঙ্কার ঈষৎ হিসাবে ভুল হইয়াছে। যে রাষ্ট্রীয় সভায় ভারত-রমণীর পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পরমাত্মীয়গণের স্বাধীন, সগৌরব, নির্ভীক কণ্ঠ শ্রুত হইবে না—সেখানে জর্ম্মাণ পক্ষ পুটাশ্রয়ে ভারতরমণীর ক্ষীণ কণ্ঠ উত্থিত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।" ম্যাডেম সেলেঙ্কা ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি পুরমহিলাকরশাখাতাড়িতা নাগরপৃষ্ঠেশব্দায়মানা সর্ম্মার্জ্জনীর সপা-সপ্ শব্দে মুখরিত অন্তঃপুর ভুলিতে পারেন নাই, তাই ভারতের বংশধরগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভগিনী কদম্বকে শান্তিসমিতিতে আহ্বান করিয়াছেন এই মাত্র।

যে না দেখিয়াছে সেই বিদ্যার চলন
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ।

ইহাও কি মিলিটেরী নহে? রোমের মরাল আর ভারতের বারণ?

পন্থা, ভাদ্র। আঁধারে (পদ্য), ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, স্বপ্নে দীক্ষা, সাধনা, সঙ্কীর্ত্তন (কবিতা), উত্তরাখণ্ডে, ইহার সমালোচনা। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি আর সাধনা উল্লেখযোগ্য। "স্বপ্নেদীক্ষা" আর "উত্তরাখণ্ডে" ঠিক যেন টনিকের ডোস্ খাওয়া দাওয়ার উপর এক এক দাগ। যাহাহৌক কৃষ্ণধন বাবু আমা-দের কথার জবাব দিয়াছেন। কয়বার পূর্ণিমাতে আমরা তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহার যেন জবাব দিয়াছেন বোধ হইতেছে। স্বপ্নে দীক্ষার এক স্থলে তিনি বলিতেছেন "গুরুদেব! যাহা দেখাইয়াছ, তাহা ঠিক লিখিতে পারিতেছি কি না তাহা তুমিই জান, যদি কোন অংশ আমার নিজের কল্প-নার সহিত মিলিত হইয়া রঞ্জিত হইয়া থাকে তবে দেব! উহা ভবিষ্যতে তুমিই আবার সংশোধন করিয়া দিও। আমার লেখারূপ এই কর্ম্ম তোমার চরণকমলে সমর্পণ করিয়াই লিখিতেছি সুতরাং এই লেখায় সত্যাদি কোথাও রঞ্জিত হইয়া থাকে তবে উহা ভবিষ্যতে আবার তোমা দ্বারাই সংশোধিত হইবে, এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই লিখিতে বসিয়াছি। এই বিশ্বাস না থাকিলে কলম হাতে করিতে সাহসী হইতাম না, কেন না তুমিই বুঝাইয়াছ যে যাহা সত্য নহে তাহার প্রচাররূপ কর্ম্মের দায়ীত্ব বড় গুরুতর। নমঃ গুরবে নমঃ।" আমরাও বলি তথাস্তু। "সঙ্কীর্ত্তন" নগেন্দ্রবালা দাসীর।

প্রত্যাদেশ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলেই—প্রত্যাদেশে বিশ্বাস ফুটিয়া উঠে। স্বয়ং ভগবান সকল ধর্ম্মের অন্তবর্ত্তী থাকিয়া যে সুমহান আদেশ প্রচার করেন তাহাতে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হয়েন। প্রত্যাদেশ ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ।

ঈশ্বর আছেন ইহা বিশ্বাস করিলেই যথেষ্ট নহে। বিশ্বাস গাঢ়তর হইলে যেমন তাঁহাকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হয়, তেমনি তাঁহার সহিত কথা কহিতে, তাঁহার দৈববাণী শুনিতে ইচ্ছা জন্মে। সেই দৈববাণীর নামান্তর প্রত্যাদেশ। ভগবান যাহা ভক্তের নিকট প্রচার করেন, তাহাই প্রত্যাদেশ।

চন্দ্রের মধুরতা পূর্ণালোকে, পুষ্পের আদর সৌরভে, নদীর শোভা প্রবাহে, ভগবানের মাহাত্ম্য তাঁহার প্রত্যাদেশে। এই প্রত্যাদেশ আছে বলিয়াই তাঁহার সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ। তিনি যদি বিশ্বচরাচর সৃষ্ট করিয়া অন্তর্হিত হইতেন অথবা সাক্ষীস্বরূপ দূরে থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেন কিম্বা অলক্ষিতভাবে সৃষ্টিযন্ত্রের পরিচালনা করিতেন, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ চলিতে পারিত। কিন্তু মেদমাংসপরিবৃত এই যে শরীর তাহার পরিচালক যে আত্মা তাহার সহিত সেই পরমাত্মার এমনি সম্বন্ধ যে বিচ্ছেদ হইবার উপায় নাই। আত্মার পরিচালক পরমাত্মা, সেই পরিচালনা যদ্দ্বারা সমাহিত হয়, তাহার নাম প্রত্যাদেশ। ভগবানের রাজ্যে অনিয়ম স্থান পাইতে পারে না। বিশৃঙ্খলা দেখিতে দেখিতে বিলীন হয়। সর্ব্বত্র সুনিয়ম সংস্থাপিত। এই বিশাল মহা কাব্য কেমন ছন্দে গ্রথিত। এই যে ভুবনসঙ্গীত কেমন তাল লয়ে মধুময়। এই যে আলোক তাহার পশ্চাতে আনন্দের কেমন মধুর সমাবেশ। এই যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কতই চিত্তমুগ্ধকর—তাহার কি অপূর্ব্ব বিন্যাস? বিশ্বশিল্পীর কৌশল ও নৈপুণ্য দেখিয়া কে না চমৎকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি অন্তরে থাকিয়া আমাদের কল্যাণের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে যাহা করিতেছেন,

তাহা ভাবিলে ও বুঝিলে একেবারে স্তম্ভিত হইতে হয়। জীবনের সাধন-ক্ষেত্রে তিনি আমাদিগকে দীক্ষিত করেন, তাই আমরা সিদ্ধ হইতে পারি। প্রত্যাদেশ সেই দীক্ষামন্ত্র।

অমানিশার অন্ধকারে যোগী শবসাধনা করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে প্রেত-মণ্ডলী আসিয়া কত উৎপাৎ কত বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে—যোগীর শরীর কণ্টকিত হইতেছে, সহসা পিশাচের বিকট নিনাদ পরাস্ত করিয়া কোথা হইতে কে যেন বলিয়া উঠিলেন "মা ভৈতব্যং, মা ভৈতব্যং"। মুহূর্ত্ত মধ্যে যোগী মনে কত বল পাইলেন, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইল। প্রত্যাদেশ সেই আশ্বাস বাণী।

ঈশ্বর যেমন ধর্ম্মের প্রাণ, প্রত্যাদেশ তেমনি তাহার সজীবতা। মানবের সহিত ভগবানের যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, প্রত্যাদেশ তাহার পরিচায়ক। ভক্ত যে দিন প্রথম ভগবানের কথা শুনিতে ও বুঝিতে পায়, সেই দিন তাহার জীবনের শুভমুহূর্ত্ত, সেই দিন হইতে ধর্ম্ম কি তাহা সে বুঝিতে পারে, সেই দিন হইতে ঈশ্বরের সহিত একেবারে মিলিত হইবার জন্য প্রাণ লালায়িত হয়। বিশ্বাসের অগ্নি সেই যে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে ইহকালে আর তাহা নির্ব্বাপিত হয় না।

প্রতি ধর্ম্মেই শিষ্যগণের অভাব নাই কিন্তু প্রত্যাদেশ-বিশ্বাসীর সংখ্যা অতীব বিরল। নাস্তিকদের কথা স্বতন্ত্র। যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ তাহারা প্রত্যাদেশে কেন বিশ্বাস করিবে? যাঁহারা নিজেকে কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন না। অহং জ্ঞান ইহার মূলীভূত কারণ। আমিই যদি সকল কার্য্যের একমাত্র কারণ, ফলাফলের একমাত্র বিধাতা হইয়া দাঁড়াই, তবে আর ভগবানের সংশ্রব থাকিল কোথায়? তিনি সাক্ষীস্বরূপ থাকুন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। তিনি সম্পূর্ণ করিয়া আমাকে সৃষ্ট করিয়াছেন—আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা করিবার তাহা তিনি করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, এখন আমি নিজ শক্তিতে কার্য্য করিতেছি—ফলাফল সমুদায় আমার আয়ত্তাধীন। অহং জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে ক্রমে ঈশ্বরে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস আসিয়া দাঁড়ায় অথবা যদি কোন

প্রকার অস্পষ্ট বিশ্বাস রহিয়া যায় সে বিশ্বাসের প্রতিপাদ্য ভগবান শক্তিহীন অচেতন জড়বৎ। তাদৃশ ঈশ্বর থাকা না থাকা সমান, তাদৃশ বিশ্বাস না থাকিলেও ক্ষতি নাই। নাস্তিকের ধারণা ও অহং জ্ঞানাভিমানীর বিশ্বাস, ইহার মধ্যে প্রভেদ কিছুই নাই।

অহং ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে একদল আছেন, যাঁহারা মনে করেন, ভগবান কি নিজে আমাদের সহিত কথা কহিতে আইসেন?—তিনি আমাদের অন্তরে যে বিবেকশক্তি দিয়াছেন তাহাই আমাদের পরিচালক হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। ঈশ্বরের বাণী সেই বিবেকবাণী মাত্র। আমাদের বিবেক অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞান বলিলে উহা আমাদেরই বুঝায়। ঈশ্বর ত সবই দিয়াছেন, যাহা একবার পাইয়াছি, তাহা আমারই হইয়াছে তদনুগত হইয়া যদি চলিতে হয় তবে দাতার সহিত সম্বন্ধ থাকিল কোথায়? আমি বিবেক পাইয়াছি—আমার সেই বিবেকের আদেশ অনুসারে আমি চলিব—ইহা অহংজ্ঞান। প্রত্যাদেশের সহিত ইহার সংশ্রব নাই।

একদল অদৃষ্টবাদী আছেন, যাঁহারা মনে করেন ইহ জন্মে শুধু প্রাক্তনের ফল ভুগিতে আসিয়াছি। যাহা হইবার তাহা হইবেই হইবে। পুরুষকার শব্দের কিছুমাত্র অর্থ নাই। স্বয়ং ভগবানের ক্ষমতা নাই যে প্রাক্তনের ফলকে অতিক্রম করেন। আমি বদ্ধজীব আমাকে বৃথা কেন উৎসাহিত করিতেছ। সাধনাপথে যাইয়া কি করিব? প্রাক্তনের হাত হইতে যখন উদ্ধার পাইবার প্রত্যাশা নাই, তখন উদ্যোগ আড়ম্বর করিয়া লাভ কি? ঈশ্বরের কথা শুনিয়া লাভ কি?—শুনিলেও যে ফল, না শুনিলেও সেই ফল। তৃণের ন্যায় স্রোতে যাহাকে ভাসিয়া যাইতে হইবে, তাহার সহিত কথা কহিবার প্রয়োজন কি? প্রাক্তনশৃঙ্খলে সংবদ্ধ জীবের নিকট আসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া লাভ কি? তুমি ঈশ্বর হইলেও শক্তিহীন ঈশ্বর—তোমার শরণাপন্ন হইয়া কোন ফল নাই, তোমার প্রত্যাদেশ প্রকৃত হইলেও উহা গণকের ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র, কোন প্রকার প্রশমন করিবার শক্তি তোমার নাই। তাদৃশ প্রত্যাদেশ না শুনিলেই মঙ্গল। ভবিষ্যজ্জীবনের কথা শুনিয়া কি করিব? যাহা হইবে তাহা ত হইবেই হইবে, তবে তোমার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি?

অহংজ্ঞান প্রবল হইলে যেমন প্রত্যাদেশে বিশ্বাস থাকে না, তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অদৃষ্টবাদীর নিকটও উহা অর্থশূন্য শব্দমাত্র। যিনি মনে

করেন, আমি সবই করিতে পারি আর যিনি ভাবেন আমি কিছুই করিতে পারি না, জীবনের যাবতীয় কার্য্য পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—এই পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে শক্তিহীন ক্রিয়াবিহীন সাক্ষীস্বরূপমাত্র কল্পনা করিতে পারেন সুতরাং প্রত্যাদেশের মাধুর্য্য তাঁহাদের বোধগম্য নহে।

যেমন অহংজ্ঞানীদের মধ্যে এক দল প্রত্যাদেশকে বিবেকবাণী বলিয়া মনে করেন, তেমনি অদৃষ্টবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, প্রাক্তনের কষাঘাতে মানব যখন আকুল হইয়া পড়ে তখন ভগবান শক্তিহীন হইলেও দয়াপরবশ হইয়া প্রাক্তনের শুভ ফল যাহা থাকে তাহা কহিয়া হতভাগ্যদিগকে আশ্বস্ত করেন। প্রত্যাদেশ বন্ধুর সান্ত্বনা মাত্র।

প্রাক্তনের ফল ভুগিতে হইবে এ কঠোর নিয়ম কে করিয়াছেন? যদি ঈশ্বর করিয়া থাকেন তবে তিনি সান্ত্বনা করিতে আসিবেন কেন? আসিলেই বা তাহা শোভা পাইবে কেন? তাদৃশ প্রত্যাদেশ ক্ষোভের উদ্রেক মাত্র, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে আস্থা জন্মিতে পারে না। অদৃষ্টের লিখন যদি ভগবান খণ্ডন করিতে না পারেন, তবে তাদৃশ শক্তিহীন ঈশ্বরের অধীনত্ব স্বীকারে লাভ কি? অদৃষ্টের পদানত থাকিয়া, অরণ্যে রোদন করিবার প্রয়োজন কি?

প্রত্যাদেশের মর্ম্মগ্রহ করিতে হইলে অবিশ্বাস, অহংজ্ঞান, বিবেক ও অদৃষ্টের প্রাধান্যে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সাংসারিকতায় ডুবিয়া থাকিলে ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওয়া যায় না। ভক্ত যখন হৃদয়তপোবনে সমাধিযজ্ঞের আয়োজন করিয়া বিশ্বাসের হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করত ভগবানের উদ্দেশে নিজের যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় আহুতি দিতে উদ্যত হয়েন তন্মুহূর্ত্তে তিনি প্রত্যাদেশের বেদমন্ত্র শুনিতে পান। একদিন সরস্বতীতীরে আর্য্যঋষিগণ যখন যাগযজ্ঞে লিপ্ত ছিলেন, সহসা প্রত্যাদেশের মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ভারতের ঋষিগণ চিরদিন তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। উহাই ভারতের বেদ। ঋষির মুখ হইতে যাহা নির্গত হইয়াছে তাহা ঋষির রচিত বা সৃষ্ট নহে—উহা স্বয়ং ভগবানের বাণী। প্রত্যাদিষ্ট ঋষিবিশেষ সেই বাণী শুনিতে পাইয়া অপরের নিকট তাহা প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টান যেরূপ বাইবেলকে এবং মুসলমান যেরূপ কোরাণকে ঈশ্বরের গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, হিন্দু তেমনি বেদকে

স্বয়ং ভগবানের মহাবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। প্রত্যাদেশের ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে?

ধর্ম্মের এত মহিমা কেন? যুগযুগান্তর ধরিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার এত সমাদর কেন? কেন, না ধর্ম্মই মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, মিলন করাইয়া দেয়। সেই মিলনকালে উভয়ের মধ্যে কত কথাই হইয়া থাকে। ঈশ্বর দর্শনের পর তিনি যাহা বলেন, তাহাই প্রত্যাদেশ। সময়ে সময়ে ভগবান অলক্ষিত থাকিয়া যাহা বলেন, তাহাও প্রত্যাদেশ কিন্তু এইরূপ প্রত্যাদেশ লইয়া কত কুতর্ক হইয়া থাকে। কেহ বলেন উহা মনের সংস্কার, কেহ বলেন উহা কবির কল্পনা, কেহ মনে করেন উহা বিবেকবাণী, কেহ বা উহা প্রেতবিশেষের উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন। এইরূপ ভাবিবার কারণ আছে। যে সে যদি মনে করেন যে আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি, তাহা হইলে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। নিজের বুদ্ধির দ্বারা কোন বিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া প্রত্যাদিষ্ট বলিলে চলিবে কেন? কল্পনায় ভাসিতে ভাসিতে উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় মনের খেয়ালকে প্রত্যাদেশ বলিলে শোভা পাইবে কেন? নিদ্রিতাবস্থায় মনের সংস্কারকে স্বপ্নের উজ্জ্বলবেশে সজ্জিত দেখিয়া প্রতারিত হইলে প্রত্যাদেশের মাহাত্ম্যের লাঘব হইবে কেন? পিশাচের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া পাপের স্রোতে ডুবিয়া ভগবানের বিধান বলিলে চলিবে কেন? কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া প্রবৃত্তির প্রতিধ্বনি শুনিয়া প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করিলে নিজেই প্রতারিত হইবে। প্রত্যাদেশকে সহজসাধ্য ও সুলভ মনে করিও না।

ঋষিচরিত্র না পাইলে ঈশ্বরদর্শন হয় না এবং সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ শুনিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর অলক্ষিতভাবে যে প্রত্যাদেশ প্রচার করেন, তাহা শুনিতে ও বুঝিতে হইলেও ভক্তির একাগ্রতায় ডুবিতে হয়। যখন কূলকিনারা না পাইয়া কাতরভাবে ভগবানের চরণে জীবন সমর্পণ করি, তখন প্রত্যাদেশ শুনিতে পাই। তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথে প্রত্যাদেশের যে মধুময় ফল ফলিয়া থাকে তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। স্বপ্নে ঔষধ প্রাপ্তির দ্বারা দুশ্চিকিৎস্য রোগের যে প্রশমন হইয়া থাকে তাহা অনেকেই জানেন। অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে উহা কুসংস্কার বলা সহজ, কিন্তু ভক্তি ও একাগ্রতায় উক্ত প্রকার প্রত্যাদেশ যে পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুর অবিদিত নাই।

ভগবানে নির্ভরশীল হইলে প্রত্যাদেশের মাধুর্য্য অনুধাবন করিতে পারা যায়। তখন মনে হয় কে যেন পশ্চাতে থাকিয়া পরিচালিত করিতেছেন। ভক্ত যখন প্রথম বিশ্বাসের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তির বিল্বচন্দনে ভক্তির দেবতাকে পূজা করিতে উপবেশন করেন, তখন প্রত্যাদেশের শঙ্খনিনাদ শুনিতে পান। বিলাসের কুহক বুঝিতে পারিয়া বিশ্বাসনেত্রে ভক্ত যখন বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব মুক্তিমন্দির দেখিতে পাইলেন, তখন কে যেন বলিয়া উঠিল "বাসনায় আগুণ না দিয়া এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছ, দিন যে যায় তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না?" সত্যসত্যই এ কি রজক তাহার ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া কহিতেছে, না রজকের মুখ দিয়া স্বয়ং ভগবান ভক্তের উদ্ধারের জন্য প্রত্যাদেশের মহাসত্য প্রচারিত করিতেছেন? তোমার আমার কাছে উহা রজকের কথা এই জন্য উহাতে কোন সারবত্তা নাই কিন্তু ভক্তের নিকট উহা অমূল্য প্রত্যাদেশ। যদি প্রভেদ দেখিতে চাও, তবে একবার দেখ ঐ মহাপুরুষ দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় অপূর্ব্ব অট্টালিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুখসম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া দীনবেশ পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। এই পরিবর্ত্তন না হইলে কি লালা বাবু দেবত্বলাভ করিতে পারিতেন?

জগতে যাঁহারা অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ। তাঁহারা ভগবানের অংশবিশেষ। পাপীদের শাস্তির জন্য এবং সাধুদের পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারে না। সাধুর বিশ্বাস সকল বিপদ হইতে ভগবান তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। জীবনে যাহা কিছু মঙ্গল ঘটে সকলই তাঁহার বিধানে, অমঙ্গল আসিলে তাহার প্রতিবিধানও তিনি করেন। এই বিশ্বাস গাঢ়তর হইলে ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। দীন দুঃখী জীবনের প্রতি ঘটনায় সেই বাণী শুনিতে পায়! অনাহারে জীর্ণশীর্ণ ব্যক্তি যখন করুণার আশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়ায় তখন প্রত্যাদেশের সান্ত্বনাবাণী শুনিতে পায়। স্বয়ং ভগবান তাহার নয়নের অশ্রু মুছাইয়া দেন। ভগবানের যত নাম আছে তন্মধ্যে অনাথনাথ নাম অপেক্ষা প্রকৃত নাম আর নাই।

দীন দুঃখী হিন্দু আজ সেই অনাথনাথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। প্রত্যাদিষ্ট ঋষি কহিতেছেন—কলির অবসানে পুণ্যের অবতার কল্কিদেব

অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র আর্য্যভূমির উদ্ধার সাধন করত বেদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সত্যযুগের প্রস্তাবনা করিবেন। ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে। হিন্দুর অবতার যে আসিবেন, প্রত্যাদেশে তাহা সূচিত হইয়াছে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

মৃত্যুর পর।

(২০)

জগৎরূপ মায়াপ্রপঞ্চের বৈচিত্র প্রতিপন্ন জন্য যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে যে গাধি নামক ব্রাহ্মণের ইতিহাস বলিয়াছিলেন তাহারই সার সংগ্রহ পাঠকের নিকট উপহার দিবার প্রয়োজন হইতেছে। মনের স্থির অবস্থা বা সমাধি বুঝাইবার পূর্ব্বে সুধীগণ সকলেই মনের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার কথা শাস্ত্রে বুঝাইয়াছেন দেখিতে পাই। যোগ বুঝিবার অগ্রেও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

কোশল গ্রামে গাধিনামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া একদা তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। আট মাস গত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণকে দর্শন দিলেন এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে ব্রাহ্মণকে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকে যথাযোগ্য স্তুতি করিয়া, সংসার নামক ব্রহ্মবিস্তৃত মায়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে দর্শন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু সেই বরই প্রদান করিলেন আরও বলিলেন "এ মায়া একবার দর্শন করিলে তোমাকে সংসারমায়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।" বরদান করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অন্তর্ধান হইলেন। ব্রাহ্মণ কিছুকাল ভগবান-দর্শন-জনিত-পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন।

একদা স্নান সমাপনান্তে জলে অবস্থান কালেই ব্রাহ্মণের মনে ভগবান-বাক্য সমুদিত হইল। তখন ব্রাহ্মণ জলে দণ্ডায়মান হইয়াই ক্রমাগত জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ধ্যানবিস্মৃতি পূর্ব্বক মোহ প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নদর্শনের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন যেন তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গনে তাঁহার মৃতশরীর পড়িয়া রহিয়াছে, মাতা স্ত্রী বন্ধুবর্গ সকলেই মৃতদেহ লইয়া শোক করিতেছেন। ক্রমে সেই শবদেহ যথাস্থানে চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

গাধি দেখিলেন যে তাঁহার আত্মা হূন নামক চণ্ডালদেশে এক চণ্ডালীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। সেখানে যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া গাধির ষোড়শ বর্ষ গত হইল। ক্রমে গাধি বিবাহ করিয়া ও বহু পুত্রের পিতা হইয়া বনে বনে বাস করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বয়সে গাধির স্ত্রীবিয়োগ ঘটিল, তিনি শোকে অধীর হইয়া দেশপর্য্যটনে বাহির হইলেন এবং ক্রমশ অনেক ভ্রমণ করিয়া কীর নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। সে দেশের রাজার তৎকালে মৃত্যু হইয়াছিল। এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক মঙ্গল-হস্তী তত্রত্য—স্বর্গপথের ন্যায় রাজপথে উন্মোচন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, গাধিকে দেখিবামাত্র মঙ্গলহস্তী শুণ্ড দ্বারা তাহাকে নিজ স্কন্ধে আরোপিত করিল। সুতরাং গাধিই রাজা হইলেন, গাধি চেষ্টা করিয়া সে দেশের ভাষা ও আচার ব্যবহার অল্পদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন এবং মন্ত্রীগণ ও অমাত্যপরিবৃত হইয়া ও রাজমহিষীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পরম সুখে সেখানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কীরদেশের রাজা একজন মহা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এজন্য গাধির রাজসভায় অন্যান্য অনেক নৃপতিগণও সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিতেন। রাজপদ পাইয়া গাধির নাম হইয়াছিল গরল রাজা।

গরলরাজের নির্বিবাদে আট বৎসরকাল গত হইলে এক বিভ্রাট ঘটিল। রাজা একদিন চণ্ডালবেশ ধারণ করিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা নগরের বহির্ভাগে উপনীত হইলেন। সেখানে দেখিলেন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ স্থূলকায় একদল চণ্ডাল বসিয়া বীণাতন্ত্রী বাজাইতেছে। সহসা তাহার মধ্য হইতে জরাবাস রক্তলোচন এক চণ্ডাল উঠিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ও হে কর্য্যঙ্গক চণ্ডাল তুমি এত দিন কোথায় কোন বনে ছিলে আজ সৌভাগ্য ক্রমেই তোমায় দেখিতে পাইয়াছি ইত্যাদি" চণ্ডালের এই সম্বোধন শুনিয়া রাজা প্রত্যুত্তরে আপন ভাগ্যফল পরিচয় দিতে বসিলেন। সেই কথোপকথন জনে জনে শুনিল, বাতায়নপথে রমণীগণ শুনিল মুহূর্ত্ত মধ্যে নগরে কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল, আর মন্ত্রী অমাত্য প্রকৃতিপুঞ্জ রাণীগণ সকলে রাজাকে চণ্ডাল জানিয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইল। কেহ আর রাজার কাছে আসে না। রাজাকে খাদ্যাদিও কেহ আর দেয় না, রাজা মহাবিপদে পড়িলেন। ও দিকে মন্ত্রী ও অমাত্যগণ ও প্রকৃতিপুঞ্জ বহুকাল চণ্ডালসংসর্গে নষ্টাচার, দূষিত

ও লুপ্তধর্ম্ম হওয়ায় সকলে সমিতি করিয়া অগ্নিদাহে জীবন বিসর্জ্জন করাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তজ্ঞানে দলে দলে মহাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সবান্ধবে তাহাতে দেহ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজাও মহা ব্যাকুলিত হইলেন এবং তিনিই সেই সমস্ত প্রাণী নাশের মূল জ্ঞানে নিজেও মরণের জন্য অগ্নি-প্রবেশ করিলেন। অনলে প্রবেশ করিয়া অনলকর্ত্তৃক ক্ষুব্ধ হইবা মাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজার চিত্তবিভ্রম বিদূরিত হইল এবং গাধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি কে, কোথায় ছিলাম কি করিতেছিলাম এইরূপ বিচিত্র বিষয়ের বিচার করিতে করিতে জল হইতে উত্থিত হইলেন। অনেক চিন্তার পর এই স্থির করিলেন বনমধ্যে উন্মাদ শার্দ্দুলের ন্যায় জীবের চিত্তশার্দ্দুল ক্রমাগত উন্মত্তের ন্যায় বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

কিছুদিন গত হইলে গাধির আশ্রমে এক অতিথির আগমন হইল। যথাযোগ্য অতিথি সৎকারের পর দুই জনে শয়ন করিয়া নানা সাধুকথা প্রসঙ্গে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। পরে ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি কীর নামক দেশে গিয়াছিলাম সেখানে পুরবাসীগণ কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া প্রায় মাসাবধি ছিলাম। সে দেশে এক জন চণ্ডাল ক্ষত্রিয় সাজিয়া আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। যখন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন অনেক ব্যক্তি ও অনেক ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তের জন্য অগ্নিপ্রবেশ করে। এই কথা শুনিবামাত্র আমি প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রয়াগে যাই। প্রয়াগে চান্দ্রায়ণব্রত শেষ করিয়া পারণ সমাধান করিয়া অদ্য এখানে আসিয়াছি। সেই জন্য আমি অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছি।"

গাধি এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন এবং ভাবিলেন আমার ও ত বৃত্তান্ত এইরূপ! অতিথি গমন করিলে পর সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া স্বকীয় চণ্ডালত্ব দেখিবার জন্য অনেক কষ্টে অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া চণ্ডালদেশে উপনীত হইলেন এবং গাধি সেখানে পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় আপন আবাসস্থান সন্দর্শন করিলেন। তখন তাঁহার চণ্ডাল অবস্থায় কৃত-কার্য্য সকল একে একে স্মরণপথে আসিতে লাগিল। তৎপরে গাধি আরও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কীর মণ্ডলে গমন করিলেন এবং সেখানেও পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় সমস্তই দেখিলেন এবং পুরবাসীগণের নিকট নিজের বৃত্তান্ত ও অগ্নি প্রবেশাদি সকল বিষয়ই শ্রবণ করিলেন। তখন চিন্তা করিতে করিতে

ভগবানের বর গাধির স্মরণ হইল এবং ভাবিলেন এই বুঝি আমার মায়াদর্শন!

তখন গাধি গিরিকন্দরে প্রত্যাগমন করিয়া কেবলমাত্র লৌহচূর্ণ ভোজন করিয়া অনেক দিন ভগবানের জন্য তপস্যা করিলেন। পরে ভগবান তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে দর্শন দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি আপনার মায়া-দর্শন বুঝিতে পারি নাই। ভ্রম কেমন করিয়া সত্য হইল?" তদুত্তরে ভগবান বলিলেন—"পৃথিবী আদি যত পদার্থ দেখ ইহা মনে অবস্থান করে, মনের বাহিরে ইহাদের স্থান নাই; স্বপ্নে যেমন চিত্তস্থ সকল বিষয় অনুভূত হয়, সেইরূপ ভ্রমে আরও ও মদিরাপানে উন্মত্ত হইলেও সেইরূপ বস্তু দর্শন ঘটে। মনোমধ্যে অনন্তজগৎসমূহ অবস্থিতি করে, অতএব ইহাতে যদি পৃথিব্যাদির মায়ারূপ চণ্ডালত্বের প্রকটন হয় তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ কি? যেরূপ প্রতিবিম্বরূপে চণ্ডালত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, অতিথির আগমনও সেইরূপ ভ্রমাত্মক জানিবে। ভ্রান্তি প্রযুক্ত গমনেচ্ছাদি প্রকাশ পাওয়াতে আমি আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চণ্ডালমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং কটঙ্কের পূর্ব্বতন গৃহ লুণ্ঠিত দেখিয়াছিলাম। ভ্রম দ্বারা সেইরূপ কীরনগরী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাদের সকল কথা শ্রবণ ও চণ্ডালাধিপত্য দর্শন করিয়াছিলাম। কাকের উড্ডয়ণকালে তালপতনের ন্যায় যে প্রকার তোমার চিত্তে চণ্ডাল প্রতিবিম্ব প্রকাশিত, সকল চণ্ডাল ও কীরদিগের চিত্তও সেইরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কোনও সময়ে এক প্রতিভা বহু হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে; জানিও মনের গতি কাকতালীর স্থিতির ন্যায় বিচিত্র। চণ্ডালমণ্ডলে যে চণ্ডাল কটঙ্ক বলিয়া খ্যাত ছিল সে পূর্ব্বেও সেই প্রকারে দৃষ্ট হইয়াছিল, বিধাতার মায়ার বিচিত্রতা প্রযুক্ত সে দেশান্তর গমন করিয়া কীররাজ হয়, এবং সেই ব্যক্তিই অগ্নিতে প্রবেশ করে। আপনার সম্বন্ধ বলিয়া প্রতিবিম্বস্বরূপে কেবল তোমারই চিত্তে কটঙ্কের আচারের অবস্থান ঘটিয়াছিল (অন্যের চিত্তে নহে)। যাহারা অজ্ঞানী তাহারা আমি সেই, আমি এই, আমার জন্ম এই প্রকার, এইরূপ অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি, আমিই সকল বস্তু (আমি ভিন্ন অন্য বস্তুই নাই) এইরূপ বোধ করিয়া অবসন্নতা প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি পদার্থ বিষয়ে অনর্থ চিন্তা করেন না, সেই জন্য ভ্রম মোহাদিতে তাঁহাকে মগ্ন হইতে হয় না। তোমার জ্ঞানের পূর্ণাবস্থা হয় নাই বলিয়া তুমি মনের ভ্রম নিবারণ করিতে

সমর্থ হও নাই, সেই জন্য উহা ক্ষণে ক্ষণে তোমায় আক্রমন করিয়া থাকে। মন সর্ব্ব প্রকারে এই মায়াচক্রের নাভি সদৃশ; যদি তাহাকে আক্রমণ করিয়া স্থিতি করিতে পার, তাহা হইলে আর কোন বাধার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তুমি এই গিরিকুঞ্জে দশ বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে তপস্যা করিতে থাক, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।" কমলাপতি এই বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

গাধি ভগবানের কথা অনুসরণ করিয়া দশ বৎসর ঘোরতর তপস্যার পর দিব্যজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) লাভ করিলেন। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক ভয় ও শোকাদি পরিহার পূর্ব্বক পূর্ণকলাশোভী শশধরের ন্যায় (জীবন্মুক্তরূপে) চিত্তের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন।*

ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে "মহম্মদের স্বপ্ন" বলিয়া ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ প্রচারিত আছে। দুইটির তুলনা করিয়া দেখিবেন। সত্য সকল দেশে সকল সময়েই এক।

---

(২১)

বৌদ্ধ ধর্ম্মের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। স্থূলত বুদ্ধদেব প্রকাশিত ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্ম। কালসহকারে মূল বৌদ্ধধর্ম্মের উপর অনেক লতাপাতা উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বলিলে মূল বৌদ্ধ ধর্ম্মই বুঝা উচিৎ। এখনকার দিনে হাওয়ার গুণে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যাহার আলোচনা করেন, তাহাই শাস্ত্র, আর তাঁহারা যাহা ভাল বলেন তাহাই ভাল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ—হড্‌সন, বিল, বর্ণফ্, সেনার্ট, আর্ণল্ড প্রভৃতি—যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন তখন তাহা নিশ্চয়ই ভাল ধর্ম্ম। তাই আজি ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে সভাসমিতি দেখিতে পাইতেছি। বলিয়া রাখি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা ইহাকে যে Religion of Humanity বলিয়াছেন তাহাও ভ্রম। সকল ধর্ম্মই এক হিসাবে "মানবীয়ধর্ম্ম" বা মানবীয় আদর্শ ধর্ম্ম। উক্ত পণ্ডিতগণ যে এই ধর্ম্মকে ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম বলেন, তাহাও প্রকৃত নহে। বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের শাখা-বিশেষ বলাই সঙ্গত।

---

*ভূ-কৈলাস রাজ-বাটীর সংস্করণ।

অনেক হিন্দু বুদ্ধদেবকে নবমাবতার বলেন। এক সময়ে অর্থাৎ রাজা অশোক হইতে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে একটি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিপুল বিস্তার হয়। এখনও ভারতের কাশ্মীরে, নেপালে, ভূটানে, সিকিমে, আসামে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। এখনও কাবুল ও রুষিয়ার কতক স্থানে বৌদ্ধমতাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও তিব্বৎ, চীন, মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া, লাপ্‌লাণ্ড, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, ব্রহ্ম, শ্যাম বৌদ্ধধর্ম্ম মানেন। দ্বীপের মধ্যে এখনও সিংহল, বালিদ্বীপ, জাপান, নিউকেনদ্বীপ, কোরিয়াদ্বীপ, যবদ্বীপ বৌদ্ধধর্ম্ম মানেন। সমুদয় পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১২৫ কোটী বলিলে পঞ্চাশ কোটী বৌদ্ধ হয়। যে ধর্ম্ম এত অধিক লোকের অবলম্বন সে ধর্ম্মে পরকালের, দেবগণের, যোগের, কোন কথা আছে কি না একবার দেখা উচিৎ। বাবু রাম দাস সেন তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্য গ্রন্থে বলিয়াছেন যে নেপালবাসী বৌদ্ধেরা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের চৌরাশি সহস্র পুস্তক আছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক পুস্তকও আছে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুনগরে (বর্ত্তমান কোহানা) জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব শাক্যমুনি বা সিদ্ধার্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি হইলেও বুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম্মকে লোকে নাস্তিকতা বলিত। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে, শ্রীমদ্ভাগবতে, বায়ুপুরাণে, কল্কীপুরাণে, শম্ভুপুরাণে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে। বিখ্যাত অভিধানপ্রণেতা অমর সিংহ ও হেমচন্দ্র প্রভৃতিও বৌদ্ধ ছিলেন।

বুদ্ধকে নাস্তিক বলিবার পূর্ব্বে বুদ্ধদেব কি কি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা দেখা উচিৎ। "লঙ্ঘন, সর্ব্বাগ্রে গমন, লিপি, মুদ্রা গণনা, সংখ্যা, সালম্ভ ধনুর্ব্বেদ, ধাবন, উল্লম্ফন, সন্তরণ, বাণনিঃক্ষেপ, হস্তীগ্রীবা, অশ্বপৃষ্ঠ, রথ, ধনু, ধ্বজৈস্থৈর্য্য, সামর্থ্য, শৌর্য্য, বাহুব্যায়াম, অঙ্কুশগ্রহ, পাশগ্রহ, যানের উর্দ্ধ ও অধোভাগ দিয়া নির্য্যাণ, মুষ্টিবদ্ধ, শিখাবদ্ধ, ছেদ্য, ভেদ্য, তরণ, আস্ফালন, অক্ষুণ্ণবেধিত্ব, মর্ম্মবেধিত্ব, শব্দবেধিত্ব, দৃঢ় প্রহারিত্ব, অক্ষক্রীড়া, কাব্য, ব্যাকরণ, গ্রন্থরচন, রূপ, রূপকার্য্য, অধ্যয়ন, অগ্নিকর্ম্ম, বীণা, বাদ্য, নৃত্য, গীত, পাঠ, আখ্যান, হাস্য, স্ত্রীনৃত্য, নাট্য, অনুকরণ, মাল্যগ্রন্থন,

সংবাহন, মণিরাগ, বস্ত্ররাগ, ইন্দ্রজাল, স্বপ্নাধ্যায়, কাকচরিত্র, স্ত্রীলক্ষণ, পুরুষলক্ষণ, অশ্বলক্ষণ, হস্তীলক্ষণ, গোলক্ষণ, অজলক্ষণ, মিশ্রিত লক্ষণ, কৈটভেশ্বর লক্ষণ, নির্ঘণ্ট, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞকল্প, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগ, ক্রিয়াকল্প, বৈশেষিক, বেশিক, অর্থবিদ্যা, বার্হস্পত্য আশ্চর্য্য বিদ্যা, অসুরবিদ্যা, মৃগপক্ষীর শব্দজ্ঞান, হেতুবিদ্যা, জতুযন্ত্র, ধাতু বস্ত্র, মধুচ্ছিষ্টকৃত, সূচীকার্য্য ইত্যাদি সকল বিদ্যায় কুমার সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শীত্ব প্রদর্শন করিলেন।"* পাঠক দেখিবেন কুমারের বেদ ও তন্ত্র দুইই জানা ছিল—শ্রুতিধৃত বিদ্যাও ছিল, এরূপ লোক কখনও নাস্তিক হইতে পারে না। হায়'ভারসিটি!

তারপর তাঁর তপস্যার কালে দেখুন। তিনি তপস্যার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি কেহ অগ্নি চায় তবে তাহাকে শুষ্ককাষ্ঠের সঙ্গে শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে হইবে। আমি কামনার বিষয় সকল হইতে শরীর ও চিত্ত দূরে অবস্থিত করিব। এবং কামনার আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া যাহাতে আত্মার পুনরাগমন ও শরীর ক্লেশ উৎপন্ন হয় ঈদৃশ বেদনা (জ্ঞানকে) অবরোধ করিতে হইবে। অতএব আমি মনুষ্যধর্ম্ম হইতে আর্য্যোচিত জ্ঞান ও দর্শন বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সক্ষম।" নৈরঞ্জনা নদীতীরে তিনি ছয় বর্ষকাল মহাঘোর সুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ও শেষে অনশনব্রতধারী হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্বাসপ্রশ্বাস অবরোধক আস্ফানকধ্যান অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি আরম্ভ করিলেন। "অকল্পং তদ্ধ্যানমবিকল্পমনিঙ্গনমপনীতমস্পন্দনং সর্ব্বত্রানুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চানিঃসৃতং" এই কথা "ললিতবিস্তর" গ্রন্থ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, সংকল্পবিবর্জ্জিত চেষ্টাহীন স্পন্দরহিত সর্ব্বানুগত অথচ সর্ব্বস্থান হইতে বিনিঃসৃত এইরূপ সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।†

আস্ফানক বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে সমাধি সম্বন্ধে একটা কথা বলা উচিৎ। যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে আমরা চমৎকৃত হই সেই য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রকৃত উন্নতিই করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সমাধি কি আদৌ বুঝেন না—বুঝিবার ক্ষমতা নাই। কার্য্যকরী শক্তি দূরে থাক্ সাত্ত্বিকতা অভাবে ইহার বর্ণনাও বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

*শাক্যমুনিচরিত হইতে। অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।
†"শাক্যমুনিচরিত।"

দেব রামকৃষ্ণ পরমহংসের সমাধি উল্লেখ করিয়া মোক্ষমূলর কি বলিয়াছেন, তাহা একবার শুনিবেন?

He (Ramkrisna) seems from the very first to have practised that very severe kind of asceticism (যোগ) which is intended to produce trances (সমাধি) and ecstatic utterances. We can not quite understand them, but in the case of our Mahatman we can not doubt their reality, and can only stand by and wonder, particularly when so much that seems to us the outcome of a broken frame of body and an overwrought state of mind, contains, nevertheless so much that is true and wise and beautiful. * * * * While meditating on him (Krisna), his heart full of the burning love of God, the features of the Mahatman would suddenly grow stiff and motionless, his eyes lose their sight, and while completely unconscious himself, tears would run down his rigid, pale, yet smiling face. His disciple says "who will fathom the depth of that insensibility which the love of God produces? But that he sees something hears and enjoys, when he is dead to the outward world, there is no doubt, or why should he in the midst of that unconsciousness burst into flood of tears, and break out into prayers, song and utterances, the force and pathos of which pierce through the hardest heart and bring tears to eyes that never wept before through the influence of religion."?

I have given this description as I find it. I know I can trust the writer, who is a friend of mine and has lived long enough in England and in India to be able to distinguish between the language of honest religious enthusiasm and the empty talk of professional impostors. The state of religious exaltation as here described has been witnessed again and again by serious observers of exceptional psychic tastes. It is in its essence something like our talking in sleep, only that with a mind saturated with religious thoughts and with the sublimest ideas of goodness and purity, the result is what we find in the case of Ramkrisna, no mere senseless hypnotic jabbering; but a spontaneous outburst of profound wisdom clothed in beautiful poetical language. His mind seems like a Kaleidoscope of pearls, diamonds, and sapphires, shaken together at random but always producing precious thoughts in regular beautiful outlines.

* * *

F. Maxmuller.

(in Nineteenth Century for August 1896.)

অর্থাৎ—রামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই সেই যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন, যাহার পরিণতি সমাধি এবং তদবস্থায় বাক্যস্ফূর্ত্তি। আমরা ইহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারি না। তবে রামকৃষ্ণের পক্ষে তাহা সত্য নয় বলিয়া সন্দেহও করিতে পারি না। আমরা যাহা ভগ্নদেহের এবং অধিক মস্তিষ্কচালনের ফল মনে করি, তাহারই মধ্যে সত্য জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই; তখন আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবারই কথা। * * * * প্রেম-ভক্তির আবেগে পূর্ণ প্রাণে রামকৃষ্ণ যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভাবিতেন তখন সহসা তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্ত অসাড় অবশ হইয়া পড়িত, চক্ষু দৃষ্টিহীন হইত আর সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেও তাঁহার স্থির, পাণ্ডুবর্ণ অথচ হাস্যময় মুখমণ্ডল অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া যাইত। তাঁহার শিষ্য বলেন—"ভগবানের প্রেমে যে সংজ্ঞাহীনত্ব আসে সে সমাধির গভীর গাঢ়তার ইয়ত্তা কে করিবে? লোকের চক্ষে সম্পূর্ণ মৃতকল্প হইলেও তিনি যে অন্তরে অন্তরে কিছু দেখিতেন কিছু শুনিতেন আর আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। নহিলে সহসা তাঁহার নয়নযুগল অবিরল বাষ্পবারি বর্ষণ করিত কেন? সহসা তিনি মন্ত্র পাঠ করিয়া কি গান ধরিয়া কি কথা কহিয়া উঠিতেন কেন?

যে একবার সে শক্তিময়ী করুণাময়ী কথা শুনিয়াছে, ধর্ম্মের আবেগে কখনও চক্ষে জল ফেলে নাই এমন পাষাণের পাষাণ মানবের চক্ষু ফুটিয়া ও সেই মর্ম্মভেদী কথা জল আনিত।

যেমন বর্ণনা পাইয়াছি, সেইরূপই প্রকাশ করিলাম। লেখক আমার একজন বন্ধু যিনি ইংলণ্ড ও ভারতে অনেকদিন বাস করিয়াছেন এবং যাঁহার, ব্যবসায়ী বুজ্‌রুকের বচন ও অকপট সাধকের ভক্তির উচ্ছ্বাসের প্রভেদ বুঝিতে বাকি নাই। সে লেখককে আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারি। যথার্থ আধ্যাত্মিকরহস্যবিদ্ মর্ম্মী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুন পুন এই সমাধির অবস্থা অবলোকন করিয়াছেন। ইহা কতকটা কোন লোকের সুপ্তাবস্থায় কথা কহার মত তবে বিশেষ এই যে লোকটার মন সৌজন্য পবিত্রতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্বে ও ভাবে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। রামকৃষ্ণের পক্ষে তাহার ফল এই হইয়াছে যে তাঁহার বাক্যাবলী নিদ্রিতের অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য না হইয়া, হইয়াছে কি, না, গভীর জ্ঞানের স্বাভাবিক বিকাশ অথচ যে ভাষায় তাহার প্রকাশ তাহা মনোময়ী ও কবিতাময়ী। তাঁহার মন মুকুতাখচিত হীরকোজড়িত বৈদুর্য্যকরকাময় ভাব ও বর্ণবিভ্রম উৎপাদক কালিডোস্‌কোপ যন্ত্রবিশেষ। ইচ্ছানুসারে কম্পন-চাঞ্চল্য সংঘটন করিলে যন্ত্রটি যেন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে অমূল্য ভাব-রত্নরাজি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে।

এফ্, মোক্ষমূলর।

(১৮৯৬ সালের আগষ্ট মাসের নাইনটীন্থ সেঞ্চুরী নামক পত্রে।)

য়ুরোপীয় পণ্ডিতের কথা য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মুখেই প্রকাশ হইল। ইহার উপর টীকা টীপ্পনীর আর প্রয়োজন কি? মোক্ষমূলর বলিতেছেন "আমরা ইহা বুঝিতে পারি না।" হরিবোল হরি! তবে সমাধি কি বুঝিবার জন্য ঘর অনুসন্ধান করুন।

ক্রমশঃ।

বিদায়।

মুছ মুছ অশ্রুকণা বিদায়ের কালে,
না মুছিলে অশ্রুনীর,
প্রাণ যে হয় অধীর,
বিষাদ বেদনা বিঁধে হৃদয়ের তলে,
না মুছিলে অশ্রুকণা বিদায়ের কালে।

জান না কি'নিল বালা,
হৃদয়ের কত জ্বালা,
দহিবে সতত মোরে কথা মনে হলে,
ফেল যদি অশ্রুবারি বিদায় যাচিলে।

(এখন) এস বল হাঁসি মুখে,
দেখে যাই মন সুখে,
ফুটন্ত কমলখানি অধরের কোলে,
মুছ না ও রাঙ্গাছবি নয়নের জলে।

প্রেমের লতিকা ডোরে,
বাঁধা আছি চির তরে,
ছিঁড়িতে পারে কি স্মৃতি হৃদয় বন্ধন,
যদিও দুরান্তে কেন করি না গমন।

চাঁদের কিরণ যথা,
কানে কানে কয় কথা,
কুমুদিনী রহে ধরা শতেক যোজন,
কিরণে জড়ায়ে, দোঁহে নিত্য আলাপন।

তেমতি তোমার সনে,
আলাপন মন-প্রাণে,
ভাষার গভীর স্রোত হয়ে বহমান,
ভালবাসা কণামাত্র যথা বর্ত্তমান।

তবে গো কাঁদিস কেন,
কাঁদাস কেন বা হেন,
কেন গো বাড়াস আর বিরহের ভার,
দলে গেছে চাপ ভরে হৃদয় আমার

শ্রীঃ

সৎকার্য্যবাদ।

কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ মাত্রই সৎ অর্থাৎ নিত্য; প্রতি কার্য্যেরই ত্রৈকালিক সত্তা আছে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; এই তিন কালেই যাবতীয় কার্য্যজাত বিদ্যমান থাকে, কোন পদার্থেরই বিনাশ হয় না; ইহাই সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ। আজ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সেই সৎকার্য্যবাদের আলোচনা করিব।

আচার্য্য মহাশয় বারেণ্ডায় বসিয়া অনন্যচিত্তে কি যেন ভাবিতেছেন, আর এক একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ মাথা নাড়িতেছেন; এমন সময় প্রিয়শিষ্য সুবোধ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

ভট্টাচার্য্য মহাশয়! "সতঃ সজ্জায়তে" ইহা কাহার মত?

আচার্য্য বলিলেন—উহা সাংখ্যের মত।

সুবোধ। কথাটা আমাকে একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য। সতঃ সত্তাশ্রয়াৎ ভাবাদেব সৎ (কারণ ব্যাপারাৎ প্রাগপি) কারণাবস্থারূপ সূক্ষ্মরূপেণ বিদ্যমানং জায়তে কারণব্যাপারাদভিব্যজ্যতে ইত্যর্থঃ। সৎ অর্থাৎ ভাবরূপ কারণ হইতে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান পদার্থের আবির্ভাব হয়; সুতরাং বলিতে হইবে যে, যাবতীয় কার্য্যসমূহ স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। কারণ ব্যাপার দ্বারা সেই কারণাবস্থ সৎপদার্থের আবির্ভাব হয় মাত্র।

সুবোধ। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য। যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, ঘট উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও সেই মৃত্তিকাতে ঘট সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। তারপর কারণ ব্যাপার অর্থাৎ কুলাল চক্র দণ্ডাদির যথাযথ প্রক্রিয়া দ্বারা সেই কারণাবস্থ সূক্ষ্মরূপী ঘট স্থূলরূপে আবির্ভূত হয়, তখনই স্থূলদর্শী আমরা সেই স্থূলভাবাপন্ন ঘট প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সূক্ষ্মদর্শী সাংখ্যাচার্য্য কিন্তু মৃত্তিকাতেও সূক্ষ্মরূপে ঘটের সত্তা অনুভব করেন। এইরূপ তন্তুতে পটের সত্তা, বীজে অঙ্কুরের সত্তা ইত্যাদি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সুবোধ। "অসতঃ সজ্জায়তে" ইহা কাহার মত?

আচার্য্য। অভাব-কারণ-বাদী বৌদ্ধগণ বলেন যে "অসতঃ সজ্জায়তে,"

অর্থাৎ নিরুপাখ্য অভাব হইতে ভাবরূপ বস্তুর উৎপত্তি হয়। যথা—বীজনাশান্তর অঙ্কুরের উৎপত্তি, দুগ্ধনাশান্তর দধি প্রভৃতির উৎপত্তি ইত্যাদি। তাঁহারা বলেন যে—

"কার্য্যভাবা অভাবকারণকাঃ কার্য্যত্বাৎ,
বীজনাশোত্তর জাতাঙ্কুরাদিবৎ।"

সুবোধ। তাঁহাদের এই মতের উপর ত আপত্তি হইতে পারে, সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, কিন্তু কৈ? সূত্রের ত বিনাশ হয় না; বস্ত্রে বহুসংখ্যক সূত্র সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত।

আচার্য্য। হাঁ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে ইহাতে দোষ হয় না, কেন না বস্ত্রোৎপত্তির পর সূত্র সমূহের বিনাশ তাঁহাদের মতে স্বীকার্য্য। যদি তাঁহারা বস্ত্র উৎপন্ন হইলে সূত্র সমূহের বিনাশ স্বীকার না করিতেন, তবে এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত হইত। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এই যুক্তি প্রদান করেন যে "যদি বস্ত্র উৎপন্ন হইলে সূত্র সমূহ বিনষ্ট না হইত, তবে নির্ম্মিত বস্ত্রকেও সকলে সূত্র সমূহ বলিয়াই ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহা কেহ করে না, বস্ত্রকে কেহই সূত্র সমূহ বলে না, পরন্তু বস্ত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করে। তাঁহারা অনুমান করেন যে—"তন্তবো নষ্টাঃ তন্তুব্যবহারাভাবাৎ, পটরূপেণ ব্যবহারাচ্চ।"

সুবোধ। তবে সাংখ্যাচার্য্য অভাবকারণবাদী বৌদ্ধগণকে কি বলিয়া নিরস্ত করেন?

আচার্য্য। তিনি তাঁহাদের মতের উপর এই দোষ দেন যে, নিরুপাখ্য অভাব হইতে সুখদুঃখ মোহাত্মক শব্দাদি ভাব পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেন না সৎ ও অসৎপদার্থের তাদাত্ম্য নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং তাহাদের মতে কার্য্যের কারণাত্মকত্ব উপপন্ন হয় না।

সুবোধ। এ সম্বন্ধে ন্যায় ও বেদান্তের মত কি? এবং বৈশেষিকগণই বা এ-সম্বন্ধে কি বলেন?

আচার্য্য। নৈয়ায়িকের মতে "সতোঽসজ্জায়তে," অর্থাৎ সৎকারণ হইতে অসৎপদার্থসমূহ সমুৎপন্ন হয়। কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করা হয় না। কারণ ব্যাপারের পরেই যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। যথা মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি, এই ঘট উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে

তাঁহারা তৎকারণীভূত মৃত্তিকাতে ঘটের সত্তা স্বীকার করেন না। বৈশেষিকগণেরও এ সম্বন্ধে একই মত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, "একস্য সতো-বিবর্ত্তঃ কার্য্য জাতং, ন বস্তু সৎ।" এই জগৎপ্রপঞ্চ ত্রৈকালিকবাধ রহিত অপরিণামী সৎ অর্থাৎ নিত্যপদার্থের বিবর্ত্ত*। বাস্তবিক ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। ব্যবহারিক সত্তা আছে মাত্র। যেমন শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান হইলেও ভ্রান্তব্যক্তির অনুভব সিদ্ধ বলিয়া, সেই অধ্যস্ত রজতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম পদার্থে জগৎপ্রপঞ্চ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান না হইলেও সর্ব্বসাধারণের স্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া তাহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করা হইয়া থাকে।

সুবোধ। সাংখ্যাচার্য্য ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্তমতের উপর কি দোষ প্রদান করেন?

আচার্য্য। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ সৎ কারণ হইতে অসৎ কার্য্য সমূহের উৎপত্তি স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের মতে ও কারণের কার্য্যাত্মকত্ব উপপন্ন হয় না, কেন না সৎ ও অসৎ পদার্থের তাদাত্ম্য কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। আর বৈদান্তিকের বিবর্ত্তবাদে কার্য্যসমূহের (অধ্যস্ত সত্তা স্বীকার করিলেও) বস্তুতঃ অসত্বহেতু কারণের কার্য্যাত্মকত্ব উপপন্ন হয় না, কেন না সৎ ও অসৎ পদার্থের তাদাত্ম্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর কারণের কার্য্যাত্মকত্ব সিদ্ধ না হইলে জগৎকারণীভূত প্রধানের সিদ্ধি হয় না। সাংখ্যাচার্য্য কারণকে কার্য্যাত্মক বলেন বলিয়াই সুখদুঃখ-মোহাত্মক এই জগৎ প্রপঞ্চের কারণরূপে সুখদুঃখমোহাত্মক প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির সিদ্ধি হয়। প্রধান যে জগতের কারণ তাহা শ্রুতি সম্মত। অতএব প্রধান সিদ্ধির জন্য কারণের কার্য্যাত্মকত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। তাহা স্বীকার করিতে হইলে "সতঃ সজ্জায়তে" এই মত অবলম্বন করিতেই হইবে।

সুবোধ। আচ্ছা। অপর মত নিরাকরণের জন্য আর বিশেষ কিছু

*"স্বাজ্ঞানকল্পিতঃ স্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যঃ পরিনাম-বিলক্ষণোবিবর্ত্তঃ।"
ইতি লাক্ষণিকাঃ।
যাহা প্রকৃত পদার্থের অজ্ঞাননিবন্ধন পরিকল্পিত হয় এবং সেই যথাস্থিত পদার্থের জ্ঞান হইলে নিবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। উহা পদার্থের পরিণাম নহে। যথা—রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

বলিবার আবশ্যকতা নাই। আপনি আমাকে সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদটাই আরও একটু বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য। আচ্ছা, তাহাই বলিতেছি; একটু মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিও। সাংখ্যাচার্য্য বলেন—"নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ।" নরশৃঙ্গতুল্য অসৎপদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। সুতরাং বলিতে হইবে যে কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেও কারণে কার্য্যের সত্তা আছে। যদিও বীজ এবং মৃৎপিণ্ডাদির বিনাশান্তর অঙ্কুর এবং ঘটাদি উৎপন্ন হয়, তথাপি বিনাশের কারণত্ব বলা যাইতে পারে না; পরন্তু বীজাদি-অবয়বরূপ-ভাব-পদার্থকেই কারণ বলিতে হইবে। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সামান্যতঃ অভাবমাত্র হইতেই যে কোন পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে। তাহা হইলে বীজনাশান্তর ঘটের উৎপত্তি হইতে পারিত, ঘটাভাব হইতে পটোৎপত্তি হইবারও কোনরূপ বাধা জন্মিত না। কিন্তু তাহা কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না; বীজ হইতে ঘটাদি উৎপন্ন হয় না, অঙ্কুরের উৎপত্তিই হইয়া থাকে। মৃত্তিকা হইতেও ঘটাদি ভিন্ন পটাদির উৎপত্তি হইতে কখনও দেখা যায় না। তাই কপিল-দর্শনে—"উপাদান-নিয়মাৎ" "সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ" "শক্তস্য শক্যকরণাৎ" "কারণ-ভাবাচ্চ" এই কয়টী সূত্র হেতুরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যসমূহের কারণাভিন্নত্বসূচক শ্রুতিই সৎকার্য্যবাদের উজ্জ্বল প্রমাণ।

সুবোধ। সেই সকল শ্রুতি কি?

আচার্য্য। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। আপ এবেদমগ্র আসুঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিই কার্য্য-কারণের অভেদ মূলক। কার্য্যকারণের একত্ব যদি শ্রুতিসম্মত হইল, তবে সৎকার্য্যবাদও যে শ্রুতিমূলক তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি?

সুবোধ। আচ্ছা, কার্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে ভাবরূপ কার্য্যের পুনরুৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হয়? কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেও যাহার সত্তা আছে, তাহার আবার কারণব্যাপার দ্বারা উৎপত্তি কি?

আচার্য্য। না, ইহা বলিতে পার না; কেন না তোমরা যাহাকে উৎপত্তি বল সাংখ্যমতে তাহা কার্য্যের অভিব্যক্তি মাত্র। তাঁহারা বলেন কারণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত কার্য্য কারণব্যাপার দ্বারা আবির্ভূত হয় মাত্র। অসত্বের

সত্তাকে তাঁহারা উৎপত্তি বলেন না। এমন কি অসৎপদার্থের সত্তাই তাঁহাদের মতে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। কার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থাকেই অভিব্যক্তি কহে, উহা জ্ঞানবিশেষ কিম্বা অন্য কিছু নহে। কারণব্যাপার কার্য্যের বর্ত্তমানাবস্থারূপ পরিণাম উৎপাদন করে মাত্র। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে যদি কার্য্যের সত্তা স্বীকার করা না যায়, তবে সেই অসৎ পদার্থের সত্তা সংস্থাপিত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। সহস্র শিল্পী দ্বারাও নীলকে কেহ পীত করিতে পারে না। সুতরাং কারণ-ব্যাপারের পরে যেমন পদার্থের সত্তা থাকে তদ্রূপ তাহার পূর্ব্বেও কারণে কার্য্যের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সৎ পদার্থের অভিব্যক্তি বহুভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা, পেষণ দ্বারা তিল হইতে তৈলের অভিব্যক্তি, অবঘাত দ্বারা ধান্য হইতে তণ্ডুলের অভিব্যক্তি, দোহন দ্বারা গবাদি হইতে দুগ্ধের অভিব্যক্তি ইত্যাদি। অতএব বলিতে হইবে যে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয় না, সৎ পদার্থেরই কারণ ব্যাপারের দ্বারা আবির্ভাব হয় মাত্র। সেই জন্যই তাঁহারা বলেন যে,

"কার্য্যেণ সম্বদ্ধং কারণং কার্য্যস্য জনকং,
সম্বন্ধশ্চ কার্য্যস্যাসতোন সম্ভবতি,
তস্মাৎ সৎ, ইতি।"

কার্য্য সম্বদ্ধ কারণই কার্য্যের জনক হয়। কারণের সহিত অসৎ কার্য্যের সেই সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অতএব কার্য্য সৎ অর্থাৎ নিত্য।

"অসত্ত্বেনাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ।
অসম্বদ্ধস্য চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ॥"

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা না থাকিলে সত্তাশ্রয় কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না; আর অসম্বন্ধের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অব্যবস্থিতি দোষ ঘটে, অর্থাৎ সকল (কারণ) পদার্থ হইতেই সকল (কার্য্য) পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে বালুকা হইতে তৈলের উৎপত্তি হইতে পারিত, তন্তু হইতে ঘটের উৎপত্তি হইতে পারিত ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাহা কখনও হয় না, কেন না কার্য্যমাত্রই কারণাত্মক, কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে; কারণ সৎ, সুতরাং তদভিন্ন কার্য্যকেও সৎ বলিতেই হইবে।

সুবোধ। কার্য্য যে কারণ হইতে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?

আচার্য্য। যে যাহার ধর্ম্ম, সে তাহা হইতে ভিন্ন নয়, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম। দৃশ্যমান পটতন্তু হইতে ভিন্ন নহে, পটতন্তুর ধর্ম্ম। এতদ্বিপরীত

স্থলে বলিতে হইবে যে—যে যাহা হইতে ভিন্ন সে তাহার ধর্ম্ম নহে। যথা—গো অশ্ব হইতে ভিন্ন, সুতরাং গো অশ্বের ধর্ম্ম নহে। যাহাদের মধ্যে উপাদানোপাদেয় ভাব আছে, তাহারাও পরস্পর ভিন্ন নহে; তন্তুপটের উপাদান সুতরাং পটতন্তু হইতে ভিন্ন নহে। যে যাহা হইতে ভিন্ন সে তাহার উপাদান নহে; যথা—ঘট পট হইতে ভিন্ন, সুতরাং ঘট পটের উপাদান নহে। আর যাহাদের মধ্যে সংযোগ ও প্রাপ্তির অভাব আছে তাহারাও পরস্পর ভিন্ন নহে; তন্তু ও পটের মধ্যে সংযোগ প্রাপ্তি নাই, সুতরাং তাহারা পরস্পর ভিন্ন নহে। যাহারা পরস্পর ভিন্ন তাহাদের মধ্যে সংযোগ ও প্রাপ্তি পরিলক্ষিত হয়; বদরী ও আমলকের সংযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং বদরী আমলক হইতে ভিন্ন। হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের পরস্পর প্রাপ্তির অভাব আছে, সুতরাং তাহারা পরস্পর ভিন্ন।

সুবোধ। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্ন না হইবে, তবে কুলালচক্রাদি-ব্যাপার দ্বারা মৃৎপিণ্ড ঘটরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাতে লোকে "ঘট উৎপন্ন হইল" এরূপ বলে কেন? আর ঐ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেই বা "ঘট বিনষ্ট হইল" বলিয়া ব্যবহার করে কেন?

আচার্য্য। ব্যবহার করে বটে, কিন্তু বাস্তবিকই যে সে স্থলে ঘট উৎপন্ন কিম্বা বিনষ্ট হয় তাহা নহে। উৎপত্তি এবং বিনাশ সাংখ্য মতে আবির্ভাব এবং তিরোভাব মাত্র। কার্য্য সমূহের উৎপত্তি যে আবির্ভাবমাত্র তাহা তোমাকে পূর্ব্বে একবার সংক্ষেপে বলিয়াছি, বোধ হয় তাহা তোমার মনে আছে।

সুবোধ। হাঁ, উৎপত্তি যে আবির্ভাব মাত্র তাহা একবার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিনাশকে যে তিরোভাব কহে সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। এই আবির্ভাব এবং তিরোভাবটা আমাকে একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য। যেমন কচ্ছপের হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ স্বশরীরে নিবিষ্ট হইলে তিরোহিত হয় এবং বহির্গত হইলে আবির্ভূত হয়, বাস্তবিক সে স্থলে কূর্ম্মাঙ্গ সমূহের উৎপত্তি কিম্বা বিনাশ হয় না, সেইরূপ মৃত্তিকা অথবা সুবর্ণাদি হইতে ঘটমুকুটাদি প্রকাশিত অর্থাৎ আবির্ভূত হইলে, উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং তন্মধ্যে নিবিষ্ট অর্থাৎ তিরোহিত হইলে বিনষ্ট হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক অসৎ পদার্থের উৎপত্তি কিম্বা সৎ পদার্থের বিনাশ হয় না। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

এখন বলিতে হইবে যে—যেমন সঙ্কোচীবিকাশী স্বকীয় অবয়ব হইতে কচ্ছপ, ভিন্ন নহে, তদ্রূপ ঘট মুকুটাদিও মৃৎসুবর্ণাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে।

সুবোধ। আচ্ছা। ইহা যেন হইল। "তন্তুষুপটঃ" অর্থাৎ তন্তুতে পট আছে এইরূপ ভেদ নির্দ্দেশ কিরূপে সঙ্গত হয়?

আচার্য্য। যেমন তালবন দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে "এই বনে তাল আছে", বাস্তবিক সে স্থলে তালবৃক্ষ সমষ্টিই বন, তালবৃক্ষ বন হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ "তন্তুসমূহে পট আছে" বলিলেও পট তন্তু হইতে ভিন্ন নহে; তন্তুসমষ্টিই পট। তবে ঐরূপ ব্যবহার বাক্যমাত্র।

সুবোধ। আচ্ছা, তন্তু হইতে উৎপন্ন বস্ত্রাদি নানাবিধ বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সেই সকল তন্তুবিনির্ম্মিতপদার্থ যদি তন্তু হইতে বিভিন্ন না হইবে, তবে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদিত হয় কিরূপে?

আচার্য্য। ইহা বলিতে পার না, কেন না এক পদার্থও নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। যেমন এক অগ্নি দাহ, প্রকাশ এবং পাক এই ত্রিবিধ কার্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এক তন্তু দ্বারাও বিভিন্ন কার্য্য নিষ্পাদিত হইতে পারে।

সুবোধ। আচ্ছা, তন্তুৎপন্ন পট দ্বারা প্রাবরণাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, কিন্তু তন্তু সমূহ দ্বারা ত তাহা হয় না; তবে তন্তু হইতে যে পট ভিন্ন নহে, তাহা কিরূপে স্বীকার করিব?

আচার্য্য। না, ইহাও বলিতে পার না। যেমন এক এক জন বাহক স্বতন্ত্র হইয়া শিবিকা বহন করিতে পারে না, কিন্তু দুই চারি অথবা ততোধিক বাহক মিলিত হইয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তন্তু সমূহ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রাবরণাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলেও তাহারা মিলিত হইয়া অর্থাৎ বস্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া প্রাবরণাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকে।

সুবোধ। আচ্ছা, কার্য্যকারণের অভেদ বুঝিলাম এবং কারণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত কার্য্যের কারণ ব্যাপার দ্বারা বর্ত্তমানাবস্থা অর্থাৎ আবির্ভাবকেই যে উৎপত্তি বলিয়া ব্যবহার করে তাহাও বেশ বুঝিলাম। এখন কার্য্যের যে নাশ হয় না তাহা একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন।

আচার্য্য। কপিল-সূত্রে উক্ত হইয়াছে—"নাশঃ কারণ-লয়ঃ।" কার্য্যের কারণে লয়ের নাম কার্য্যের বিনাশ, সেই বিনাশ কার্য্যের অতীতাবস্থা মাত্র। বাস্তবিক কোন পদার্থ বিনষ্ট হয় না, যেমন বর্ত্তমানাবস্থ হইবার পূর্ব্বে কার্য্যসমূহ স্ব স্ব কারণে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ বর্ত্তমানাবস্থার বিগম হইলেও অর্থাৎ অতীতাবস্থ হইলেও পুনরায় কার্য্যসমূহ স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, কোন সময়েই কার্য্যের বিনাশ হয় না।

সুবোধ। অতীতাবস্থায় যে কার্য্যের সত্তা থাকে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?

আচার্য্য। তদ্বিষয়ে যোগি-প্রত্যক্ষই প্রমাণ; যোগিগণ যে অতীত এবং অনাগত বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং ইতিহাসাদি সর্ব্বসম্মত। সুতরাং বর্ত্তমানের ন্যায় অতীত এবং অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অবস্থাতেও পদার্থের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সুবোধ। আচ্ছা, ভবিষ্যদবস্থ পদার্থ কারণব্যাপার দ্বারা বর্ত্তমানাবস্থ হয়, তাহাকেই পদার্থের অভিব্যক্তি বলে; এ সম্বন্ধে আমার একটু জিজ্ঞাস্য আছে।

আচার্য্য। যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে বল।

সুবোধ। সেই অভিব্যক্তিটা কি সৎ অথবা অসৎ? যদি সৎ হয় তবে কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেও কার্য্যের অভিব্যক্তির সত্তা স্বীকার করিতে হয়; তাহা স্বীকার করিলে কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেই কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং কারণ ব্যাপারের কোন আবশ্যকতাই থাকে না। আর যদি সেই অভিব্যক্তি অসৎ হয় তবে ত অসৎ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করা নিবন্ধন সৎকার্য্যসিদ্ধান্তের ব্যাঘাত ঘটে।

আচার্য্য। না, সৎকার্য্যসিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। সাংখ্য মতে কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে সকল কার্য্যেরই সত্তা আছে, সুতরাং অভিব্যক্তি সৎ কি অসৎ এরূপ সন্দেহই হইতে পারে না। ঘটের ন্যায় সেই অভিব্যক্তিরও অনাগতাবস্থা পরিহার পূর্ব্বক বর্ত্তমানাবস্থায় উপনীত হইবার জন্য কারণ ব্যাপারের আবশ্যকতা আছে। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে যদি তাহার অনাগতাবস্থা স্বীকার করিলাম, তবে আর সৎকার্য্যসিদ্ধান্তের ক্ষতি হইবে কিরূপে?

সুবোধ। তাহা হইলেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইল?

আচার্য্য। তাহা হইলই বা, ক্ষতি কি?

সুবোধ। তাহা হইলে ত অনবস্থা দোষ ঘটে।

আচার্য্য। অসদুৎপাদবাদী বৈশেষিকগণ যেমন ঘটোৎপত্তির উৎপত্তিকে ঘটোৎপত্তির স্বরূপ বলেন, তদ্রূপ আমরাও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তিকেও তাহার স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করি। তাহা হইলেই উৎপত্তির ন্যায় অভিব্যক্তিতেও অনবস্থা দোষ ঘটে না।

সুবোধ। তাহা হইলেও ত আপনার মতে প্রাগভাবাদি স্বীকার করিতে হইবে?

আচার্য্য। না, তুমি যেরূপ প্রাগভাবের কথা বলিতেছ, সেরূপ প্রাগভাব আমি স্বীকার করি না। আমার মতে প্রাগভাব অনাগতাবস্থামাত্র। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে সেই অভিব্যক্তির অনাগতাবস্থা ত পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি, তাহাতে আমার সৎকার্য্যবাদের কোন ক্ষতি হইবে না। অসৎকার্য্যবাদী হইতে সৎকার্য্যবাদীর বিশেষত্ব এই যে,—তাঁহারা যাহাকে প্রাগভাব ও ধ্বংস বলেন, সৎকার্য্যবাদিগণ তাহাকে কার্য্যের ভাবরূপ অনাগতাবস্থা এবং অতীতাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর বর্ত্তমানাবস্থা অর্থাৎ অভিব্যক্ত্যবস্থাকে ঘটাদি পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া থাকেন। অন্যান্য বিষয়ে কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই।

সুবোধ। তাহা হইলে সৎ কার্য্য বাদের স্থূলসিদ্ধান্ত এই হইল যে,—কার্য্যমাত্রই সৎ, সেই সৎকার্য্য সমূহের কদাপি বিনাশ হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র। অনাগতাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমানাবস্থা এবং বর্ত্তমানাবস্থা পরিহার পূর্ব্বক অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয় মাত্র। স্থূলাকারে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে স্ব স্ব কারণে কার্য্যসমূহ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, তারপর কারণব্যাপার দ্বারা সেই কারণাবস্থ সূক্ষ্মকার্য্যের আবির্ভাব হয় এবং পরিশেষে পুনরায় কারণে বিলীন হইয়া সূক্ষ্মভাবেই অবস্থান করে, সুতরাং সকল কার্য্যেরই ত্রৈকালিক সত্তা আছে। কেমন ইহাই ত তাঁহাদের মত?

আচার্য্য। হাঁ, অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না এবং সৎ পদার্থের বিনাশ হয় না। আবির্ভাব এবং তিরোভাব সৎকার্য্য সমূহেরই অবস্থান্তর মাত্র। তাই যোগাচার্য্য মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্।"

আজ এই পর্য্যন্ত, সূর্য্যদেব অস্তমিত হইয়াছেন, এখন সন্ধ্যাবন্দনা করা যাক; যাও সুবোধ, তুমিও হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক উপাসনা কর।

ধম্ম-পদং।

বালবগ্গো।

দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তস্স যোজনং
দীঘো বালানং সংসারো সদ্ধম্মং অবিজানতং। ১॥

যে জাগিয়া আছে তাহার রাত্রি দীর্ঘ, যে শ্রান্ত তাহার যোজন দীর্ঘ, যে সদ্ধর্ম্ম জানে না সেই মূর্খের জীবন দীর্ঘ। ১

চরঞ্চে জধিগচ্ছেযু সেয্যং সদি সমত্তনো
এক চরিয়ং দল্হং করিয়া নত্থি বালে সহায়তা। ২॥

পথে ভ্রমণকালে যদি শ্রেষ্ঠ বা সমতুল্য সহচর না মিলে দৃঢ়তার সহিত একাকী ভ্রমণ কর্ত্তব্য, মূর্খের সহিত সাহচর্য্য হয় না। ২

পুত্তামত্থি ধনমত্থি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি
অত্তাহি অত্তনো নত্থি কুতোপুত্তা কুতোধনং। ৩॥

আমার পুত্র আছে আমার ধন আছে মূর্খ এইরূপ বিবেচনা করে। আমিই যখন আমার নহি, তখন কোথায় পুত্র কোথায় ধন? ৩

যো বালো মঞ্ঞতি বালং পণ্ডিতো বাপি তেন সো
বালো চ পণ্ডিতমানী চ সবে বালোতি বুচ্চতি। ৪॥

যে মূর্খ আপনাকে মূর্খ বলিয়া জানে সে ততটুকু পণ্ডিত। যে মূর্খ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জানে সবাই তাহাকে মূর্খ বলিয়া কহে। ৪

যাবজ্জীবম্পি যো বালো পণ্ডিতম্পয়ে রূপাসতি
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বীসুপরসং যথা। ৫॥

হাতা চিরজীবন ঝোলের মধ্যে থাকিয়া যেমন ঝোলের স্বাদ জানে না, মূর্খ চিরজীবন পণ্ডিতের সঙ্গে থাকিয়া ধর্ম্মকে জানিতে পারে না। ৫

মুহুত্তমপি যো বিঞ্ঞূ পণ্ডিতম্পয়ে রূপাসতি
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিহ্বা সুপরসং যথা। ৬

মুহূর্ত্তমাত্রের সংসর্গে জিহ্বা যেমন সুপরস জানিতে পারে মুহূর্ত্তমাত্র পণ্ডিতের সংসর্গে বিজ্ঞজন তেমনি ধর্ম্মকে জানিতে পারে। ৬

চরন্তি বালা দুম্মেধা অমিত্তেনেব অত্তনা
করোন্তা পাপকং কম্মং যং হোতি কটুকফলং। ৭॥

অল্পবুদ্ধি মূর্খ আপনার শত্রুর ন্যায় আপনি বিচরণ করে। কারণ সে এমন দুষ্কর্ম্ম করে যাহার ফল অতি কটু হয়। ৭

নতং ধম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি
যস্স অস্সুমুখো রোদং বিপাকং পরিসেবতি। ৮॥

যে কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিতে হয়, যাহার ফল অশ্রুমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে ভোগ করিতে হয়, সে কর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে। ৮

তঞ্চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি
যস্স পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবিতং। ৯॥

যে কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিতে হয় না, যাহার ফল আনন্দমনে প্রফুল্লতার সহিত উপভোগ করা যায় সেই কর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম কর্ম্ম। ৯

মধু বা মঞ্ঞতী বালো যাব পাপং ন পচ্চতি
যদা চ পচ্চতি পাপং বালো দুক্খং নিগচ্ছতি। ১০॥

যতদিন পাপের ফলভোগ না হয় মূর্খ পাপকে মধুর ন্যায় মনে করে। যখন পাপের ফলভোগ হয় তখন দুঃখ পায়। ১০

মাসে মাসে কুসগ্গেন বালো মুঞ্জেথ ভোজনং
নসো সঙ্খতধম্মানং কলং অগ্ঘতি সোলসিং। ১১॥

ধার্ম্মিকের ন্যায় কুশাগ্রে মূর্খ যদি মাসে মাসে সামান্য আহার গ্রহণ করে, তথাপি সে ধর্ম্মজ্ঞদিগের সম্মানের ষোলভাগের এক ভাগ পাইবার উপযুক্ত হয় না। ১১

নহি পাপং কতং কম্মং সজ্জুখীরং বমুঞ্চতি
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মচ্ছন্নেব পাককো। ১২॥

পাপকর্ম্ম সদ্যদুগ্ধ ক্ষীরের ন্যায় শীঘ্র দশান্তর প্রাপ্ত হয় না। ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে জ্বলিতে মূর্খকে অনুশরণ করে। ১২

যাবদেব অনত্থায় ঞত্তং বালস্স জায়তি
হন্তি বালস্স সুক্কংসং মুদ্ধমস্স বিপাতয়ং। ১৩॥

যখন দুষ্কর্ম্ম মূর্খের জ্ঞানগোচর হয় তখন ইহা মূর্খের সৌভাগ্য বিনাশ করে এবং তাহার মুণ্ড নিপাত করে। ১৩

অসতং ভাবনমিচ্ছেয্য পুরেক্খারঞ্চ ভিক্খূসু
আবাসেসু চ ইস্সরিয়ং পূজাপর কুলেসু চ। ১৪॥

মিথ্যা যশের আকাঙ্ক্ষা, ভিক্ষুমণ্ডলীর অগ্রনিত্ব, দেবমন্দিরে প্রভুত্ব, এবং অন্য লোকের নিকট পূজা। ১৪

মমেব কত মঞ্ঞন্তু গিহীপব্বজিতা উভো
মমেব অতি বসা অসসু কিচ্ছা কিচ্চেসু কিস্মিচি
ইতি বালস্স সঙ্কপ্পো ইচ্ছামানো চ বড্ঢতি। ১৫॥

গৃহী ও পরিব্রাজক যেন মনে করে যে এই কর্ম্ম আমিই করিয়াছি, যাহা করিতে হইবে বা যাহা না করিতে হইবে সকল বিষয়ে তাহারা যেন আমার বশীভূত হয়, এইরূপ মূর্খের সঙ্কল্প। তাহার ইচ্ছা ও গর্ব্ব দিন দিন বৃদ্ধি হয়।

অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা অঞ্ঞা নিব্বাণগামিনী
এবমেবং অভিঞ্ঞায় ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো
সক্কারং নাভিনন্দেয্য বিবেক মনুব্বুহয়ে। ১৬

এক পথ সম্পদে লইয়া যায়, অন্য পথ নির্ব্বাণে লইয়া যায়। বুদ্ধশ্রাবক ভিক্ষুগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া সম্মানের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহারা সংসার হইতে মুক্তি পাইতে পাইতে যত্ন করেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

আলো, আশ্বিন। চট্টলে পর্ত্তুগীজ দস্যু, সত্যশিবসুন্দর, কলঙ্কভঞ্জন (পদ্য), মেঘদূত, শক্তি-বিজ্ঞান এই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। 'সত্য শিবসুন্দর' আর 'কলঙ্কভঞ্জন' এই দুইটি একেবারে বুঝিতে পারিলাম না। না বুঝিলাম ভাষা, না বুঝিলাম ভাব, না বুঝিলাম তাৎপর্য্য। সত্য শিবসুন্দর একেবারে ঘোরান্ধকার। কলঙ্কভঞ্জনের প্রেমে যখন দেখিলাম 'ডুবেছি রতন লাভ আশে' তখন দেখিলাম বাণিজ্য। শ্রীরাধার প্রেমে বাণিজ্য! ছি! যার উপর কলঙ্কদাম ভাসে সেই বা কিরূপ জলধি। ভাল, না হয় পশিলাম, আবার "জন্মাবধি কলঙ্কে মগন", আমরা নাচার। অপর প্রবন্ধগুলি ভাল।

সাহিত্য, ভাদ্র। মুক্তি, পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন, পোষ্টমাষ্টার (গল্প), বিদেশী গল্প (আত্মদান), সহযোগী সাহিত্যে—ছোট গল্প লেখা আর আফগান রমণীর বিবরণ; শাক্যসিংহের নির্ব্বাণমন্দির, শিশুপাঠ্য সাহিত্যে দুই খানি পুস্তকের কথা (১) নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "ছেলেখেলা" আর (২) যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "খুকুমণির ছড়া", মাসিক সাহিত্য সমালোচন। একখানি ছবি

আছে—নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর। সাহিত্যের অপরাপর প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু বাধ্য হইয়া "মুক্তি" সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে হইতেছে। বিষয়টি "মুক্তি" তাহার উপর ২১ পৃষ্ঠা ঠাস বুনন স্থল পাইকা—কিছু পাইবার প্রত্যাশা ছিল বৈ কি? প্রথমেই ভাষা দেখিয়া সে আশায় জলাঞ্জলি দিলাম, লেখক যেন বোঝা মাথায় করিয়া চলিয়াছেন, দর্ দর্ ঘাম পড়িতেছে, বোঝা ফেলিলে বাঁচেন। যদি ততটুকু অবসর নাই তবে ভার লইবার কি আবশ্যকতা ছিল? এক স্থানে দেখিলাম "পাঠক সাবধান হইবেন, আমি সাধারণ মধ্যে প্রচলিত মতের কথাই বলিতেছি। দার্শনিক অর্থ কি, তাহা বলিতে চাহিতেছি না" তাই বা কই হইল? "বৈদিক ইন্দ্র ও পৌরাণিক ইন্দ্র, বৈদিক যম ও বরুণ ও পৌরাণিক যম ও বরুণ ঠিক সমান ক্ষমতাশালী নহেন।" এ সব কি কথা? অথচ মাঝে মাঝে লেখকের বলা আছে, আমি এটা জানি না, ওটা জানি না, সেটা জানি না, অথচ মুক্তির সমন্বয় শ্রাদ্ধ সকলেই পত্র পাইয়াছেন—খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, খাটি বৈদান্তিক ও রমেশ-বৈদান্তিক; লেখক স্বয়ং বিদায়ের ভার লইয়াছেন। কিন্তু বিদায় ত দেখিতেছি অর্দ্ধচন্দ্র। এই দেখুন না (ক) মুসলমানের স্বর্গে যথেষ্ট আরামের ব্যবস্থা আছে (খ) খৃষ্টানের স্বর্গে ব্যবস্থাটা কিরূপ ঠিক জানি না। (গ) খৃষ্টানি মতে মনুষ্যের যেমন আত্মা আছে হিন্দু মতেও সেইরূপ মনুষ্যের একটা কি আছে। সেটাকে আত্মা না বলিয়া সূক্ষ্মশরীর লিঙ্গশরীর কারণশরীর প্রভৃতি গোছ একটা কিছু নাম দিলেই ভাল হয়। কোন্ নামটা ঠিক শাস্ত্রসঙ্গত হইল তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বোধ হয় মৃত্যুর পর যেটা বর্ত্তমান থাকে ও এ লোক ও লোক যাতায়াত করে ও কর্ম্মফলাদি ভোগ করে সেটা ঠিক্ আত্মা নহে।" (ঘ) মনুষ্যের অদৃশ্য, অতিমানুষ প্রকৃতি-সম্পন্ন জীব প্রকৃত অস্তিত্বসম্পন্ন কি না তাহা আমরা জানি না। তাঁহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব এ কথা কেহ বলিতে পারে না। মনুষ্যের নীচে নানাবিধ জীব আছে, উচ্চে বিবিধ দেবতা থাকিবে না, তাহা কে বলিল? সেকালের সিদ্ধপুরুষেরা এইরূপ অতি-মানুষ ক্ষমতাপন্ন জীবের দেখা পাইতেন। আমরা দুর্ভাগ্য হীনশক্তি মানুষ, আমরা তাঁহাদের দর্শন লাভে বঞ্চিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা নাই কিরূপে বলিব?" ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখক বলিতেছেন জ্ঞানোদয় হইলে কর্ম্ম ধ্বংস

হয়। জ্ঞান কি, না, অবিদ্যার লোপ। জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়, তখন বন্ধনবিমুক্তি বা মোক্ষ ঘটে। তাহা হইলে লেখকের মতে প্রত্যেক সিদ্ধপুরুষই মুক্তপুরুষ। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ এবং যোগী জানেন সিদ্ধাবস্থা আর মুক্তাবস্থা এক নহে। লেখক কর্ম্মের কথা তুলিয়াছেন কিন্তু

প্রবৃত্তং কর্ম্মসংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাং।
নির্বৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ॥

ইহাতে কি সূচিত হইয়াছে, দেখিয়াছেন কি?

এষ সর্ব্বানি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধি ক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ॥

ইহাতে কি বলা যায় যে সকল জীবেরই এক দিন না এক দিন মোক্ষ হইবে? তাহা যদি না হয় তবে

এবং য সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভেতি পরংপদম্॥

ইহা দেখান কে? এবং দেখিবার পরেরনে বস্থাটা কি? তখন কার্য্য থাকে না থাকে না?

পুণ্য, ২য় বর্ষের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, একত্রে পাইয়াছি। বিষয়গুলি এই—যজ্ঞ ও অগ্নি, ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষা, প্রাস্কোভিয়া, কবিতাগুচ্ছ, তানসেনের সাধনা, গিরিবালা (গল্প), ক্রোমোলিথোগ্রাফি, আদি মানব কে?, নাস্তিজাতির প্রথম কর্ত্তব্য, খাদ্যপাক (অর্থাৎ আমিলা, হিন্দুস্থানী বেশনি রুটি, তেলে বি মর্চা, গ্রেভিকট্‌লেট, অতীতের স্বপ্ন (পদ্য), শ্যামাপূজা (পদ্য), পুষ্পহার (গান), কালীসঙ্গীত (স্বরলিপি), সমালোচনা। কবিতাগুচ্ছের মধ্যে আছে এই কয়টি পুষ্প (ক) স্নেহে নির্ব্বাণ (খ) ভাগ্যদেবীর প্রতি (গ) কোকিল (ঘ) এককোণে। অনেকগুলি ছবি আছে। যজ্ঞ ও অগ্নি প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন যে ঋগ্বেদের অগ্নিসূক্তগুলি প্রাকৃতিক অচেতন অগ্নির জন্য নহে। "এই সকল সূক্তের প্রধান লক্ষ্য মনুষ্য অগ্নি।" আবার "প্রকৃত কথা এই যে অগ্ন্যুপাধিক ঋষিরাই যজ্ঞাদি অগ্নিসম্পর্কীয় কার্য্যে সমধিক জ্ঞানবিশিষ্ট ও সুনিপুণ বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে পৌরহিত্য প্রভৃতি প্রধান পদে নিযুক্ত হইতেন। এবং এই কারণে অগ্নি বৈদিক যুগ এবং তাহারও পূর্ব্ব হইতে লোকে সম্মানভাজন হইয়া আসিতেছেন। পাঠক এক্ষণে বুঝিলেন

* * * ঋক্‌গুলি মুখ্যভাবে অগ্নিনামা এবং অগ্নিপ্রাণ ঋষিদিগেরই স্তব করা হইয়াছে এবং এই সঙ্গে সমগ্র অগ্নির প্রতি গৌণভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক-দীপ্ত ভারতবাসীগণ কেহই এ পর্য্যন্ত বেদ পুরাণের অন্তর্নিহিত এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে যত্নবান্ নহেন। * * বৈদিক সূক্ত ও পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে অগ্নি প্রভৃতি অচেতন পদার্থের উপাসনা বুঝিয়া হেয়চক্ষে দৃষ্টি করেন।" যাহাহৌক অন্তত একজন পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক-দীপ্ত ভারতবাসী ত এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের আনন্দের কথা! পাঠক মহাশয় লেখকের জয় দিন। যেরূপ যুক্তির উপর এই তথ্য আবিষ্কৃত তাহার একটু নমুনা দেখুন। ভার্গব হইতে ভার্গ এবং ক্রমে "র" 'ল' হইয়া 'ভাল্লন' বা 'ভাস্কন' আসিয়াছে। ভার্গব নামের আর একটি আলোচনা দেখুন। "ফ্রাইডের সংস্কৃত নাম শুক্রবার। ভৃগুকুলপ্রসূত বলিয়া শুক্রমুনির আরেক (আর এক?) নাম ভার্গব। ভৃগু শব্দ ভৃজ ধাতু হইতে। ভৃজ ধাতুর অর্থ পাক করা। আমাদের দেশের ভাজি ও ইংরেজী ফ্রাই fry এই বাক্যার্থ ভৃজ ধাতু হইতে। ভাজি ও ফ্রাই শব্দের মধ্যবর্ত্তী "ফেরিজি" (খাবারের নাম, ভাজা মাংস প্রভৃতি) ভৃজির 'ভ' 'ফ'তে পরিণত হইয়া 'ফেরিজি'। ফেরিজির সংক্ষিপ্ত ফ্রাই। ভাষা পরিভ্রমণকালে 'ভ' 'ফ' হয়, উদাহরণ ইংরেজী ফাণ্ড fund যাহার অর্থ পূঁজী তাহা ভারতের ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞীয় ঘৃতাদি পূঁজী করিবার আধার 'ভাণ্ড' শব্দ হইতে আসিয়াছে। যখন পূঁজী বাড়িল তখন আর 'ভাণ্ডে' কুলাইল না, ক্রমে এই ভাণ্ড হইতে ভাণ্ডার হইল। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দিবার আবশ্যক (?) বোধ করি না।" লেখক আরও উদাহরণ দিতে পারিতেন, ডিবিসন (division) মানে হরণ, (horn) হর্ন মানে সিং, (sing) সিং মানে গান, (gun) গন মানে কামান, কমন (common) হইতে সাধারণ, (southern) সদার্ণ হইতে দক্ষিণ, (deccan) দেকান হইতে দক্ষিণাত্য এইরূপে ইংরেজী ডিবিসন শব্দ ভারতে দাক্ষিণাত্য হইয়াছে। আরও দেখা যাইতেছে ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুইটি 'ডিবিসন'। গ্রীম্ সাহেবের শবদেহ গোরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কি না তাহা ভূতত্ত্ববিদই বলিতে পারেন, আমরা কি করিয়া বলিব? যাহাহৌক এক অগ্নিকে 'প্রাকৃতিক অচেতন' মনে করিয়াই এত ফ্যাসাদ। সচেতন দেবতা মনে করিলে

আর কোন গোলই থাকে না। জঠরাগ্নিটা কি অচেতন? ভগবান গীতায় না বলিয়াছেন আমিই জঠরাগ্নি?—ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবন্ধে এবার হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিরূপে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কথা আছে। বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত শিখাইতেন, বেণীমাধব বাবু সেতার প্রভৃতি যন্ত্রবিদ্যা, কালিদাস পাল ও হোয়াইট সাহেব চিত্রবিদ্যা শিখাইতেন। হেমেন্দ্রনাথ মাতৃভক্তও ছিলেন। "হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় মাতৃদেবীর জীবন রক্ষার্থ বাহুমূল হইতে দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় তিন বর্গ ইঞ্চি পরিমিত মাংসখণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন।" কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া যখন ঠাকুরগৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন, তখনই স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন।—'প্রাস্কোভিয়া নামে রুষ বালিকা সাইবিরিয়া হইতে একাকিনী রাজধানীতে আসিয়া সম্রাটের নিকট পিতার কারামুক্তি প্রার্থনা করেন ও সফলকাম হয়েন। প্রাস্কোভিয়া তখন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল "জগদীশ্বর, আমি তোমার উপর অনন্যক বিশ্বাস স্থাপন করি নাই" কথাটা কি ঠিক? লেখক বলিতে চাহিতেছেন—ঈশ্বরে বিশ্বাস নিরর্থক হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বলি পুণ্যের অনেক স্থানে ভাষার দোষ লক্ষিত হইল। তানসেনের সাধনা।—ভাল। "ভাগবতে আছে সেই মহাশক্তিই নাদের উৎপত্তির কারণ, নাদের মূল, নাদ সাধনায় সেই মহাশক্তিতে পঁহুছান যায়। এই নাদাভ্যাসে তানসেনের সঙ্গীত ও যোগের একত্রে উন্নতি হইয়াছিল। এই নাদের প্রাণাগ্নি প্রভাবেই সম্ভবতঃ যোগী তানসেন রাজসভায় দীপকরাগ গান করিয়া কি জানি কি ক্ষমতাবলে বিকম্পন প্রযুক্ত বহ্নি মারুত প্রভাবে আকব্বরসাহার সভার দীপসমূহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া সভাস্থ জনগণকে আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিজেও সেই অনল শক্তির প্রভাবে দগ্ধকায় হইয়া মৃতকল্প হইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইতেন যদি না তাঁহার কন্যা মল্লার গাহিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতেন। মল্লার বিশুদ্ধ না হওয়াতে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে দাহ উপশম করিতে পারে নাই। আমি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের কথা দিয়া বুঝাইয়া দিব ইহা হাসিয়া উড়াইবার বিষয় নহে। আজকাল Vibration কম্পনের তারতম্য লইয়াই বর্ণ, সুর, আলোক সকলই প্রতিপন্ন হইতেছে। যোগী তানসেন দীপক রাগের কিরূপ Vibrationয়ের প্রভাবে রাজসভার বাতি

প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইতে গেলে যোগী তানসেনের ন্যায় সিদ্ধ হইতে হয়। সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন সুরের Vibration বলে যে কতরূপ প্রজ্বলনাদি কার্য্য সাধন করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা পাইয়াছেন।

Music it seems, has not only charms to soothe the savage beast, but also according to a recently developed theory, to explode Dynamite when it is approaching its critical state. Dry fulminate of mercury, which explodes at 342· Farh. exploded at 320 when a certain note was sounded close to it on *violin or cornet.* The note F exercises a mysteriuos effect on nitrogen explosions, D on fulminates, and B flat on the explosive iodide of nitrogen.

আমাদের দেশের এ সকল অলৌকিক যোগব্যাপ্যার অনেকে আছেন, তাঁহারা অবিশ্বাস করেন।" "রিবালা" একটি প্রেতাত্মার গল্প। ক্রোমোলিথো—কি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়া ছবি ছাপিতে পারা যায়, তাহার বিবরণ। "আদি মানব কে?" ইহার উত্তরে লেখক বলিতেছেন, আদম নয়, হবা নয়, মনু নয়, ব্রহ্মা নয়, আদি মানব হইতেছে বিরাট; এই কথা বলিবার জন্য লেখক বলিতেছেন সায়নাচার্য্যের ভুল, বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর ভুল, মাননীয় দত্তজ মহাশয়েরও ভুল। অর্থাৎ তাঁহারা অন্বয়ের ভুল করিয়াছেন, ক্রিয়ার ভুল বিভক্তির ভুল ইত্যাদি। শেষে লেখক বলিতেছেন মনীষিগণ ইহার সুবিচার করিবেন। আমরাও বলি "হরেক রকম বাজী ও বারুদের কারখানা ৬৬ নং" কে হরেকরকমবা জীওবা রুদেরকারখানা ডডনং, কে পড়িলেন, মনীষিগণ তাঁহার বিচার করিবেন। একটা কথা। লেখক বলিতেছেন "বিরাট্ কোন নাম নহে তখন কে তাহার নাম রাখিবে বল?" ঈশ্বরে যাহার 'প্রকৃত' বিশ্বাস আছে, তাহার নিকট এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ভাল, লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, বিষ্ণুপুরাণের মতো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বত্তশ্চাপ্যধিপুরুষঃ ইহা তিনি ত দেখিয়াছেন—এখন বিরাট স্বরাট সম্রাট অধিপুরুষ ইহারা চারি ভাই না প্রপিতামহ—পিতামহ—পিতা—পুত্র? "নারীজাতির প্রথম কর্ত্তব্য" স্ত্রীজাতি স্বামীকে

বেশী ভালবাসে না সন্তান সন্ততিকে বেশী ভালবাসে তাহার কথা। লেখক একটি গল্প বলিয়া কথাটা প্রমাণ করিতেছেন যে স্ত্রীলোক পুত্রকন্যাকেই বেশী ভালবাসে। একখানা জাহাজ ডুবি হইবার সময় কাপ্তেন বলেন যে বোটে স্ত্রীলোকেরা যাউক। তাহাতে একজন বীবী পুত্রকন্যা লইয়া বোটে যায় আর তাহার স্বামী জাহাজে থাকিয়া ডুবিয়া মরে। কথাটা কি প্রমাণ হইয়াছে?—সম্পাদিকা প্রজ্ঞাসুন্দরী আমাদের উপর বড় নিদয়া, খাদ্যপাকের দিকে ঘেঁসিবার যো নাই। সবই পেঁয়াজ দেওয়া, হিন্দু হইয়া এই বুড়াবয়সে কি করিয়া বাপু পলাণ্ডুগুলা দগ্ধোদরে দিই? ওদিকে ঘেঁসিবার যো নাই, কেন বলি, না, ঘ্রাণে নাকি অর্দ্ধেক ভোজন! সম্পাদিকা হয় জানেন না হয় কথাটা শুনিয়াছেন সুতরাং আমরা সমালোচনার দায় হইতে এড়াইলাম। যদি বলেন আমিলায় ত পেঁয়াজ নাই, তেলে কি মর্চায় ত পেঁয়াজ নাই। কথাটা ঠিক বটে তবে কি না লালকুমড়াটা হিন্দুর অখাদ্য। চিনিটা—কাশীর চিনি পাওয়া দুষ্কর, হাড়ে চিনি রিফাইন হচ্চে আর কলিকাতায় হতভাগারা মাখনে চর্ব্বি মিশাল দেয়। চিনি মাখনের আপত্তি ছাড়িয়া দিলেও লালকুমড়ার জন্য আমিলা ত্যাগ করিতে হইতেছে, আবার যখন কলাই করা হাঁড়ি নহিলে আমিলা হইবে না, তখন আমিলার সহিত অমিলই এ জীবনে রহিয়া গেল। বাকি তেলে বি মর্চা। হুঁ এটায় সৈন্ধব লবণ আছে বটে; ওদিকে আপত্তি কিছু নাই তবে শুধু বারটা কাঁচা লঙ্কা চুষিয়া কি করিব, শুধু চাটু? বিনা খরিদে শুধু ফাউ ত কেউ দিবে না। বসে বসে শুধু তব্লার আওয়াজ কে শুনে বল? আহাহারের বিড়ম্বনার পর এত মনকষ্টে কি আর "কবিতাগুচ্ছের" সমালোচন ভাল লাগে? বিশেষ বৈশাখের পুণ্যে 'শ্যামাপূজা', সমালোচন মাঘে—এ 'অতীতের স্বপ্ন', কারও ভাল লাগে?

সাহিত্য, কার্ত্তিক। সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার, ঊষা (পদ্য গল্প), সংবাদপত্রে (গল্প), পীরু-সা মিনার বা ত্রিশূল মন্দির, রাজা রামমোহন রায়, সহযোগী সাহিত্য, কবিতা-কুঞ্জ, মাসিক সাহিত্য সমালোচন। প্রথমেই প্রতীকারের দীর্ঘ ঈকার দেখিয়া একটা কথা মনে পড়িল। সাধারণীতে বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি অনেক বড়লোক লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সখ্ করিয়া লিখিবার সুবিধা বলিয়া প্রতিকার শব্দ "প্রতীকার" এইরূপ লিখিতে আরম্ভ করেন। আমরাও মহাজনের অনুসরণ করিয়াছি। দুইই

হয় বলিয়া, তখন এই কথা লইয়া মধ্যে মধ্যে তর্ক বিতর্কও হইত। এখন মনে হইতেছে—কাজটা ভাল হয় নাই, বিশেষত যখন বহরমপুরে ইহার "প্রতিকার" হইতেছে। যাহাহৌক ত্রিবেদীর ভাষাটা ভাল প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হইল। ভাবও মন্দ নহে কিন্তু অর্দ্ধপথে ছাড়িয়া দিয়াছেন। "আমার বিশ্বাস, স্বজাতি প্রেম ও স্বদেশবাৎসল্য * * উদ্দীপনা প্রদানে সমর্থ।" ইহাই যদি সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার হয় তাহা হইলে তাহা করিবে কে? "সমাজের যাঁহারা নেতা, যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা চিন্তাপটু তাঁহারা সেই মহাভাবের উদ্বোধন করিবেন, ও সেই মহাভাবকে শিরায় শিরায় সঞ্চালিত ও স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রবাহিত করিয়া দিবেন।" ভাল। কিন্তু কথাটা বুঝিতে হইবে। স্বদেশবাৎসল্য ও স্বজাতি প্রেম শিক্ষা দিবার চেষ্টা কি হয় নাই?—হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু প্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই চেষ্টা করিয়াছেন, হেমচন্দ্র করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন, যোগেন্দ্র করিয়াছেন, নবীনচন্দ্র করিয়াছেন, সুরেন্দ্র, কেশব ও নরেন্দ্রও করিয়াছেন। সকলেই করিয়াছেন যিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপেই চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনী, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠে দেখুন সেই এক চেষ্টা। কিন্তু তিনি পলাইলেন কেন? বুঝিলেন আমাদের "সমাজ" বলিয়া কোন পদার্থ নাই। 'শিক্ষিত' শব্দের অর্থ লইয়া মহা গোল। 'নেতা' 'জ্ঞানী' 'চিন্তাপটু' এ সকল কথার অর্থ লইয়া বড় বিতণ্ডা। আমার মতে রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ শিক্ষিত আর নেতা আপনার মতে মিঃ ঘোষ শিক্ষিত আবার কাহারও মতে ঠাকুর বাড়ীর লোকেরাই শিক্ষিত। ভারত সভা, লীগ্, কংগ্রেস, বিফল হইল কেন? সেই এক ভুল প্রথম হইতে হইয়া আসিতেছে। জ্ঞানী কে? যিনি কোরাণ জানেন, না যিনি বাইবেল জানেন, না যিনি বেদ জানেন, না যিনি বক্তৃতাকালে ইংলিস পোএট আর রিচার্ড মীড্ কোট করিতে পারেন? বঙ্কিম বাবুর মস্তিষ্ক কিন্তু কথাটা ধরিয়াছিল তাই তিনি নবেলে ও গীতা আনিয়াছেন তাই তিনি "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" লিখিয়াছেন, তাই তিনি কৃষ্ণ চরিত্র লিখিয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাই তিনি বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ' না হইলে বঙ্গের ও ভারতের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। ধর্ম্ম যে ভারতের প্রাণ। তাই বঙ্কিম বাবু গীতার শ্লোক আগে উচ্চারণ করিয়া পরে বন্দে মাতরং গাহিয়াছেন। লেখকের মনে প্রবন্ধ

লিখিবার সময় এ কথাটা একবারও উঠে নাই, তাহা বলা যায় না। তবে ধর্ম্মে যখন অত সম্প্রদায় কাজ কি অত গোলে, পেট্রিয়টিস্ম্ পর্য্যন্তই ভাল, এইরূপ বিচারও হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম অর্দ্ধপথে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম পর্য্যন্ত যদি না যাও তবে সমাজের অঙ্গ খুঁজিয়া দেখ একটি আধটি ব্রণ নহে সর্ব্বাঙ্গে ব্রণ দেখিবে। সামাজিক ব্যাধি ত সামান্য কথা সকল ব্যাধিরই প্রতিকার ধর্ম্ম। সম্প্রদায়ে কিছু আসে যায় না। হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিন ভগবানের ইচ্ছায় আপনা আপনি সাম্প্রদায়িক সামঞ্জস্য ও মীমাংসা আসিবে। তখন "নবজীবন-সঞ্চারের হর্ষোদ্গত অশ্রুপ্রবাহে বন্যা আসিবে; সেই বন্যাস্রোতে বিঘ্নবিপত্তি কোন্ অকূলে ভাসিয়া যাইবে।" নতুবা নহে। "উষা" বেশ। "সংবাদপত্রে" ভাল হয় নাই, যেন ছোট নাতির জ্বালায় পিতামহী কাতরা। "মিনার" মন্দ নহে। রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক পুরাণ কথা বাহির হইয়াছে। পদচ্যুত দ্বিতীয় আকবর দিল্লীর সম্রাটের নিকট বিলাত যাইবার জন্য ৭০০০০ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। আমরা ও একটা পুরাণ কথা বা নূতন কথা বলিব। ব্রাহ্মদের "গাওরে জগপতি জগবন্দন" গানটি শুনিয়া অনেকেই মোহিত হন। কিন্তু গানটি তুলসীদাসের গান। দুইটি গান দেখুন, তাহা হইলেই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঝিঁঝিট। ঠুংরি।

গাওরে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্মসনাতন পাতক নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক মনোমদ মঙ্গল দাতা, বিদ্যাসম্পদ বুদ্ধিবিধাতা,
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেমসুধা চিত্তচকোরে॥

ভজন।

গাইয়ে গণপতি জগবন্দন, শঙ্কর সুয়ন ভবানীনন্দন
সিদ্ধি সদন গজবদন বিনায়ক
কৃপাসিন্ধু সুন্দর সুবলায়ক॥

মোদক প্রিয় মুদ মঙ্গলদাতা বিদ্যাবারিধি বুদ্ধি বিধাতা
মাঙ্গত তুলসীদাস করযোড়ে
বসহিঁ রামসিয় মানস মোরে॥

উৎসাহ, ১৩০৬ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। অনেক দিনের পর আবার উৎসাহের দর্শন পাইলাম। বলিতে কি উহার দর্শন বিষয়ে আমরা এক প্রকার

হতাশ্বাস ও ভগ্নোৎসাহই হইয়াছিলাম। এবারকার বিষয়গুলি এই—আহিরিণী (পদ্য), দেশ ভ্রমণ, স্বদেশে ইংরেজ, প্রেম-বৈচিত্র (উপন্যাস), প্রলয়ের ধূমকেতু, চৌ-ঘাট, খুকুমণির ছড়ার সমালোচন, রাজা রামানন্দ রায় ও কবিতাকুঞ্জ। দেশ ভ্রমণ অর্থে পাইলাম, রেলওয়ে শকটে একজন বেশ্যার সঙ্গে কথোপকথন। উৎসাহ আবার সাধুসমাজে এই সংবাদ প্রচারে উৎসাহী। কে বলে জল বলে জলধর, সজল জলধর নহে? "বিদেশীয়দের প্রতি স্নেহশীল না হ'লেও বিনা কারণে ইংরেজরা কাহারও উৎপীড়ন বা অনিষ্ট করিতে অগ্রসর হয় না।" এইটুকু পাইলাম "স্বদেশে ইংরেজ" প্রবন্ধে, কিন্তু কথাটা স্বদেশের না বিদেশের, বুঝা গেল না। আবার "সচরাচর ইংরেজ বিনয়ী না হ'লেও রুক্ষ নহে"। লেখক শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস যখন দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তখন সমালোচন হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। "চৌ ঘাট" আবার ভ্রমণ বৃত্তান্ত কিন্তু ভীমরূলে অবসান। এবারকার প্রবন্ধ হইতেছে রাজা রামানন্দ রায়।

সালঙ্করা ভাষা ও মনোহর ভাবরাজি রাজা রামানন্দ রায়ের মধুর লেখনীর কতদূর নিকটবর্ত্তী থাকিত, তাহা দেখাইবার জন্য জগন্নাথবল্লভ নাটকের দুইটীমাত্র সঙ্গীত এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

হীনং পতিমপি ভজতে রমণী।
কেশরিণং কিমু কলয়তি হরিণী॥
রাধিকে পরিহর মাধব রাগময়ে॥ ধ্রু॥

ক্ষীণে শশিনিচ কুমুদবনীয়ং।
ভজতি ন ভাবং কিমুরমণীয়ং॥
সুখয়তি গজপতি রুদ্রনরেশং।
রামানন্দ রায় গীত মনিশং॥

মুঞ্জতর গুঞ্জদলি কুঞ্জমতিভীষণং।
মন্দমরুদগুরগ গন্ধকৃতদূষণং॥
সকলমেতদীয়িতং।
কিঞ্চগুরু পঞ্চশর চঞ্চলং মম জীবিতং॥
মত্তপিক দত্তরুজ মুত্তমাধিকরং বনং।
সঙ্গসুখমঙ্গমপি ভুঙ্গভঙ্গভাজনং॥
রুদ্র নৃপমাত্ত বিদধাতু সুখসঙ্কুলং।
রামপদধাম কবি রায়কৃতমুজ্জ্বলং॥১

* * * *

১বৈষ্ণব কবি লোচনদাস এই দুইটী সংস্কৃতপদের ভাবানুবাদ নিম্নলিখিত সুমধুর পদদ্বয়ে প্রদান করিয়াছেন—

ভারতী, আশ্বিন। এই সূচী—তুমি বুঝি মনে ভাবো (গান), ভিখারী সাহেব, শিশু-তত্ত্ব, একাদশীর সোয়ারী, তাড়িৎ পদার্থ কি, হরি সিং পেয়াদা, দ্বাদশ স্বীকার্য্য বর্জ্জিত জ্যামিতি, অভিশাপ (পদ্য)। প্রথম গানটা ফুটে নাই। শুধু লবণে হয় না; শুধু ঝালে হয় না, লুণ ঝাল সমান হওয়া চাই, তবে ত আস্বাদ। "ভিখারী সাহেব" একটি গল্প কিন্তু এরূপ অসম্ভব গল্পে রোমান্স ও চমকাইয়া উঠে। শিশুতত্ত্ব লেখক বলেন যে মানুষ অতি প্রাচীনকালাবধি যে যে দশার ভোগ করিয়াছে তাহা তাহাকে একবার নিজের জীবনে ভোগ করিতে হয়। গর্ভাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে অসভ্য আদিম অবস্থার অভিনয় করিতে হয়। লেখক এই কথা বলিতেছেন একজন বিলাতী গ্রন্থকারের দোহাই দিয়া। তাঁহার নাম হেন্‌রি ড্রমণ্ড। পুস্তক খানির নাম Ascent of Man। সাহেবের কথা বলিয়া, হিন্দুর কথার, মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি দশ অবতারের কথার ও চৌরাশী লক্ষ যোনি

আর মঝুবাণী শুনহ রাই।
মাধব রাগ পরিহর ঘর যাই॥ ধ্রু॥

অকৃতি পতি যদি হয় গুণহীন।
তবু কুলকামিনী তাক অধীন॥
কেশরী অলখি না ভুলত হরিণী।
সুশীতল চাঁদ না ভজত নলিনী॥
কুল-বনিতাগণ এমত বেভার।
পর পুরুষাধিগমন দুরাচার॥
এত শুনি নাগরী হওল উদাস।
আশ্বাস করত দীন লোচনদাস॥

গুঞ্জ অলি মুঞ্জবহু কুঞ্জে মন মাতিয়া।
মত্তপিক দত্ত রবে ফাটে মধু ছাতিয়া॥
বল্লীযুক্ত মল্লীফুল গন্ধ সহ মারুতা।
কুন্দকলি শৃঙ্গ অলিবৃন্দ কাঁহু নৃত্যতা॥
সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া।
কান্ত বিনু ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহু বাঁচিয়া॥ ধ্রু॥
ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গে রস পূরিয়া।
অঙ্গমঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া॥
পশুমঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশুপাখিরে।
বল্লী নব কুঞ্জ ভেল তুঙ্গ ভয় ভাজিরে॥
গচ্ছসখি পুচ্ছ কিবা আনি দেহনা হরে।
স্পর্শসুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে॥

ভ্রমণের কথার কেবল মাত্র টীকা না করিয়া একটু আলোচনা করিলে উপাদেয় হইত। বিজ্ঞান বা ফিলজফী লিখিতে গেলে, আমরা যরাবর বলিয়া আসিতেছি, এলান এলান ভাষায় লিখিতে হয়। তাহা হয় নাই। যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহাতেও অনেক দোষ দেখিলাম। "একাদশীর সোয়ারী" বেশ। "ভারতের দেশীয় রাজগণের শাসিত প্রদেশ সমূহে অস্ত্র আইনের অভাব নিবন্ধন সে সকল দেশে সর্ব্বদাই অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অস্ত্রধারীর উৎসব আমাদের দেশের দোল রথ প্রভৃতির ন্যায় নহে। তাহার মধ্যে যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা, যে বীরত্বপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রবাহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, চক্ষুগোচর না হইলে তাহার মত্ততা অনুভব করা যায় না। বরোদা রাজ্যের একাদশীর সোয়ারী এইরূপ একটি বিপুল আনন্দপূর্ণ উৎসব; শুধু প্রজাবৃন্দ নহে, রাজা হইতে ক্ষুদ্র প্রজা, সর্দ্দার হইতে সামান্য গৃহস্থ, রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইতে নগণ্য পদাতিক সকলেই এ উৎসবে যোগদান করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব করে।" * *

আমরাও উৎসবাবসানে শ্রান্তহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। অতীত ভারতের গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের কথা পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল; অবিলম্বে পথপ্রান্তস্থ আলোকস্তম্ভে নগরের গৃহে গৃহে পণ্যবীথিকা ও হর্ম্ম্যতলে সহস্র সহস্র দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, উজ্জ্বল আলোকমালায় নগর সুসজ্জিত হইল, কিন্তু এই বিপুল উৎসবাবসানে লোকপূর্ণা আলোকোজ্জ্বলা নগরীর সান্ধ্যশোভার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই পুরাতন গানটা ক্রমাগত আমাদের হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

পর দীপ মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

"তাড়িৎ পদার্থ কি?" কথা ভাল কিন্তু বুঝা ভার। ভাষার দোষ। "হরি সিং পেয়াদা" এইখানে ভারতীর জান্। "অভিশাপ" এও ভাল। দেবতার শাপে বঙ্গললনা এক রাত্রিতে লেখা পড়া ভুলিয়া গেলেন। তখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কি দশা তাহার বর্ণনা। আবার—

বঙ্গদেশবাসী যত আর্য্য গ্রন্থকার
পুনঃ সবে তুলিয়াছে মহা হাহাকার।
* * *
আছাড়ি পাছাড়ি কাঁদে বৃদ্ধ গুরুদাস;
কপালে হানিয়া কর কাঁদে অবিনাশ;
কাঁদিছে মনোমোহন বসিয়া দোকানে;
যোগেশের পাকা দাড়ি ভাসে অশ্রু বানে।

মিলনটা ভাল হয় নাই। ইহার ট্যাজিডিতেই শেষ হওয়া উচিৎ।

বসন্তসেনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

[উত্তরীয় হস্তে মৈত্রেয়ের প্রবেশ।]

মৈ। ("অন্য ব্রাহ্মণ"—ইত্যাদি বলিয়া) আমি মৈত্রেয় পরের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাব? হা অবস্থা! তুলার মত লঘু কচ্চ। যে আমি আর্য্য চারুদত্তের প্রযত্ন-সিদ্ধ সুগন্ধি মোদক দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া অভ্যন্তর চতুঃশাল-দ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক শত-পাত্র-পরিবৃত-চিত্রকরের ন্যায় অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ ক'রে পরিত্যাগ কত্তেম এবং নগর-চত্বর-বৃষের ন্যায় চর্ব্বিত-চর্ব্বণ কত্তেম, সেই আমি আজ তাঁহার দারিদ্র্যহেতু যেখানে সেখানে ভ্রমণান্তর গৃহ-পারাবতের ন্যায় আবাসের নিমিত্ত এখানে আসি। আর্য্য-চারুদত্তের প্রিয়বয়স্য চূর্ণবৃদ্ধ জাতি-কুসুম-সুবাসিত এই উত্তরীয় বস্ত্র দিয়ে ব'লেছেন যে "চারুদত্তের দেবকার্য্য-সম্পন্ন হ'লে তাহাকে প্রদান করিও"। অতএব যাই, আর্য্য-চারু দত্তকে দেখিগে। (গমন ও দেখিয়া) এই আর্য্যচারু দত্ত দেবকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক গৃহ-দেবতার পূজা করে এদিকেই আস্‌ছেন।

[চারু দত্ত ও রদনিকার প্রবেশ।]

চারু। (ঊর্দ্ধদিক অবলোকনপূর্ব্বক সখেদে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

উপহার যে অঙ্গনে মম—
খাইত তখন হংস সারস সকল,
আজি সে অঙ্গন-ভূমে হায়!
তৃণোপরি কীট-দষ্ট পড়ে বীজ-দল।

(আস্তে আস্তে অগ্রে গমন ও উপবেশন।)

বিদূষক। এই আর্য্য চারু দত্ত, এখন ইহার নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) আপনার মঙ্গল হউক, সুখে থাকুন।

চারু। অয়ে! চিরকালের মিত্র মৈত্রেয় উপস্থিত! সখে! মঙ্গল তো? ব'স।

বিদূ। যে আজ্ঞে। (বসিয়া) বয়স্য এই তোমার প্রিয়বয়স্য চূর্ণবৃদ্ধ

জাতি-কুসুম-সুবাসিত উত্তরীয়বস্ত্র দিয়াছেন; বল্লেন যে "চারুদত্তের দেবকার্য্য সম্পন্ন হ'লে তাহাকে প্রদান করিও"। (উত্তরীয় প্রদান)।

চারু। (গ্রহণ করিয়া সচিন্তভাবে অবস্থিত)।

বিদূ। ওহে! কি—চিন্তা কচ্চ?

চারু। বয়স্য!

দীপালোক যথা গভীর আঁধারে,
দুঃখ পরে সুখ তেমতি শোভে;
অনুভবে দুঃখ যেবা সুখ-পরে,
জীবিতে সেজন মৃতপ্রায় ভবে।

বিদূ। বয়স্য! দারিদ্র্য ও মরণ এই দুইএর মধ্যে কোনটী ভাল?

চারু। বয়স্য! মৃত্যু ভাল, অল্পক্লেশ তায়;
দরিদ্রতা শেল হৃদে সতত বিঁধায়।

বিদূ। বয়স্য! আক্ষেপের প্রয়োজন কি? বন্ধুবর্গ তোমারই ধনে ধনী, সুতরাং দেবলোকের পীতাবশিষ্ট প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় তোমার এ পরীক্ষাও সমধিক রমণীয়।

চারু। বয়স্য! আমি ধনের জন্য আক্ষেপ কচ্চি না। দেখ—

কালক্রমে মদজল, শুষ্ক হ'লে, অলিদল,
করী গণ্ডস্থল ছাড়ি' যায়রে যেমতি;
তেমতি অতিথি সবে, নির্ধন আমারে ভে'বে,
ছে'ড়ে যায় এই দুঃখ দহে দিবারাতি।

বিদূ। বয়স্য! বান্দীরবাচ্ছা ক্ষণস্থায়ী এই সকল অর্থ বরটা*-ভীত গোপ-বালকের মত যে যে স্থানে ভক্ষিত না হয়, সেই সেই স্থানেই গমন করে।

চারু। বয়স্য! নহে চিন্তা ধন-নাশ-হেতু,
ভাগ্যক্রমে ধন লাভ হয় পুনঃ ক্ষয়;
নির্ধনেরে ত্যজে বন্ধুজন,
এই দুঃখে দহে সদা আমার হৃদয়।

আর—

দরিদ্রতাহেতু হয় লজ্জার জনন,
তেজোহীন হয় সদা লজ্জিত যে জন;

*বরটা = বোল্‌তা।

নিস্তেজের পরিভব নাহিক সংশয়,
পরিভব হ'তে হয় বৈরাগ্য-উদয়;

বিরাগীর শোকভার, শোকহেতু অনিবার—
বুদ্ধি-ক্ষয়, নির্ব্বোধের বিনাশ নিশ্চয়,
নির্ধনতা আপদের মূল বিষময়।

বিদূ। বয়স্য! সেই ক্ষণস্থায়ী অর্থের জন্য সন্তাপের প্রয়োজন কি?

চারু। বয়স্য! দরিদ্রতা পুরুষের চিন্তার আবাস-স্থান,
পর হ'তে পরিভব আর শত্রুতার নিধান;
আত্মীয়ের দ্বেষ-হেতু নিন্দা-হেতু বান্ধবের,
ভার্য্যার অবজ্ঞা-হেতু ইচ্ছা বনে গমনের;
হৃদিস্থিত শোকানল করে না দহন কায়,
কিন্তু দিবানিশি হায়! সন্তাপে অনল-প্রায়।

বয়স্য! আমি গৃহদেবতার পূজা করেছি, তবে যাও, তুমিও চতুষ্পথে মাতৃপূজা প্রদান করগে।

বিদূ। আমি যাব না।

চারু। কেন?

বিদূ। তুমি এত পূজা কচ্চ, তবু যখন দেবতারা প্রসন্ন হলেন না, তবে আর দেবতার পূজা করে কি ফল?

চারু। বয়স্য! তা নয়, ইহা গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম।

মনোবাক্যে তপস্যায় অথবা পূজায়,
তুষ্ট হন দেবগণ সতত সেবায়।

অতএব যাও, মাতৃপূজা প্রদান করগে।

বিদূ। ওহে! আমি যাব না, অন্য কাকে পাঠাও। আমি হতভাগ্য ব্রাহ্মণ, আমার সকল কর্ম্মেরই বিপরীত ফল, দর্পণগত ছায়ার মত আমার বাম দিকে দক্ষিণ আর দক্ষিণ দিকে বাম! বিশেষতঃ এই সন্ধ্যাবেলায় রাজ-পথে গণিকা, বিট, ভৃত্য এবং রাজপুরুষগণ বিচরণ কচ্ছে; সুতরাং মণ্ডুক-লুব্ধ কালসর্পের মুখে নিপতিত মূষিকের ন্যায় আমিও হয় তো তাদের সাম্‌নে পড়ে মারা যাব। তুমি এখানে বসে কি কর্‌বে?

চারু। আচ্ছা, একটু থাক, আমি উপাসনা করে আসি।

[নেপথ্যে] দাঁড়াও বসন্তসেনা! দাঁড়াও।

[অনন্তর বিট* শকার† ও ভৃত্যানুসৃত বসন্তসেনার প্রবেশ।]

বিট। বসন্তসেনা! দাঁড়াও, দাঁড়াও।
দ্রুতপদে কেন যাও? কি ভয় হেথায়?
নৃত্য-পটু পদদ্বয় করিয়া ক্ষেপণ;
উদ্বেগে চঞ্চল তব হ'য়েছে নয়ন,
ব্যাধ-ভয়ে সচকিতা হরিণীর প্রায়।

শকার। দাঁড়াও বসন্তসেনা! দাঁড়াও।
কেন যাও, কেন ধাও, কেন বা পালাও?
হও গো প্রসন্না বালে! একটু দাঁড়াও;
কামানলে দহিতেছে অন্তর আমার,
মাংস-খণ্ড দহে যথা জ্বলন্ত-অঙ্গার।

ভৃত্য। গ্রীষ্মে ময়ূরীর প্রায় কোথা যাও ভগিনি!
কি ভয়? কেন গো বৃথা হইছ আকুলিনী?
অই মম ভট্টারক তব পিছু পিছু ধায়,—
চেয়ে দেখ একবার, বন্য-কুক্কুটের প্রায়।

বিট। বসন্তসেনা! দাঁড়াও, দাঁড়াও। কেন যাও—
বালকদলীর প্রায় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে,
রক্তপদ্ম-কলি যেন করিয়া ক্ষেপণ;
পবনে চঞ্চল বস্ত্র শরীরে বহিয়ে,
যেন মনঃশিল-গুহা করি বিদারণ।

শকার। দাঁড়াও বসন্তসেনা! দাঁড়াও।
মন্মথ মদন অনঙ্গ মোর—
বাড়াইয়ে যাও ফেলে নিশীথে শয্যায়;
ভয়েতে স্খলিত-গতি, কেন যাও আথিবিথি?
আমার অধীন জীবন তোর—
রাবণের বশীভূতা কুন্তীদেবী প্রায়।

*নৃত্যগীতাদি বিদ্যায় কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ বেশরচনানিপুণ বাগ্মী ধূর্ত্ত মধুরভাষী সভায় সম্মানিত উপভোগ বিরহিত ধনশালী ব্যক্তিকে বিট কহে।

†অহঙ্কারী মূর্খ দুষ্টকুলসম্ভূত ঐশ্বর্য্যশালী রাজার রক্ষিতা-নারীর ভ্রাতা "শকার" নামে খ্যাত। শকারের কথা অধিকাংশ স্থলেই অহঙ্কারব্যঞ্জক মূর্খতাসূচক অসঙ্গত এবং পুনরুক্তিদোষে দূষিত দেখিতে পাইবেন।

বিট। ভুজঙ্গী পালায় যথা গরুড়ের ভয়ে,
অতিক্রমি মোরে তথা কেন যাও ধেয়ে?
বেগে চলি যদি, পারি রোধিতে পবনে,
বরগাত্রি! নহে যত্ন তোমার গ্রহণে।

শকার। মশাই!
নানকমোষিকামকশিকা, মৎস্যাশিকা,
লাসিকা, কুলনাশিকা, কাম-মঞ্জূষিকা,
সুবেশ-নিলয়া বেশ-বধূ, অবশ্বিকা,
নির্নাশা এ বেশাঙ্গনা হায়রে! বেশিকা,
এই দশ নাম আমি দিয়েছি ইহারে,
আজও আমার দিকে চায়নাকো ফিরে।

বিট। ভয়েতে অধীরা হ'য়ে কেন গো পালাও?
জলধর-রবে ভীতা সারসীর প্রায়;
চঞ্চল কুণ্ডল তব গণ্ডে শোভমানা,
যেন তুমি রসিকের বাদ্যমানা বীণা।

শকার। ঝণঝণি' অলঙ্কার কোথা যাও তুমি?
রাম ভয়ে ভীতা যথা দ্রৌপদী পালায়;
এই দেখ এখন হরিব তোমা আমি,
যথা হনূমান্ হরে ছিল সুভদ্রায়।

ভৃত্য। রাজার শালাকে কর গো রমণ,
মাছমাংস খাবে,
সদা সুখে রবে,
যার ঘরে মাছমাংস খেয়ে অনুক্ষণ,
কুক্কুরেও মৃতদেহ করে না ভক্ষণ।

বিট। কটিদেশে পরিয়াছ বিচিত্র-মেখলা,
গগনমণ্ডলে শোভে যেন তারামালা;
মুখেতে মাখিয়া চূর্ণ-মনঃ-শিলা-চয়—
নগরদেবতাসম ধাইছ, কি ভয়?

শকার। সবেগে তোমার পাছে ধাইছি আমরা,
শৃগালীর পিছু যথা সারমেয়গণ;

হরিয়ে হৃদয় মম সবেগে সত্বরা
দ্রুতগতি করিছ গো তুমি পলায়ন।

বসন্ত। পল্লবক! পল্লবক! পরভৃতিকা! পরভৃতিকা!

শকার। (সভয়ে) মশাই! মশাই!! মানুষ' মানুষ!!

বিট। ভয় নাই, ভয় নাই।

বসন্ত। মাধবিকা! মাধবিকা!

বিট। মূর্খ! চাকরাণীকে তল্লাষ কচ্ছে।

শকার। মশাই! মশাই! স্ত্রীলোক খুঁজ্‌চে?

বিট। তাইবৈ আর কি?

শকার। শত স্ত্রীলোক মারতে পারি, আমি বীর।

বসন্ত। (শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) হায় হায় সঙ্গের লোকও যে চলে গেল। এখন নিজেরই আত্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বিট। তল্লাষ কর তল্লাষ কর।

শকার। বসন্তসেনা! পরভৃতিকাকেই ডাক আর পল্লবককেই ডাক অথবা সমস্ত বসন্তকালকেই ডাক; আমি যখন তোমার পিছু লেগেছি, কে তোমায় রক্ষা করবে?

ভীমসেন জামদগ্ন্য অথবা রাবণ?
কুন্তীসুত বাঁচাবে কি তোমা? এই আমি—
তব কেশে ধরি, হই দুঃশাসনসম।
এই দেখ, এই দেখ—সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ, ধৃত শিরোদেশ,
কাটিব মস্তক করিব নিঃশেষ;
পলায়নে তব কিবা প্রয়োজন?
বাঁচে কি কখন মুমূর্ষু যে জন?

বসন্ত। মহাশয়, আমি অবলা।

বিট। সেই জন্যই ধরা যাচ্চে।

শকার। সেই জন্যই মেরে ফেলি নাই।

ক্রমশঃ।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে নাস্তিক সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা করিবে কেন? যে নাস্তিক সে নিদারুণ কষ্ট সহিয়া পুত্রকলত্র ও রাজসিংহাসন ও চক্রবর্ত্তীত্ব ত্যাগ করিবে কেন? যে নাস্তিক সে স্বতন্ত্র অধ্যাত্মজগতে বিশ্বাস করিবে কেন? যে নাস্তিক সে বিশুদ্ধ বোধিসত্ত্বদিগের (মহাপুরুষদিগের) অমরত্বে বিশ্বাস করিবে কেন? যে নাস্তিক সে শারীরিক মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবে কেন? নাস্তিক ধর্ম্মের নাস্তিক গ্রন্থে বুদ্ধের এ সকল বিশ্বাসের কথা থাকিবে কেন? প্রামাণিক গ্রন্থ ললিত বিস্তরের অধ্যায়ে অধ্যায়ে বুদ্ধের আস্তিকতার কথা থাকিবে কেন? তোমার আমার সম্মুখে বৎসরে বৎসরে মাসে মাসে দিনে দিনে প্রহরে প্রহরে কত লোক যমমন্দিরে গমন করিতেছে কই তা দেখিয়া তোমার আমার কি চৈতন্য হয় যে একদিন জরা আসিয়া আক্রমন করিবে, একদিন মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিবে? পরের কথা ছাড়িয়া দিলাম। এই আমার সংসারে সে আমার পিতা মরিয়াছেন, মাতা মরিয়াছেন, ভগিনী ভ্রাতা অনেক মরিয়াছেন—সে দিন আমার পুত্র মরিয়াছে, কই তাহাতে কি আমার প্রাণে প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় এমন কোন দাগ পড়িয়াছে, যাহাতে আমি সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি, না, আস্ফানকের ন্যায় কঠোর সাধনার অবতারণা করিতে পারি? কিন্তু বুদ্ধের কি হইয়াছিল? জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিয়া সারথীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন—

"নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্র ধর্ম্মঃ সর্ব্বে
জগস্য জর যৌবন ধর্ষয়াতি
তুভ্যং পি মাতৃপিতৃ বান্ধবজ্ঞাতি সঙ্ঘো
জরয়া অমুক্তং ন হি অস্য গতির্জনস্য।

দেব, ইহা রাজধর্ম্ম বা কুলধর্ম্ম নহে, পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জীবের যৌবন জরা বিনাশ করিতেছে, আপনি ও পিতা মাতা জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ সকলেই ইহার অধীন, কাহারও আর গত্যন্তর নাই।"* যেমন শুনিলেন, অমনি বলিলেন 'আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে অন্ধ হইয়া মনুষ্যশরীর পরিণামে কি অবস্থা

*"শাক্যমুনি চরিত।"

প্রাপ্ত হইবে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। জরা যাহাকে ধরিবে তাহার আর ক্রীড়ার প্রয়োজন কি?

এই একদিন। আর একদিন দেখিলেন "ব্যাধীভয়ং উপগতো মরণান্ত প্রাপ্ত"। দেখিয়া বলিলেন "মনুষ্যশরীরের সুস্থাবস্থা নিদ্রাকালীন স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা। ব্যাধির ভরে মনুষ্য ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তবে কোন্ জ্ঞানীপুরুষ এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত হইবে?". তৃতীয় দিনে দেখিলেন শব। সারথী প্রশ্ন শুনিয়া বলিল "এষোহি দেব পুরুষো মৃতু জম্বুদ্বীপে নহি ভূয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্রদারাং অপহার ভোগগৃহ মাতৃ-মিত্র জ্ঞাতি সজ্ঝং পরলোক প্রাপ্ত ন হি দ্রক্ষ্যতি ভূয় জ্ঞাতিং। অর্থাৎ দেব, এ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, এ আর পৃথিবীতে মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র দেখিতে পাইবে না; ঐ ব্যক্তি সুখ সম্ভোগ গৃহ মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইল, আর প[illegible]য় জ্ঞা[illegible]তগণকে দেখিতে পাইবে না।" তখনই গৌতম বলিলেন — য[illegible] জরা না হইত ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত তথাপি পঞ্চস্কন্ধ (ইন্দ্রিয় বোধ) ধারণ করাতেই মহাদুঃখ জরা ব্যাধি মৃত্যু যখন নিত্য সঙ্গে চলিতেছে, তখন আর কি? প্রতিনিবৃত্ত হও, ভাল করিয়া মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।

চতুর্থ দিনে সিদ্ধার্থ এক শান্ত দান্ত সংযতেন্দ্রিয় ভিক্ষুকে দেখিলেন, তিনি কাষায় বস্ত্রাবৃত, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, চিত্ত প্রসন্ন, শরীর পুণ্যালোকে অতি উজ্জ্বল। সারথীর উত্তরাবসানে বলিলেন "ইহাই আমার ভাল লাগে। পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা প্রব্রজ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন, যাহাতে আপনারও হিত হয়, পরেরও হিত হয়, সুখের জীবন, সুমধুর অমৃতফল (লাভ হয়)।

বস্, নাস্তিকের এই চিন্তাই চিন্তা! একেবারে চিদাকাশে উঠিয়া এই ভূমণ্ডলকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি করিলেন, একেবারে প্রব্রজ্যা-অবলম্বন-সংকল্প। তিনি যে রাত্রিতে রাজপুরী পরিত্যাগ করেন তখন একবার প্রসুপ্ত নারিগণের বীভৎসরূপ দেখিয়া লয়েন। কেহ কেহ উলঙ্গ, কেহ কেহ খিল খিল করিয়া হাসিতেছে, কেহ কেহ দাঁত কড়মড় করিতেছে, কাহারও চুল এলো কাহারও বক্রমুখ, কেহ মুখভঙ্গী করিতেছে, কেহ বিকট-ভাবে মুখব্যাদান করিতেছে, কেহ চক্ষু ঘুরাইতেছে, কেহ ভ্রকুটী করিতেছে।' এই সকল দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে সংসার শ্মশান। ঘৃণায় ধিক্কারে পূর্ব্ব

বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। এমনটি নহিলে কি আর আস্ফানকের বেগ কেহ সহ্য করিতে পারে?

"এই ধ্যান আকাশের ন্যায় সমুদয় উপাধি শূন্য এজন্য ইহার নাম আস্ফানক। অনুপযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদিগকে যথার্থ অনুষ্ঠান, পুণ্যফল, জ্ঞানবল, ধ্যানের অঙ্গবিভাগ, শারীরীক বলের স্থিরতা, চিত্তের সৌন্দর্য্যপ্রদর্শন জন্য অসংস্কৃত ভূমিতে ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া বীরাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এইরূপে উপবেশন করিয়া চিত্ত দ্বারা আপনার শরীরকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নিপীড়নে হেমন্তকালের রাত্রিতেও তাঁহার কক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। আস্ফানক ধ্যান নিরত শাক্যের মুখ নাসার শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হইল। কর্ণরন্ধ্র দিয়া মহাশব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তদনন্তর শ্রোত্রের পর্য্যন্ত বায়ু অবরুদ্ধ হইল। ইহাতে বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া শির ও কপালে আঘাত করিতে লাগিল। কুণ্ডা (স্থালী) বা শক্তি দ্বারা আঘাত করিলে যে প্রকার অসহ্য ব্যথা হয় এ অবস্থায় তিনি সেই প্রকার আঘাত অনুভব করিতেছিলেন। ফলতঃ অটল অচলবৎ, স্থিরবৃক্ষবৎ, নিস্পন্দ জড় বস্তুবৎ বুদ্ধদেব স্থিরভাবে অনশনব্রতধারী হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। এই সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। কত বর্ষা কত তীক্ষ্ণ উত্তাপ তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তিনি এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে তৃণ বা তুলা নাসা দ্বারা প্রবিষ্ট করিলে কর্ণ হইয়া বাহির হইত, কর্ণ দিয়া প্রবেশ করাইলে মুখ দিয়া বাহির হইত। গোপ বালকেরা তাঁহাকে পাংশু পিশাচ মনে করিয়া গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত।" ষড় বর্ষের এই দুষ্কর তপস্যায়ও কিছু হয় নাই জানিবেন।

তখন তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। দেহ রক্ষার্থ যত্নশীল হইয়া একখণ্ড শববস্ত্র গ্রহণ করিয়া পাণিহত পুষ্করিণীতে প্রক্ষালন পূর্ব্বক তাহাই পরিধান করিলেন। সুজাতানাম্নী সাধ্বী স্ত্রীর আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বুদ্ধের অভিলাষ বুঝিয়া দেবগণ হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক এই পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন তাই তার নাম পাণিহত। শাক্যমুনি-চরিত লেখক এইখানে বলিয়াছেন "এমন কি জ্ঞান চাহিয়াছিলেন, যাহা এতাদৃশ তপস্যায় পাওয়া যায় না। য়ুরোপের প্রধান প্রধান বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। *** ইহার নিষ্পত্তি পরে হইবে।"—অর্থাৎ সিদ্ধি লাভে।

নাস্তিকের আর একটি ব্যাপার শুনুন। "ললিতবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে যে এই ষড়্ বর্ষের দুশ্চর সাধন সময়ে শাক্যের মাতা মায়াদেবী আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া স্বর্গপুরী হইতে আসিয়া তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তনয়ের ক্লেশ দেখিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইলেন। তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে এজন্য স্বীয় পুত্রের নিকট বিনীত হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধদেব তদবস্থায় তাঁহাকে যোগ বলে দর্শন করিয়া বলিলেন "স্বর্গে আমরা মিলিত হইব, কোন ভয় নাই।" শাক্যসিংহ ঋষিদিগের মতে যোগ করিয়াছিলেন।

আমরা যে কথা বুঝাইবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের কথা তুলিয়াছি সেই কথা শাক্যের সিদ্ধিলাভ ও নির্ব্বাণতত্ত্বে আরও খুলিয়া যাইবে। শাক্যমুনি-চরিত লেখকের ভাষাতেই পাঠক সেই সংবাদ পাইবেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পন্থানুসরণ করিয়া মৃত রামদাস সেন বুদ্ধকে নাস্তিক সাজাইয়া নিতান্ত ভ্রমে যে পতিত হইয়াছেন, পাঠক মহাশয় তাহাও সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন।

বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিয়া বোধিদ্রুমতলে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বগণের চরিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বতন মুক্ত জিনদিগের আত্মা তাঁহার চিত্তে আবির্ভূত ও নিগূঢ় যোগে মিলিত হওয়ায় তাঁহার তেজও স্ফূর্ত্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন ও তাঁহার নবজীবন যাহাতে লাভ হয় দেবগণ তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। তাঁহাদের ভাব তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইল, বুদ্ধ এবার ললিতব্যূহ নামে সমাধি আরম্ভ করিলেন এবং তাহার বলে সমুদয় বোধিসত্ত্বগণের সহিত মিলিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাক্, 'অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হোক, বহুকাল তপস্যায় ও দুর্লভ যে বোধি তাহা না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে চালিত না হয়।

প্রথমে সমাধি কালে তাঁহার শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইল। পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বগণ বৃক্ষমূলে তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। সকলেরই এক ভাবের সাধন। মহাজনেরা ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত না হইয়া থাকিতে পারে না, ভাবের একতা, স্থানের ব্যবধান, ব্যপ্তির দূরতা বিনাশ করিয়া দেয়, সকলে এক রাজ্যের অধিবাসী হইয়া ইহলোকেই সাধু

পরলোকগত আত্মার সঙ্গে ভাবে কথোপকথন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বগণের সহিত ভাবে মিলিত হওয়ায় শাক্যের জীবনে প্রচুর স্বর্গীয় বল সঞ্চারিত হইল, জ্ঞানচক্ষু ও অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইল। ললিতব্যূহ প্রভৃতি দশ জন বোধিসত্ত্ব আলোকে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপনীত হন। প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রশংসাসূচক এক একটি গাথা গাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি গাথা এই—

ধর্ম্মামেঘ স্ফূরিত্ব সর্ব্বত্রভবে বিদ্যাধিমুক্তি প্রভং
সদ্ধ ধর্ম্মঞ্চ বিরাগ বর্ষি অমৃতং নির্ব্বাণ সংপ্রাপকম্।
সর্ব্বা রাগকিলেশ বন্ধনলতাং সো বাসনা ছেৎম্যতি
ধ্যানর্দ্ধিবল ইন্দ্রিয়ৈঃ কুসুমিতঃ শ্রদ্ধাকরং দাস্যতে॥

ললিতবিস্তর ২০শ

অর্থাৎ ইনি সমুদয় জগতে ধর্ম্মমেঘ প্রকাশ করিয়া, অনুপম বিদ্যা ও মুক্তি-প্রভায় দীপ্যমান হইয়া সদ্ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণপ্রদ অমৃত বর্ষণ করত সকল প্রকার বাসনা ক্লেশ বন্ধনলতা ছেদন করিবেন এবং ধ্যান বলে বিকসিত শ্রদ্ধা ফল প্রদান করিবেন।

ক্রমে কায়বাক্য ও চিত্ত দ্বারা তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বাসনা-শূন্য হইলেন, শারীরিক বিকার আর ঘটিল না। পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন। স্থানুবৎ চিত্ত এক অনন্ত বোধিসত্ত্বায় সমর্পিত হইল এবং বুঝিতে পারিলেন যে বাসনাকে জয় করিতে পারিলে সকলের জয় হয়, কেন না অন্তর্বাহ্য সকল রিপুর মূলে এক বাসনাই বিদ্যমান। এই সময়ে কামদেব আসিয়া বুদ্ধদেবকে ছলনা করেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর উদ্ধার করিলাম না। পূর্ব্বেও কামদেব আর একবার বুদ্ধকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মার দুহিতৃগণ বুদ্ধদেবের স্তব করিয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধদেব নিষ্কণ্টক হইলেন এবং পাপের মূল পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইল। পরে তিনি ধ্যানের সোপানে সোপানে উঠিতে লাগিলেন।

(১) প্রথমে একাগ্রতা ও বিশ্বাসে চিত্তকে স্থির করিয়া বিবেকজনিত প্রীতিসুখ লাভ হয়, এইভাবে সমাধি আরম্ভ করিলেন। একাগ্রতা ও বৈরাগ্য বশত অপূর্ব্ব সুখ পাইলেন।

(২) একই সত্তার আত্যন্তিক উপলব্ধি সহকারে সমাধিস্থ হইয়া অনুপম প্রীতিসুখ পাইলেন।

(৩) উপেক্ষা উদাসীনবৎ নিষ্প্রীতিক অথচ সুখবিহারী।

(৪) শেষ ধ্যান সুখস্য চ গ্রহাণাৎ দুঃখস্য চ প্রহাণাৎ পূর্ব্বমেব চ মৌমনস্য দৌর্ম্মনস্যয়া রস্তঙ্গমাদদুঃখামুখমুপেক্ষা স্মৃতি বিশুদ্ধং চতুর্থ ধ্যানমুপ সম্পদ্য বিহরতি স্ম।

অর্থাৎ সুখ দুঃখের বিনাশহেতু পূর্ব্বেই সন্তোষ অসন্তোষের বিলাপ বশত সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতিবিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

এইবার তাঁহার দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। গ্রন্থকর্ত্তা আরও খুলিয়া বলিয়াছেন—প্রথমে চিত্তসমাধান ও বৈরাগ্য সহকারে বিবেকবলে অধ্যাত্ম জগতে উপস্থিত হইলেন। সমাহিত ধ্যানস্থচিত্তে বৈরাগ্যনয়নে সংসারের অসারতা সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিলেন, আর বিবেকনয়নে জরামরণ রহিত সুখদুঃখের অতীত নিত্যশাশ্বত শান্তি সম্ভোগ করিলেন। * * ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহার এইরূপ প্রতীতি হইল, একই সত্তা যাহা অজর অমর সুখ দুঃখে লিপ্ত নহে তাহাই নিত্য ও সার সমুদায় জগতের আর তাবৎ অবস্তু ছায়া মাত্র। এই একত্বে তিনি সমাহিত হইলেন। একত্ব উপলব্ধি হইলে যে সমাধি হয় তাহাতে আর বস্তুন্তর বোধ থাকে না। সব একাকার। ধ্যানের তৃতীয় অবস্থায় তিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ ধ্যান সমাধিতে উদাসীন, যোগ বিয়োগে বিবেক অবিবেকে উদাসীন, আত্মস্বরূপ-অবস্থা একত্বস্মরণেই সুখী, এই ভাবে নিমগ্ন। ধ্যানের চতুর্থ অবস্থায় সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া আমিত্বানুভব বিলুপ্ত হইলে যে নির্ম্মল সুখোদয়, তাহাতেই বিহ্বল, তৎসুখেই সুখী। যাই তাঁহার আমিত্ব অন্তর্হিত হইল তৎক্ষণাৎ সমুদয় মানবের দুর্গতি ক্লেশ তাঁর নেত্রপথে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন অলৌকিক দিব্যচক্ষে প্রাণীগণকে দেখিলেন। প্রথমে আমিত্ব গেল পরে জগতের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইল।

"রাত্রি প্রথম যামে মহামুনি শাক্য বিদ্যাদর্শন করিলেন, অন্ধকার বিনাশ করিলেন ও আলোক উৎপাদন করিলেন, ঐ বিদ্যার দর্শনে আলোকিত হওয়ায় নাম হইল বুদ্ধ। ঐ বিদ্যা কি? উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, উহাই পরম জ্ঞান, উহাই সার্ব্বভৌতিক জ্ঞান, উহার নামই পরমাত্মা। এখন তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বাসনাতে ও তৃষ্ণানলে নির্ব্বাণবারি সেচন করিলেন। নিত্য শান্তিরসের উদয় হইল, সাধনায় সিদ্ধি হইল। এমন মহাপুরুষকে কে নাস্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়?

"তিনি যে গভীর সাধন ও আধ্যাত্মিক সমাধিসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সম্বুদ্ধ হইলেন, তাহা কি অবিশ্বাস নাস্তিকতার ফল? শাক্যমুনি সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বর শব্দ বিবাদের স্থল এবং নিতান্ত জটিল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন একারণ হয়ত ঈশ্বরের নাম তিনি কোন স্থলে উল্লেখ করেন নাই। তিনি মুক্তির অভিলাষী ছিলেন, এই জন্য বিবাদের তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের সাধনে জীবন সমর্পন করিয়াছিলেন। লাসেন, টর্ণার বর্ণো, ফোকে, রিস ডেবিডস্, বিগাণ্ডেট প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভিতরে প্রবিষ্ট না হইয়া বিচার করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বের উদ্ভাবন হয় নাই।

যখন সর্ব্বার্থসিদ্ধ সম্বোধি প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে স্বীয় সত্বকে বিমুক্ত দেখিলেন, একেবারে চরমগতি স্বর্গধামে উপনীত হইলেন। বসন্তের পূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে পত্রপুষ্প যেমন ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাঁহার শরীরও সেইরূপ যেন মৃতের ন্যায় পড়িয়া গেল, শারীরিক ক্রিয়া মাত্র রহিল, কিন্তু স্বয়ং বোধিক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কি পরম সুখের অবস্থা লাভ করিলেন, ইচ্ছা হয় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ঐ সুবিমল সম্বোধিরাজ্যে বিচরণ করি। বুদ্ধ, তুমি এখন সুগত হইলে, তুমি পিঞ্জরের পক্ষী ছিলে, এখন আমিত্বের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া নিত্য ও অপার জ্ঞানাকাশে উড়িয়া গেলে। এখন আকাশ তোমার গৃহ, পরম শান্তি তোমার পানীয়, নিত্যজ্ঞান তোমার অন্ন, আমিত্ববিনাশ তোমার পুণ্যময় অমৃত ও সুধা। সুগত, তুমি কোথায় গেলে, তুমি মরিয়া জীবিত হইলে, পূর্ণ বোধিসত্ত্বে (জগৎ-চৈতন্যে) একাকার হইয়া গেলে। আমাকে তোমার সঙ্গী কর।

"মধ্যরাত্রে অপর এক জ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহই নাই, গোত্র নাই, বংশ নাই, জীবন নাই, পরমায়ু নাই, নাম নাই, উপাধি নাই, পার্থিব জন্ম মৃত্যু নাই। পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বেরাই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পবিত্রবংশ।

"শেষ রজনীতে তিনি আশ্রব ক্ষয় জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, অসহায় জীবের উৎপত্তিই যে ক্লেশকর। মনুষ্য সকল জন্মিতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—জীর্ণ হইতেছে। কিন্তু কেহই এই মহৎ দুঃখ বিমোচনের উপায় জানে না। সমুদয় দুঃখের মূল পঞ্চ স্কন্ধ হইতে নিঃসৃত জানে না এবং জরা ব্যাধি প্রভৃতির অস্ত অর্থাৎ নাশ ক্রিয়া জানে না।

"অতি প্রত্যূষে তিনি আমিত্ববিহীন হওয়াতে এক প্রধান পুরুষত্ব লাভ করিয়া আর্য্যজ্ঞান সহকারে সমুদয় একচিত্ত একদৃষ্টিসমাযুক্ত ইহাই জ্ঞাতব্য প্রাপ্তব্য দ্রষ্টব্য ও সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য প্রজ্ঞা দ্বারা অবগত হইয়া ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। আমিত্ব বিনষ্ট হওয়াতে তিনি এক শুদ্ধ সত্ব হইলেন। যখন বোধিসত্ত্বের তম ও অন্ধকার তিরোহিত হইল, তৃষ্ণা বিশোধিত হইল, রজোগুণ শান্ত হইল, দৃষ্টি বিক্ষোভিত ক্লেশ বিবর্ত্তিত হইল, মানামান অপসারিত হইল, গ্রন্থি মুক্ত হইল, ধর্ম্মতথ্যতার উদয় হইল, অবশেষে নির্ব্বাণ সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। এই সময়ে স্বর্গ হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবপুত্রগণ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

উৎপন্নো লোক প্রদ্যোতো লোকনাথ প্রভঙ্করঃ।
অন্ধভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দ্দাতা রণঞ্জহঃ॥
ভগবান্ বিজিত সংগ্রাম পুণ্যৈঃ পূর্ণমনোরথঃ।
সম্পূর্ণ শুক্ল ধর্ম্মৈশ্চ জগতি তর্পয়ষ্যসি॥ ইত্যাদি।

ল, বি, ২৩ অ।

"অতঃপর সুগত এইরূপে নির্ব্বাণ লাভান্তর আনন্দিত চিত্তে অনিমিষ নয়নে সেই বোধিদ্রুমরাজকে একবার অবলোকন করিলেন, এবং ধ্যানজনিত প্রীতি-সুখে সপ্তরাত্র সেই তরুতলেই কালযাপন করিলেন। এখন তিনি পূর্ণমনোরথ ও সিদ্ধকাম হইলেন। গগণবিহারী পতত্রের ন্যায় সুখে বিহার করিতে মনস্থ করিলেন।

বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভের পর যখন বসিয়া ভাবিতেছিলেন যে এই ধর্ম্ম আমি আপন হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিব না জগতে জীবের জন্য প্রকাশ করিব, তখন প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। পূর্ণশুদ্ধসত্বের (সচ্চিদানন্দের) আদেশে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে জীবের জন্য ধর্ম্ম প্রচার করিব, বদ্ধজীবকে মুক্ত করিব, তাহারা ব্রহ্মপদে নিপতিত হইয়া সকলে আমার নিকট যাচ্ঞা করিবে।

পূর্ণতা সম্ভোগের দশ প্রকার অবস্থা হয়। যথা প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী ইত্যাদি। সুতরাং নির্ব্বাণ শূন্যবাদ নহে, চিত্তের অত্যুন্নত অবস্থা। এই নির্ব্বাণের পরও ত্রিবিধ উন্নতির অবস্থা হইয়া থাকে, প্রথম বোধিসত্ব, পরে অর্হৎ সর্ব্বশেষে বুদ্ধ। এই বুদ্ধ উন্নতির চরমাবস্থা, ইহা কেবল শাক্যেরই হইয়াছিল, তিনিই এই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন।

দোহাই পাঠকের, এখন বলুন, বুদ্ধদেব নিরীশ্বর ছিলেন কি না? তিনি পরলোক মানিতেন কি না? স্বর্গ, দেবগণ, প্রত্যাদেশ, যোগ, যোগবলে দেহ ছাড়িয়া বাহির হওয়া, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, পরলোকে সোপানে সোপানে উন্নতি, ধার্ম্মিক আত্মা সকলের ভক্তের নিকট আগমন ও শক্তিদান, এ নাস্তিক-... নাস্তিকের গ্রন্থে এ সকল কি কথা? শাক্যমুনিচরিত লেখকের আত্মার মঙ্গল হোক, তিনি জগতের যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়, মৃত্যুর পর প্রবন্ধে স্তরে স্তরে যাহা পাইতেছেন, বৌদ্ধধর্ম্মেও ... রহিয়াছে। কথায় বলে, সকল শৃগালেরই এক ডাক।

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়।

কবিবর সৈয়দ আলাওল সাহেব।

কবিশ্রেষ্ঠ মহামতি সৈয়দ আলাওল সাহেব বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। অদ্যাপি তাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় লোক এই সমাজে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। মুসলমানজাতির মধ্যে ত তিনি মহাকবির স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন আছেনই; গুণ-তুলনায় তাঁহার সমসাময়িক হিন্দু কবিকুলেও তাঁহার আসন অতি উচ্চ। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষায় এবং তাহার জননী সংস্কৃতভাষায় তাঁহার ন্যায় এতটা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভে কেহ কখন সমর্থ হন নাই এবং হইবেন না। ইসলামের উর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্র বহুদিন নীরস কঠিন উপলময় ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। জগদীশ্বর এমন দিন দিবেন কি, যখন স্বর্গীয় সুরভি মন্দাকিনীসলিলে বিধৌত হইয়া এই পতিত, বিধ্বস্তহৃদয়োদ্যান হইতে পাপ পঙ্কিলতা, নির্জ্জীব উদাসীনতা, এই আলস্য জড়তা দূরীভূত হইয়া, ইহা আবার সুগন্ধি সুমিষ্ট সুন্দর ফলফুলে শোভিত হইবে?

এ পর্য্যন্ত আলাওল সাহেবের চারিখানি কাব্য ... আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চারিখানি কাব্য ব্যতিরেকে দৌলতকাজির বিরচিত অসম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত 'লোরচন্দ্রানী' নামক কাব্যের উত্তরা... ও তাঁহা... । আলাওল লিখিয়াছেন,

"রচিলুঁ পুস্ত...
রহিতে ..."

তাঁহার এই 'বহু' পুস্তক কোথা গেল? অথবা তিনি কি এই চারি
'বহু' শব্দে অভিহিত করিতেছেন?* তিনি পদ রচনায় ও তাঁহার অমৃত
লিপী লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। আমরা এপর্য্যন্ত তাঁহার কয়টী
বিষয়ক পদাবলী পাইয়াছি।

আলাওল সাহেব প্রত্যেক কাব্যারম্ভেই আপনার একটু পরিচয় দি
ছেন। সেই বিবরণী হইতে তাঁহার লুপ্ত জীবনীর অনেক কথা জানি
পারা যায়।

অধুনা বিধ্বস্ত প্রাচীন গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ফতেয়াবাদের জালালপু
তাঁহার জন্মভূমি। তখন এই ফতেয়াবাদে মজ্‌লিস কুতুব নামের এক
রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। আলাওল সাহেবের পিতা ইহারই উজী
(অমাত্য) ছিলেন।(১) বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় এই ফতেয়াবাদ
ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।(২) যদিও আলা
রাজৈশ্বর্য্যের ছায়াস্নিগ্ধ হর্ম্ম্যতলেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তিনি
রের সুখসম্পদলাভে সমর্থ হয়েন নাই। নিজে এত বড় লোকের সন্তা
অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াও শেষ জীবনে তাঁহাকে আমাদের
কবিকুল-চূড়ামণি মাইকেলের দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আলা
তাঁহার জীবনের প্রথম ও মধ্যকালের কোন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আম
দের কৌতুহলবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনের অবসর গ্রহণ করেন নাই।
বস্তুতঃ তিনিও উক্ত রাজসরকারে কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
না, তিনি বলিতেছেন যে কোন কার্য্য হেতু (সম্ভবতঃ রাজনৈতিক
কার্য্যে) তাঁহার পিতৃদেবের সহিত জলপথে রোসাঙ্গে যাইতেছিলেন।

*চারি কাব্যের নাম—পদ্মাবতী, সয়ফলমুলুক ও বদিউজ্জামাল, সপ্ত
কর, দারা সেকান্দর।

(১)মজ্‌লিস কুতুব তথাতে অধিপতি।
তাহান অমাত্য-সুত মুই হীন মতি॥
দী... মতে "মজলিস কুতুব"। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।
...সাহিত্য ১৩০১ সাল।
...ছতে প্রধান।
...স্থান॥" পদ্মাবতী।

... এই জলপথেই (কর্ণফুলীনদী) হার্ম্মাদগণের* দ্বারা আক্রান্ত হইয়া
... তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর তাঁহার পিতা
... (সমরশায়ী) হয়েন এবং তিনি কোনরূপে পরিত্রাণ লাভ করেন।
...দের কোন অনুচর ছিল কি না এবং তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল,
... তিনি কিছু বলেন নাই। কোন্ গুরুতর কার্য্যে তিনি এই দুর্গম
...সঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া রোসাঙ্গ যাইতেছিলেন, বলা যায় না হয়।
...নি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া না হয় পলায়ন করিয়া রোসাঙ্গাধিপতির
...গ্রহণ করেন। তৎকালে রোসাঙ্গ ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রবল পরাক্রান্ত
... ছিল। ইহার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপে দিল্লীর সার্ব্বভৌম সম্রাটগণকে পর্য্যন্ত
... সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। দিল্লীসাম্রাজ্যের বিশ্ববিজয়িনী
... ইহাকে পদানত করিতে পারে নাই। আলাওল রোসাঙ্গের সীমা
...রূপ নির্দ্দেশ করেন,—

"উত্তরে পর্ব্বত সীমা, দক্ষিণে সাগর সীমা,
মধ্যে যত পর্ব্বত কানন।"

... যে আলাওলের প্রভুরাজ্যের অত্যুক্তি-দুষ্ট বর্ণনা এবং প্রভুভক্তির অত্যুৎ-
...ষ্ট নিদর্শন তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। অন্যদিকে যাহাই থাকুক, উত্তরে
...রোসাঙ্গের সীমা কখনও চট্টগ্রামের বহির্ভাগে এমন কি চট্টলের সমগ্র অংশেও
...তে পারে নাই। এখনকার লোকেরা চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশকেই
...সাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কি কারণে এবং কোন্ সময় হইতে রোসাঙ্গ
... পরিবর্ত্তে আরাকান নাম প্রচলিত হয়, ঐতিহাসিকগণের গবেষণার
... বটে।

তৎকালে শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নামে বৌদ্ধনরপতি রোসাঙ্গের রাজসিংহাসন
...কৃত করিতেছিলেন। ইনি বড় ধার্ম্মিক গুণগ্রাহী ও কাব্যামোদী ছিলেন।
...ওল তাঁহার প্রত্যেক কাব্যে মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসাগীতি গাহিয়াছেন।
...রাজা আলাওলের অসামান্য গুণগরিমার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ
...র সহকারে গ্রহণ করেন। এই পরম গুণবান রাজাই কোন কারণে
...আলাওলের সহিত দারুণ দুর্ব্যবহার করিয়া আশ্রিত বাৎসল্যের পরা-
...প্রদর্শন করিয়াছেন। এই রাজানুগ্রহ ছাড়া আলাওল রোসাঙ্গরাজের

*পর্তুগীজ জলদস্যু।

প্রধান অমাত্য পরমগুণবান, ধার্ম্মিক ও কাব্যামোদী মাগনঠাকুর … সৈয়দ মহম্মদ খানের সহিত পরম প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েন। … কাব্য হইতে জানা যায় যে, তৎকালে বৌদ্ধ রোসাঙ্গ রাজ-দরবারে ওমরাহদের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। সৈয়দ মুছা, সহস্র ছোলেমা উজীর আসরফ খান, মজলিস নবরাজ নামধেয় ওমরাহগণও এই … বারেরই রাজপরিষদরূপে শোভাবর্দ্ধন করিতেন। রোসাঙ্গরাজ্যে … শাসন প্রথাও প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। আলাওলের আমলে … ছউদ সাহ রোসাঙ্গের কাজী ছিলেন বলিয়া আলাওল লিখিয়া গিয়া… ইনি আলাওলকে গুণের পুরস্কার স্বরূপ 'কাদিরী' খেলাফত দিয়া… এইরূপে মাগন ঠাকুর প্রভৃতির পরম হৃদ্য 'প্রীতিচ্ছায়ে' কিন্তু … আলাওল কয়েক বৎসর বেশ নিরুদ্বেগে ও সুখে কালাতিপাত করি… মাগনই আলাওলের সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। এবং তাঁহারই … অনুরোধে তিনি দুইখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের … নের গুণগানে আলাওলের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উৎস উচ্ছলিত … হইয়া উঠিয়াছে এবং … দাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ" বলিয়া তিনি … নাকে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞ…পাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারই … তিনি প্রথম তাঁহ…র্ব্বপ্রধান গ্রন্থ 'পদ্মাবতী' রচনা করেন এবং … মুল্লুক ও বদিয়জ্জামা…র কিয়দংশ বিরচিত হইলে মাগন ঠাকুরের … ঘটে। এ হেন বান্ধব ও শরণ্য জনের বিপ্রয়োগে একান্ত শোকবিধুর হতাশ্বাস হইয়া আলাওল পূর্ব্বারব্ধ অসম্পূর্ণ কাব্যের পরিসমাপ্তি … নিরস্ত থাকেন।

এই শোকাবহ ঘটনার পর সুলতান সাহসুজা তাঁহার ভ্রাতা আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অবশেষে রোসাঙ্গরা… আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাহার দোষে জানি না, রোসাঙ্গরাজের সহিত সুজার মনোমালিন্য ঘটে। তাহাতে, সাহ সুজা সপরিবারে নিহত … তাঁহার মুসলমান অনুচরেরাও প্রভুর পদানুসরণ করে।(৩) মির্জ্জা … 'সত্যধর্ম্ম ভ্রষ্ট' এক দুরাত্মার অপবাদে রোসাঙ্গের কারাগারে বহুলোক … হয়। আলাওল এই মিথ্যাবাদী দুরাত্মা মির্জ্জাকে 'এজিদ প্রকৃতি …মীর নন্দন' বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার লেখারভাবে …বোধ হয়, এই পাপাত্মাই এই শোচনীয় অনর্থের মূলীভূত কারণ। এই …ত্মার পাপিষ্ঠ' আমাদের কবিরও অপবাদ ঘোষণা করে। তাহাতে তিনিও …বিচার না পাইয়া' কারারুদ্ধ হয়েন। এই পাপিষ্ঠও অবশেষে 'শাল …অগ্রে' উঠে। কিন্তু আলাওলকে অধিক দিন কারাক্লেশ ভোগ করিতে …য় নাই। পঞ্চাশ দিন মাত্র 'গর্ভবাস' সম কর্ম্ম নিয়োজিত কারাবাসের …র তিনি মুক্তিলাভ করেন।* অতঃপর শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা রাজাই আবার আলাওলকে সদয় ব্যবহারে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত অবমাননার …তিপূরণ করেন। আলাওল এই অকারণ দারুণ অপমানের কথা একটি… …রও ভুলিতে পারেন নাই সত্য কিন্তু একটিবারও অকৃতজ্ঞতার ঘোর পাপ… …ঙ্কে আপনাকে লিপ্ত হইতে দেন নাই। তাঁহার প্রত্যেক কাব্যের প্রারম্ভেই 'রোসাঙ্গের তারিপ' নিবদ্ধ করিয়া এই রোসাঙ্গরাজের স্তুতিগান করত তিনি কৃতজ্ঞতার ও প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত অকারণ দৈবদুর্গতির যবনিকা পতন হওয়ার পর আলাওল …রূপ নিশ্চেষ্টভাবে জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনয়ের মুহূর্ত্ত গণনা …রিতেছিলেন।(৪) এই সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রতিভা কোন কার্য্য সাধনে নিযুক্ত ছিল কি না, নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা … জানা যাইতেছে যে, তাঁহার পূর্ব্বারব্ধ সয়ফল মুল্লুকটী পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে তিনি শিথিল-

*"সৈয়দ ছউদ সাহা রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজি॥
দয়াল চরিত্র পির অতুল মহন্ত।
কৃপা করি দিলেক কাদিরী খেলাফত॥" দারা সৈ…

(৩) "He (Aurungzebe) drove out of India his second brother, the self-indulgent Shuja (1660), who perished miserably among the insolent savages of Arracan". Hunter's History of India. Vide also Mr. R. C. Dutt's Indian History. দীনেশ বাবুর মতে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহ সুজার মৃত্যু হয়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

*"কর্ম্মনিয়োজন দুঃখ পাইলুম কর্কশ।
গর্ভবাস সম ছিল পঞ্চাশ দিবস॥" সয়ফল মুল্লুক।

(৪) তাঁহার কোন্ কাব্য কখন রচিত হইয়াছিল, পরে দেখাইব।

প্রযত্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে 'স্বর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের' ন্যায় জীবনে তাঁহার মর্ম্মন্তুদ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। "সবে ভিক্ষা রক্ষা ক্লেশে দিন যায়" এবং "অসার্থক ভিক্ষা মাত্র যাহার জীবন" এই রোক্তি দ্বারা নিজ দুঃখময় শেষ জীবনের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন করিয়াছে।

> "এই মতে বহি গেল নবম বৎসর।
> খণ্ড বাক্য রহিল পুস্তক মনোহর॥"

এই নয় বৎসর কাল সয়ফল মুলুক অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। রাজের সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ জাদা সৈয়দ মুছা নামক এক অতি ধার্ম্মিক রসরসিক মহাজন 'সয়ফল মুলুক' সমাপ্ত করিবার জন্য আলাওলকে রোধ করিলে তিনি উত্তরে বলেন—

* * *

> "বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম্ম উচিত না হয়।
> রচিনু বহুল গ্রন্থ নানা আলাঝাল।
> রহিতে ঈশ্বরভাবে যুক্ত এই কাল॥
> বিশেষ অস্থানে পড়ি চিন্তাযুক্ত মন।
> অসার্থক ভিক্ষামাত্র যাহার জীবন॥
> হেনকালে কষ্ট কর্ম্মে আদেশ করহ।
> বিকলতা আমার মনেত না ভাবহ॥"

কিন্তু এইরূপ নানা আপত্তি করিলেও অবশেষে তাঁহাকে সৈয়দ মুছার রোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। সৈয়দ মুছার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সয়ফল মুলুকের উত্তরাংশ রচনা করিয়া দেন। পূর্ব্বরচিত অংশ অপেক্ষা শেষাংশ নিকৃষ্ট হইলে পাছে কেহ কিছু মনে করেন এই ভয়ে সুচতুর আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন—

> "বিশেষ জঞ্জাল ভাবে যায় নিশিদিন।
> বৃদ্ধ হৈল অথন্তে হইল বল ক্ষীণ॥"

কিন্তু তাঁহার এই ভয়ের কিছু মাত্র আবশ্যকতা ছিল না। এই বাক্য ইহাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে তিনি এই সময়ে বৃদ্ধ দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনের কোন সংবাদ অবগত হওয়ার যো নাই।

কবির নিজ বিবরণী হইতে তাঁহার জীবনের যাহা জানিতে পারা তাহা উপরে বিবৃত হইল। এখন আমাদের বক্তব্য।

তিনি নিজেই সয়ফল মুলুকে বলিয়াছেন, তাঁহার আগমনের পরে(৫) ...ন সাহ সুজা রোসাঙ্গে পলাইয়া আসেন। সাহ সুজার পলায়নকাল ... খ্রীষ্টাব্দ। যদি সাহ সুজার সমভিব্যাহারে কিম্বা তাঁহার দুই চারি ... পূর্ব্বে তিনি রোসাঙ্গে আগমন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রোসাঙ্গ ... ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ কি তাহার দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে।

আলাওলের সঙ্গে তাঁহার পিতাও রোসাঙ্গে আসিতেছিলেন, ইহা ... উক্ত হইয়াছে।

> "সহিদ হইল পিতা যুঝি বহুতর।"

... বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তখনও তাঁহার পিতা নিতান্ত ...দশায় উপনীত হন নাই; প্রত্যুত তখনও তাঁহার শরীরে যুদ্ধকর...যোগী সামর্থ্য ছিল। এখন তাঁহার পিতাকে ঊর্দ্ধপক্ষে ষষ্ঠি বর্ষ বয়স্ক ... তখন আলাওলের বয়স কত হইতে পারে? আলাওলকে তাঁহার ... প্রথম সন্তান ধরিলেও তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক পঁয়ত্রিশের ...ধিক কল্পনা করা সঙ্গত নহে। এতদ্দ্বারা তাঁহার জন্ম আনুমানিক ২৭৫ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছে। অতএব তাঁহার জন্মকাল আনুমানিক ...৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ।*

তাঁহার সময় নির্দ্ধারণের অন্য উপায়ও আছে। তাঁহার রচিত 'সপ্ত পয়কর' কাব্যের শেষে এরূপ একটা কাল দেওয়া আছে।

> মুসলমানী সন কহি শুন গুণিগণ।
> চন্দ্র যুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন॥
> ইকুণীসনের কথা কহিয়ে বিচারি।
> ইন্দু পৃষ্ঠে বস শূন্য শেষে দিয়া চারি॥(৬)

(৫)তাঁহার 'দারা সেকান্দরে' দেখা যায় যে, তিনি সাহ সুজার সহিত রোসাঙ্গে আগমন করেন।

> "সাহ সুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈব গতি।
> হত বুদ্ধি পাত্রে সব দিল, হত মতি॥"

*দীনেশ বাবুর অনুমান মতে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, দীনেশ বাবুর পুস্তকে 'আলাওল'কে প্রায়ই 'আলোয়াল' লিখিত হইয়াছে। 'আলোয়াল' ভুল।

(৬)এই পদের ভুল সহজেই দৃষ্ট হইতেছে 'বস' না হইয়া 'রস' কি 'বসু' হইবে, সন্দেহ নাই।

কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া।
শূন্য সুত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া॥
মঘী সন কহি মনান্তরে করি ভীত।
চন্দ্র পরে চন্দ্র ঋতু পৃষ্ঠে তারনীত॥

কিন্তু এইকাল তাঁহার জন্মকাল কি পুস্তক সমাপ্তির কা... কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্ব্বোক্ত পদগুলির অবিকৃততা এবং বিশুদ্ধ... ঘোর সন্দেহ আছে, কারণ 'সাত নকলে আসল খাস্ত' হইয়া যায়, ... লেই জানেন। যুগ যুগান্তরাবধি হস্তলিপিগুলি হস্তান্তরিত হইতে অবশেষে মুদ্রাযন্ত্র প্রভাবে এই জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; সময়ান্তরে ... হইলে এই আশঙ্কিত-বহুলাবর্জ্জন, অজগর-পণ্ডিত-কবলিত, ... অনধিগম্য কাব্যগ্রন্থগুলি কোন্‌রূপ ধারণ করিবে, জানি না। ... ক্ষিত, সামান্য সাহিত্য-জ্ঞান-পরিশূন্য, মুসলমান-প্রকাশক ধুরন্ধ... পড়িয়া আলাওলের এমন সুন্দর অমূল্য গ্রন্থ সকলের যে দুর্দ্দশা তাহা ভাবিলে উদ্ধৃত পদগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদের মতের অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।(৭) আলাওল প্রসিদ্ধ 'লোর চন্দ্রা... সুকবি দৌলত কাজির পরবর্ত্তী কবি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই 'লোরচন্দ্রা... উত্তরাংশ আলাওলের লেখনীসম্ভূত। ইহার সমাপ্তিকালে এই কালটা... গিয়াছে—

মুসলমানী শক সংখ্যা শুন গুণিগণ।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া অপর দুই দিগে।
শুক্র কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে॥
মগধের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বাণে দুর্গাঙ্কন॥
শ্রাবণের বসু দিন আশিনে রুদ্রাঙ্গ।
তদন্তরে লেখি পুস্তক করিলাম সাঙ্গ॥"

'সপ্ত পয়কর' হইতে উদ্ধৃত কাল সম্বন্ধে সেই অভিমত, এখানে ... তাহাই। পাঠাশুদ্ধি বশতঃ ঠিক অর্থের অনুসরণ করিতে আমি পারি নাই।

(৭)সাহিত্য ১৩০১ সাল।

...যতঃ এই উভয় গ্রন্থ প্রদত্ত কালের সামঞ্জস্য বিধান কোনরূপেই করিতে ... গেল না। ঐতিহাসিক ঘটনার কালের সহিত ঐ সকল সনের এক... রূই মিল হয় না। এই কারণে উদ্ধৃত পদাদির কাল নিরূপণে ব্যস্ত না ...য়া কোন অভিজ্ঞ ঐতিহাসিককে তদ্বিষয় মীমাংসার জন্য সাদরে আহ্বান ...রিতেছি। আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আলাওল বিদেশে জন্মগ্রহণ করেন সত্য কিন্তু তাঁহার জীবন এই চট্ট-...গ্রামেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

"বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি টুটি আসে।
যৌবনকালের কথা মনে না উল্লাসে॥"

...ক্য দ্বারা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাঁহার রোসাঙ্গে অবস্থিতি সূচিত হইতেছে।(৮)

(৮)দেখা যাইতেছে যে, রোসাঙ্গেই তাঁহার সারাজীবন পর্য্যবসিত হই... ...ছে। তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন কি না এবং তাঁহার সন্তানসন্ততি ...ল কি না, তিনি কোথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নাই। 'দারা ...ক্ষ্যরে' এইটুকুমাত্র আছে,—

"মন্দকৃত ভিক্ষাবৃত্তি জীবন দুর্দ্দশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ॥
গুণহেতু মহাজনে করয় আদর।
ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা নিজ কর॥"

তাঁহার বংশ বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখানে একটী বড় আশ্চর্য্য ... বলিতে হইতেছে। 'পদ্মাবতী'র প্রকাশক হামিদুল্লা নামক ব্যক্তি ...নিক কালের লোক। সম্প্রতি পরলোকগত। বাড়ী কোথা জানি না। ...ইনি এবং এখন তৎপুত্র পদ্মাবতীর বিজ্ঞাপনে লিখিতেছেন,—"আমার ... শ্রী৺মোলবী হামিদুল্লা সাহেব গ্রন্থকর্ত্তা সাহেবের পুত্র শ্রীছৈয়দ নুরদ্দিন ...ত ..খরিদ করিয়া......। ইতি সন ১৩০১ সাল, তারিখ ৮ই চৈত্র।" ...ছৈয়দ নুরদ্দিন কে এবং কোথাকার লোক, জানা আবশ্যক বটে! ...শ শতাব্দীর লোক অদ্যাপি জীবিত আছে, কি আশ্চর্য্য কথা! আলা-...ওলের পৌত্রও ত এতদিন বর্ত্তমান থাকিতে পারে না! প্রকাশকের চাতুরী ...রিতে আর বাকী নাই।

ইনি 'পদ্মাবতী'র (এবং সয়ফল মুলুকেরও বটে) copy-right রেজেষ্ট্রী করাইয়া বলিতেছেন যে "কবিতা পুথির নাম বা এবারত যদি কেহ কোন-রূপে প্রতারণা করিয়া কোন মতে কোন ভাবে বদল করিয়া ছাপাইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবেক ও আমার সমুদয় খেসারত বুঝিয়া দিতে হইবেক।" সাহিত্য-সংসারে এমন স্বার্থপর কিন্তু গণ্ডমূর্খ জুয়াচোর এতো...

কিন্তু তিনি কত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন? কত বৎসর বয়স হইলে [illegible] কালের কথা দ্বারা মানব মন উল্লাসিত হয় না; এবং অন্ততঃ দুই শত [illegible] বর্ষ পূর্ব্বে কত বয়স বৃদ্ধকাল বলিয়া পরিগণিত হইত? আমরা অবগত [illegible] অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্বে চল্লিশ বৎসর বয়স না হইলে সাধারণ [illegible] বিবাহ পর্য্যন্ত হইত না। কালের কি কুটিল গতি? এখন চল্লিশ [illegible] লোককে বৃদ্ধ হইতেও দেখিতেছি।

আমাদের কবিও অনুন ৭০।৮০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, অনুমান [illegible] অসঙ্গত হইবে না। সম্ভবতঃ তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত [illegible] ছিলেন। সম্ভবতঃ রোসাঙ্গেই তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হয়। কিন্তু [illegible] এই অন্তর্দ্ধানের কোন সমাচার স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ মানব সমাজ রাখে [illegible] ইহাই সমধিক পরিতাপের বিষয়।(৯)

শ্রীআবদুল [illegible]

অবাধে আপন স্বার্থসিদ্ধি করিয়া গেল! এই হামিদুল্লার অপূর্ব্ব আলাওলের এমন সুন্দর গ্রন্থগুলি কি বীভৎস বিকৃত আকার [illegible] তাহা 'পদ্মাবতী' দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই মহাপুরুষ নিজ [illegible] কিছু (যেমন 'সয়ফল মল্লুকে' বাদয়জ্জামালের বার মাস) আলাওলের [illegible] সন্নিবিষ্ট করিয়া "কবিযশঃপ্রার্থী" হইয়াছেন। ইহার পুত্র বর্ত্তমান [illegible] শ্রীওহিদন্নবি কলিকাতা থানাসীটোলা ওয়েলেস্লী ষ্ট্রীট [illegible]নং গৃহে [illegible] বিক্রয় করেন। কেহ খোঁজ করিবেন কি?

(৯)চট্টগ্রাম সদর হইতে আট মাইল উত্তরে পশ্চিম জোবরা নামক [illegible] 'আলাওলের ডিঘী' নামে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় আছে এবং [illegible] উত্তর পারের বহির্ভাগে ইষ্টক নির্ম্মিত মসজিদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি [illegible] হয়। তদ্দেশবাসীরা সেই স্থানেই আবার মাটীয়া দেওয়ালের এক [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ উক্ত ডিঘী ও মসজিদের প্রতিষ্ঠা [illegible] আলাওলকে আমাদের সমালোচ্য কবি আলাওল বলিয়া নির্দ্দেশ [illegible] এই জোবরা গ্রামের অল্প দক্ষিণে ফতেয়াবাদ নামক গ্রামে "নশরত [illegible] হের" অমর কীর্ত্তিরূপে তন্নামধেয় অতি প্রকাণ্ড ডিঘী অদ্যাপি [illegible] সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর [illegible] স্থানে "লস্কর উজীরের" প্রকাণ্ড ডিঘী রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই [illegible] উজীর"ই রোসাঙ্গের চন্দ্রানীর "লস্কর উজীর আসরফ খান" হইবেন। গৌড়ের [illegible] বাদসাহীসম্পৃক্ত অনেক মহাত্মার কীর্ত্তি চট্টগ্রামে অদ্যাপি আছে।

বসন্তসেনা।

(৪০২ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

বসন্ত। (স্বগত) এর অনুনয়ও যে ভয় উৎপাদন করে! আচ্ছা, এই কথা। (প্রকাশ্যে) মশাই! আপনারা কি আমার অলঙ্কারগুলি নিতে চাচ্ছেন?

বিট। দূর হউক। অয়ি বসন্তসেনে! উদ্যান-লতার পুষ্প হরণ করা অনুচিত কর্ম্ম, অতএব অলঙ্কার চাই না।

বসন্ত। তবে এখন কি?

শকার। আমি দেবপুরুষ, মনুষ্য, বাসুদেব; আমাকে ভজনা কর।

বসন্ত। (সক্রোধে) শান্ত হও, শান্ত হও, দূর হও; বড্ড অন্যায় বল্‌ছো।

শকার। (হাস্যপূর্ব্বক হাতে তালি দিয়া) মশাই! মশাই! এই দেখুন, এই বেশ্যারবেটী মনে মনে আমায় ভালবাসে; যেহেতু আমাকে বল্‌ছে যে, "তুমি শ্রান্ত হ'য়েছ, ক্লান্ত হ'য়েছ"। আমি গ্রামান্তরেও যাইনি, কিম্বা নগরান্তরেও যাইনি। আর্য্যে! আমি এই ভদ্রলোকের মাথায় পা দিয়ে দিব্যি ক'রে বল্‌ছি—তোমারই পিছু পিছু ঘুরে আমি শ্রান্ত হ'য়েছি, বড় ক্লান্ত হ'য়েছি।

বিট। (স্বগত) অয়ে! "শান্ত" বল্‌তে যে এ মূর্খ "শ্রান্ত" মনে কচ্চে!! (প্রকাশ্যে) বসন্তসেনে! তুমি বেশ্যাদের বিপরীত কথা বল্‌ছো।, দেখ—

বেশ-বাসে যুব-জন প্রধান সহায়,
পথিজাতালতাসম তুমি লো গণিকা;
বহিতেছ ধন-লভ্য পণ্য-ভূত কায়,
সুপ্রিয়ে অপ্রিয়ে হও সমান সেবিকা।

আরও দেখ—

অবগাহে জলাশয়ে ব্রাহ্মণ প্রবর
তথা মূর্খ হীনজাতি,
ফুল্ল-লতা বায়সেও নামায়, যাহার
হয় শিখী হ'তে নতি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যাহে পার পায়
সেই নৌকায় ইতরে;
বাপী-সম লতা-সম নৌকা-সম তুমি
বেশ্যা ভজ সবাকারে।

বসন্ত। গুণই অনুরাগের কারণ, বলাৎকার নয়।

শকার। মশাই! মশাই! এই গর্ভদাসী কামদেবের বাগানে দেখা হওয়া অবধি সেই দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি অনুরক্তা, আমাকে চায় না। বামদিকেই তার ঘর, এ যাতে তোমার এবং আমার হাত থেকে পালাতে না পারে, তাই করুন মশাই!

বিট। (স্বগত) যা গোপন করা উচিত, এ মূর্খ তাই ব'লে দিচ্চে। বসন্তসেনা যে আর্য্য চারুদত্তে অনুরক্তা! একথা যথার্থই বটে যে—রত্নের সহিতই রত্ন মিলিত হয়। তবে যাক্‌গে; এ মূর্খের দরকার কি? (প্রকাশ্যে) কানেলীমাতঃ!* বামদিকেই সেই সার্থবাহের ঘর?

শকার। তাবৈকি? বামদিকেই তার ঘর।

বসন্ত। (স্বগত) হ্যাঁ! বামদিকেই তাঁর ঘর, একথা সত্যই বটে। অপরাধী দুর্জ্জনের দ্বারাও উপকৃত হ'লেম, যেহেতু প্রিয়সমাগম প্রাপ্ত হয়েছি।

শকার। মশাই! মশাই! মাষকলাইএর মধ্যে কালবড়ী ঢুক্‌লে যেমন তাকে খুঁজে পাওয়া ভার হয়, এ অন্ধকারেও সেইরূপ বসন্তসেনাকে দেখা যাচ্চে না।

বিট। ওঃ! ভয়ানক অন্ধকার!!

যদিও প্রসরা দৃষ্টি উন্মীলিতা সম,
অন্ধকারাকুলা হ'য়ে নিমিলিতা মম।

আরও দেখ—

অন্ধকার যেন লেপিছে শরীর,
বরষে কাজল যেন এ গগন;
বিফল হইছে হায়! নিরন্তর,
কুলোকের সেবা-সম দরশন।

শকার। মশাই! মশাই! বসন্তসেনাকে খুঁজে দেখি।

বিট। কানেলীমাতঃ! কোন চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?

শকার। মশাই! মশাই! সে কেমন?

বিট। অলঙ্কারের শব্দ অথবা সুরভি মাল্যগন্ধ?

শকার। মাল্য-গন্ধ শুন্‌ছি বটে, কিন্তু অন্ধকারে নাক পু'রে গেছে ব'লে অলঙ্কারের শব্দটা ভালরূপ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

*কানেলীমাত!=অনূঢ়া-গর্ভজাত!

বিট। (জনান্তিকে) বসন্তসেনে!

অদৃশ্যা হ'য়েছ তুমি সায়াহ্ন আঁধারে,
বিলীনা মেঘের কোলে চপলার প্রায়;
তোমার(ই) যে মাল্যগন্ধ জন-মন হরে
প্রকাশিবে সে মুখর নূপুর তোমায়।

শুন্‌লে? বসন্তসেনে!

বসন্ত। (স্বগত) শুনেছি, বুঝেওছি। (নূপুর ও মাল্য গাত্র হইতে অপসারণপূর্ব্বক একটু অগ্রসর হইয়া এবং হস্ত দ্বারা স্পর্শ সূচনা করিয়া) অহো! ভিত্তির স্পর্শানুসারে এ পার্শ্বদ্বার ব'লে বোধ হচ্চে; হস্তসংযোগে বুঝ্‌তে পাচ্চি যে দোরটা বন্ধ আছে।

চারু। বয়স্য! আমার জপ সমাপ্ত হ'য়েছে, অতএব এখন যাও, মাতৃ পূজার উপহার প্রদান কর'গে।

বিদূ। ওহে! আমি যাবনা।

চারু। ধিক্! কি কষ্ট!!

পুরুষের দরিদ্রতা-হেতু বন্ধু-জন
কভু রহে না কথায়,
প্রণয়ী সুহৃদ্‌গণ সতত বিমুখ
হয় আপদ্ সহায়।
শীল-চাঁদিমার কান্তি সতত মলিনা,
স্বীয় বল নাশ পায়,
অপরেও পাপকর্ম্ম যাহা কিছু করে
সব সম্ভবে তাহায়।

আর—

সংসর্গ করে না কেহ কখন ইহার,
নাহি ডাকে সমাদরে;
উৎসবে ধনীর গৃহে হ'লে উপনীত
সবে অবজ্ঞায় হেরে।
ভদ্রলোক হে'রে রহে দূরে লজ্জা-হেতু,
পরা মলিন বসন;
বোধ হয় নির্ধনতা ষষ্ঠ মহাপাপ,
এই নূতন সৃজন।

আর— হে দারিদ্র্য! তব হেতু এই শোক মম,
সুহৃদ্ ভাবিয়ে তুমি, ক'রেছ নিবাস-ভূমি—
আমার শরীর পরে হইলে নিধন,
কোথায় থাকিবে এই করিছে চিন্তন।

বিদূ। (সলজ্জভাবে) ওহে বয়স্য! যদি আমার যাওয়া আবশ্যক হয়, তবে রদনিকা সঙ্গে চলুক।

চারু। রদনিকে! তুমি মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও।

রদ। যে আজ্ঞে।

বিদূ। অয়ি রদনিকে! অই পূজার সামগ্রী আর প্রদীপ নিয়ে চল, আমি দরজাটা খুলি। (তাহাই করিল)।

বসন্ত। আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্যই যেন দোরটা খুলেছে। (দেখিয়া) হায়, হায়, প্রদীপ যে

(আঁচল দ্বারা নিবাইয়া প্রবেশ করিল)।

চারু। মৈত্রেয়! এ কি?

বিদূ। খোলাদরজা দিয়ে বাতাস এসে প্রদীপটা নিবিয়ে ফেলেছে। ও রদনিকে! তুমি বেরিয়ে যাও, আমিও বাড়ীর ভিতর থেকে আলোটা জ্বেলে নিয়েই আস্‌ছি। [নিষ্ক্রান্ত]।

শকার। মশাই! মশাই! বসন্তসেনাকে তল্লাষ করি।

বিট। হাঁ, তল্লাষ কর, তল্লাষ কর।

শকার। (অন্বেষণ করিয়া) মশাই! মশাই! ধ'রেছি, ধ'রেছি।

বিট। আ—মূর্খ! এ যে আমি!!

শকার। তবে মশাই! আপনি একদিকে দাঁড়ান।

[পুনর্ব্বার অন্বেষণপূর্ব্বক ভৃত্যকে ধরিয়া] মশাই! মশাই! ধ'রেছি, ধ'রেছি।

ভৃত্য। কত্তা মোশাই, আমি চাকর।

শকার। এখানে মশাই, ওখানে চাকর; মশাই চাকর, চাকর মশাই। তোমরা দুজন একখানে দাঁড়াও। (আবার অন্বেষণপূর্ব্বক রদনিকার চুলে ধরিয়া) মশাই! এখন ধ'রেছি, ধ'রেছি বসন্তসেনাকে—

অন্ধকারে করে ফের, মাল্যগন্ধে পেয়ে টের,
বসন্তসেনার আমি ধরেছি চিকুর;
দ্রৌপদীরে ধরে যথা চাণক্যঠাকুর।

বিট। যৌবন-গরবে তব কুল-সুতে অভিলাষ,
কুসুমে ভূষিত তব ধরিয়াছে কেশপাশ।

শকার। ধরিয়াছি বাসু! তোমার মাথেতে,
কেশে বাঁধে আমি শিরোরুহেতে;
ডাক হাঁক কর হুঙ্কার ভীষণ,
শম্ভু শিব ঈশ রুদ্র পঞ্চানন।

রদ। (সভয়ে) মশাইরা! কি আরম্ভ কল্লেন?

বিট। কানেলীমাতঃ! এ অন্যরূপ স্বর শুনা যাচ্চে।

শকার। মশাই, মশাই, যেমন দইএর লোভে বিড়ালীর স্বর বিকৃতি হয়, তেম্‌নি এ বাঁদীর বেটীও স্বর পরিবর্ত্তন ক'রেছে।

বিট। স্বর-পরিবর্ত্তন কল্লে কি ক'রে? কি আশ্চর্য্য! অথবা আশ্চর্য্যই বা কি?

রঙ্গ-ভূমে প্রবেশিয়ে শিখে নাচগান,
বঞ্চনে চতুরা স্বরে করেছ সন্ধান।

বিদূ। (প্রবেশ করিয়া) আশ্চর্য্য! ওহে! বন্ধন-স্তম্ভে বদ্ধ-ছাগলের মত সায়াহ্ন-মারুতে প্রদীপটা ফুর্ ফুর্ কচ্ছে।

[গমন করিয়া ও রদনিকাকে দেখিয়া] অয়ি রদনিকে!

শকার। মশাই! মশাই! মানুষ!! মানুষ!!!

বিদূ। বড্ড অসঙ্গত, ভারি অন্যায়, যে, আর্য্য চারুদত্ত দরিদ্র হয়েছে বলে পর-পুরুষ এসে ঘরে প্রবেশ কচ্চে!

রদ। আর্য্য মৈত্রেয়! দেখ আমার দুর্দ্দশা?

বিদূ। কি! তোমার দুর্দ্দশা? না আমাদের?

রদ। তোমাদেরই।

বিদূ। এ কি বলাৎকার?

রদ। তাবৈ আর কি?

বিদূ। সত্যই?

রদ। হাঁ, সত্যই।

বিদূ। [সক্রোধে লাঠি হাতে তুলিয়া] ওরে! এরূপ করিস্ না, নিজের ঘরে কুক্কুরও প্রচণ্ড হয়, আর আমি তো ব্রাহ্মণ। তবে দেখ্ আমাদের

অদৃষ্টের মত এই ব্যাঁকা লাঠি দিয়ে শুক্‌নো বাঁশের মাথার মত তোর মাথা ভাঙ্‌ব।

বিট। ওহে মহাব্রাহ্মণ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বিদূ। [বিটকে দেখিয়া] এতে ইহার কোন অপরাধ নাই। [শকারকে দেখিয়া] এই ব্যাটাই ইহাতে সম্পূর্ণ অপরাধী। অঁরে-রেঁ-রাজার শালা সংস্থানক!* দুষ্ট! দুর্জ্জন! এ বড্ড অন্যায়। যদিও এখন আর্য্য চারুদত্ত দরিদ্র হয়েছেন, তবু কি তাঁর গুণে উজ্জয়িনী অলঙ্কৃতা হয় নি? যে, তাঁর ঘরের ভিতর প্রবেশ করে পরিজনের এইরূপ অবমাননা কচ্চিস্?

দরিদ্র বলিয়ে নহে হেয়,
যমের নিকটে দীন ধনী অবিশেষ;
দুশ্চরিত্র ধনবান্ দুর্গত অশেষ।

বিট। [লজ্জিত হইয়া] মহাব্রাহ্মণ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। অন্য লোক মনে করে এরূপ কাজ হয়েছে, দর্পহেতু নয়। দেখ—

অন্বেষেছি মোরা।

বিদূ। একে নাকি?

বিট। দূর হউক। এক সকামা যুবতী;—
পালায়েছে, তার ভ্রমে ইহার দুর্গতি।

এখন বিনীত প্রার্থনা এই যে—আপনি ক্ষমা করুন।

[এই বলিয়া খড়্গ পরিত্যাগ করতঃ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক পদে পতন]।

বিদূ। ওহে সাধো! উঠ, উঠ। আমি না জেনে তোমাকে তিরস্কার করেছি, এখন জেনে অনুনয় কচ্চি।

বিট। এতে আপনিই অনুনয়ের পাত্র। তবে উঠ্‌ব, যদি একটী কথা স্বীকার করেন।

বিদূ। বলুন মশাই।

বিট। যদি এই বৃত্তান্ত আর্য্য চারুদত্তকে না বলেন।

বিদূ। আচ্ছা, বল্‌ব না।

বিট। তোমার আদেশ হল মস্তকে গৃহীত,
যেহেতু সশস্ত্র মোরা গুণ-শস্ত্রে জিত।

*সংস্থানক = শকারের নাম।

শকার। [সক্রোধে] কি জন্য মশাই এত কাকুতি মিনতি করে এ দুষ্ট বামুনের পায়ে পড়্‌ছেন?

বিট। আমি ভীত হয়েছি।

শকার। কার কাছে তুমি ভয় পেলে?

বিট। আর্য্য চারুদত্তের গুণের কাছে।

শকার। তার আবার গুণ কি? যার ঘরে প্রবেশ করে চার্‌টা খাবার পর্য্যন্ত নাই।

বিট। না, এমন কথা বল না।

আমাদের প্রার্থনায় হয়েছে নির্ধন,
অদানে করেনি কভু কার অমানন;
নিদাঘের জলপূর্ণ জলাশয় সম,
সকলের তৃষ্ণা হরে এবে ক্ষীণতম।

শকার। [সক্রোধে] কে, সে বাঁদীর বাচ্ছা?
বলীশূর? শ্বেতকেতু পাণ্ডব প্রবীর?
রাধাসুত? ইন্দ্রপুত্র? কিম্বা দশ-শির?
অথবা কুন্তীর গর্ভে রামের জনিত?
অশ্বত্থামা? জটাযুবা? কিম্বা ধর্ম্মসুত?

বিট। মূর্খ! তিনি আর্য্য চারুদত্ত।

নির্ধনের কল্প-তরু গুণ-ফলে নত,
তিনি কুটুম্ব সাধুর;
শিক্ষিতের সমাদর্শ সুশীল-নিকষ,
শীল-বেলার সাগর।
সাধুকারী সমাদরী নর-গুণ-নিধি,
তাঁর স্বভাব উদার;
সেই এক শ্লাঘ্যতম, আর সকলের
ভবে জীবন অসার।

অতএব চল এখান থেকে যাই।

শকার। বসন্তসেনাকে না নিয়ে?

বিট। বিলুপ্তা বসন্তসেনা।

শকার। কেমন ?

বিট। অন্ধকের দৃষ্টি-সম পুষ্টি আতুরের,
মূর্খের বিবেক সম সিদ্ধি অলসের;
স্মৃতিহীন ব্যসনীর যথা বিদ্যাধন,
শত্রুতে প্রণয় সম বিলুপ্তা সে জন।

শকার। বসন্তসেনাকে না নিয়ে যাব না।

বিট। একথাও কি তুমি শুননি ?

"আলানে রাখিবে করী, রাখ অশ্ব বল্গা ধরি,
হৃদিস্থল রমণীর ঠাঁই;"—
তদভাবে এস চলে যাই।

শকার। যেতে হয় তুমি যাও, আমি যাব না।

বিট। আচ্ছা, আমি চল্লেম। [নিষ্ক্রান্ত]।

শকার। ভাবের* তো অভাব হল।

[বিদূষককে লক্ষ্য করিয়া] অরে—কাকপেয়ে টিকিওয়ালা!
দুষ্ট বামুন! বস্, বস্।

বিদূ। আমরা বসেই আছি।

শকার। কে বসাল ?

বিদূ। দৈব।

শকার। উঠ্, উঠ্।

বিদূ। উঠ্ব।

শকার। কখন ?

বিদূ। যখন আবার দৈব অনুকূল হবেন।

শকার। অরে, কাঁদ্, কাঁদ্।

বিদূ। আমরা কেঁদেই আছি।

শকার। কে কাঁদাল ?

বিদূ। দুর্গতি।

শকার। অরে, হাঁস্, হাঁস্।

বিদূ। হাঁস্ব।

*ভাব=মান্যবাচক।

শকার। কখন ?

বিদূ। আবার আর্য্য চারুদত্তের সম্পত্তি হ'লে।

শকার। অরে—রে! দুষ্ট-বামুন! আমার কথায় সেই দরিদ্র চারুদত্তকে বলিস্—"এই সুবর্ণময়ী স্বর্ণালঙ্কৃতা নব-নাটক-দর্শনোত্থিতা-সূত্রধারীর ন্যায় বসন্তসেনানাম্নী গণিকা-দারিকা কামদেবের বাগানে দেখা হওয়া অবধি তোমাতে অনুরক্তা, আমাদের দ্বারা বলাৎকারের জন্য অনুনীয় মানা হ'য়ে তোমার ঘরে প্রবেশ করেছে। অতএব যদি নিজেই ইহাকে আমার হাতে সমর্পণ কর, তবে আদালতের বিচার ছাড়া ফিরিয়ে দিয়েছ বলে আমার সঙ্গে তোমার বিশেষ প্রণয় জন্মিবে; আর যদি না দেও, তবে আজীবনের জন্য শত্রুতা হইবে আরও দেখ, দেখ—

গোবর-মাখা-কুমড়ো আর শুক্‌নো-শাক যত,
হিমের রে'তে সিদ্ধভাত মাংস ঘৃত-যুত;
সময় গেলে এ সকলের হয় না কো বিকার,
মনে রেখ আমার কথা, বলিলাম সার।

ভাল করে বলিস্, আস্তে আস্তে বলিস্; এমন করে বলিস্, যাতে আমি নিজ দালানের কপোতপালিকাতে বসে শুন্‌তে পারি। তা না হলে, যদি না বলিস্, তবে কপাটের তলে প্রবিষ্ট কত-বেলের মত মড়্ মড়্ করে তোর মাথা খাব।

বিদূ। বল্‌ব।

শকার। (জনান্তিকে) ভৃত্য! বিটমশাই সত্যই চলে গেলেন ?

ভৃত্য। আজ্ঞে তা বৈকি ?

শকার। তবে শিগ্‌গির্ করে চল, আমরাও যাই।

ভৃত্য। তবে কত্তা মোশাই, তরবারি গ্রহণ করুন।

শকার। তোমার হাতেই থাক্।

ভৃত্য। এ কত্তার অসি, কত্তামোশাই-ই গ্রহণ করুন।

শকার। (উল্টাভাবে ধরিয়া)

নিষ্কোষ মূলক-পেশি-সমবর্ণ যার,
কোষে রেখে কাঁধে লয়ে সে অসি আমার;

কুক্কুর কুক্কুরীগণে অনুগম্যমান,
শৃগালীর সম ঘরে করিব প্রস্থান।

(পরিক্রমণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত)।

বিদূ। ও রদনিকে! তোমার এ অপমান আর্য্য চারুদত্তের কাছে বলা কর্ত্তব্য নয়; দরিদ্রাবস্থায় পড়েছে বলে এতে তাঁর দ্বিগুণতর কষ্ট হবে।

রদ। আর্য্য মৈত্রেয়! আমি সংযত-মুখী রদনিকা।

বিদূ। হাঁ, তাই বটে।

চারু। (বসন্তসেনাকে লক্ষ্য করিয়া) রদনিকে! বায়ুসেবী রোহসেন সন্ধ্যাকালীন-শীতে বড় কাতর হয়েছে, অতএব একে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও; এই চাদরখানা এর গায়ে দাও। (এই বলিয়া চাদর-প্রদান)।

বস। (স্বগত) আমাকে যে চাকরাণী বলে মনে কচ্চে!

(চাদর গ্রহণ ও আঘ্রাণপূর্ব্বক সস্পৃহে স্বগত) অহো! চাদরখানা জাতিফুলে সুবাসিত। ইহার যৌবন ভোগাসক্ত বলে বোধ হচ্চে। (একটু আড়ালে চাদরখানা উহার গায়ে প্রদান)।

চারু। অয়ি রদনিকে! রোহসেনকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর যাও।

বস। (স্বগত) আমি মন্দভাগিনী, তোমার বাড়ীর ভিতর যাওয়ার উপযুক্তা নই।

চারু। ও রদনিকে, উত্তর ও নাই? অঃ—কি কষ্ট?

দৈবযোগে ভাগ্যদোষে মানব যখন
দুর্দ্দশায় পড়ে, হায়! তদা বন্ধুগণ
শত্রু-সম আচরণ করে অনুক্ষণ,
অনুরক্ত জন হয় বিরক্ত তখন।

(বিদূষক ও রদনিকা উপগত হইয়া।)

বিদূ। ওহে! এই সে রদনিকা।

চারু। এই সে রদনিকা? তবে এ আবার কে?

অবিদিতা মম গাত্রাবরণে দূষিতা,—

বসন্ত। (স্বগত) ওহে! ভূষিতা।

চারু। বিরাজিছে চন্দ্রলেখা-সম মেঘাবৃতা।

অথবা পরস্ত্রীদর্শন সমুচিত নয়।

বিদূ। ওহে! পর-কলত্র দর্শনের আশঙ্কা কেন কচ্চ? এ বসন্তসেনা, কামদেবের বাগানে দেখা হওয়া অবধি তোমাতে অনুরক্তা।

চারু। অয়ে! এ—বসন্তসেনা?

(স্বগত) আমার সম্পদচয়, ক্ষীণ হলে অতিশয়,
যাহার প্রণয়ে পায় বিজনিতকাম
কুলোকের ক্রোধসম স্বদেহেবিরাম।

বিদূ। ওহে বয়স্য, এই রাজার শালা বলেছে—

চারু। কি?

বিদূ। "এই সুবর্ণময়ী স্বর্ণালঙ্কৃতা নবনাটকদর্শনোত্থিতা সূত্রধারীর ন্যায় বসন্তসেনা নাম্নী গণিকাদারিকা কামদেবের বাগানে দেখা হওয়া অবধি তোমাতে অনুরক্তা, আমাদের দ্বারা বলাৎকারের জন্য অনুনীয়মানা হয়ে, তোমার ঘরে প্রবেশ করেছে,

বস। (স্বগত) "বলাৎকারের জন্য অনুনীয়মানা"—একথা সত্য বটে। এই কয়টী কথায় আমি অলঙ্কৃতা হলেম।

বিদূ। অতএব যদি নিজেই ইহাকে আমার হাতে সমর্পণ কর, তবে আদালতের বিচার ছাড়া ফিরিয়ে দিয়েছ বলে আমার সঙ্গে তোমার বিশেষ প্রণয় জন্মিবে; আর যদি না দেও, তবে আজীবনের জন্য শত্রুতা হইবে।"

চারু। (অবজ্ঞার সহিত) এ মূর্খ। (স্বগত) অয়ে, এ যে দেবতার ন্যায় উপাসনার যোগ্যা, তজ্জন্যই সেই সময়ে—

"ঘরে যাও" এইরূপে অনুরুদ্ধা হয়ে,
নাহি গেল অভাগার দুর্দ্দশা হেরিয়ে;
যদ্যপি বহুভাষিণী, তবু নাহি কহে বাণী,
ধৃষ্টতার সহ, হেথা পুরুষ দেখিয়ে।

(প্রকাশ্যে) অয়ি বসন্তসেনে! আমি না জেনে তোমাতে পরিজনের ব্যবহার করে অপরাধী হয়েছি, অতএব অবনতমস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি।

বস। এই অন্যায়রূপে আপনার গৃহে প্রবেশ করে আমিই অপরাধিনী হয়েছি, অতএব অবনতমস্তকে প্রণাম কচ্চি, ক্ষমা করুন।

বিদূ। ওহে, তোমরা সানন্দে প্রণাম করে ধান্যক্ষেত্রের ন্যায় পরস্পর শীর্ষে শীর্ষে সম্মিলিত হয়েছ। আমিও এই করভোরুসদৃশ মস্তক দ্বারা তোমাদের দুই জনকে অনুনয় কচ্চি, তোমরা উঠ।

চারু। আচ্ছা, সকলেরই অনুনয় সফল হউক।

বস। (স্বগত) এ সকল আলাপ অত্যন্ত মধুর এবং চাতুর্য্যপূর্ণ। আজ এইরূপে এখানে এসে আমার বাস করা উচিত নয়, আচ্ছা, এইরূপ বলি। (প্রকাশ্যে) আর্য্য! যদি আমি মহাশয়ের এতই অনুগ্রহের পাত্রী, তবে এই অলঙ্কারগুলি আপনার ঘরে গচ্ছিত রাখিতে চাই। অলঙ্কারের জন্য এই দুষ্টেরা আমার পিছু লেগেছে।

চারু। এই গৃহ গচ্ছিতের অযোগ্য।

বস। মহাশয়, মিছে কথা, মানুষের কাছেই গচ্ছিত থাকে, গৃহের কাছে নয়।

চারু। মৈত্রেয়, এই অলঙ্কারগুলি গ্রহণ কর।

বস। অনুগৃহীতা হলেম। (এই বলিয়া অলঙ্কার অর্পণ)।

বিদূ। (গ্রহণপূর্ব্বক) আপনার মঙ্গল হউক।

চারু। ধিক্ মূর্খ! এ যে গচ্ছিত ধন।

বিদূ। (জনান্তিকে) তবে চোরে নিয়ে যাক্।

চারু। অল্পদিনের মধ্যেই——

বিদূ। এই ইহার আমাদের কাছে অর্পণ।

চারু। আবার ফিরিয়ে দিব।

বস। আর্য্য, আমি এই মশায়কে সঙ্গে করে আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছা করি।

চারু। মৈত্রেয়, তুমি ইহার সঙ্গে যাও।

বিদূ। আর্য্য, তুমিই এই কলহংসগামিনীর সঙ্গে গেলে রাজহংসের ন্যায় শোভা পাবে। আমি বামুনমানুষ; কুক্কুরগণ যেমন চতুষ্পথে-প্রদত্ত বলি ভক্ষণ করে, তেম্‌নি আমাকেও কে এসে খেয়ে ফেল্‌বে,—মহাবিপদে পড়্‌ব।

চারু। আচ্ছা, তাই হউক; নিজেই এ মহাশয়ার সঙ্গে যাই। তবে পথ চলার উপযোগী একটা প্রদীপ জ্বাল।

বিদূ। বর্দ্ধমানক, প্রদীপ জ্বালাও।

ভৃত্য। (জনান্তিকে) অরে, তেলবিনা কি প্রদীপ জল্‌বে?

বিদূ। (জনান্তিকে) অয়ে, সম্প্রতি আমাদের এই সব প্রদীপ নির্ধন কামুকের দ্বারা অবমানিতা-গণিকার ন্যায় স্নেহশূন্যা হয়েছে।

চারু। মৈত্রেয়! আচ্ছা, প্রদীপের আবশ্যক কি? দেখ—

সমুদিত শশধর—
কামিনীর গণ্ডসম অতি পাণ্ডুতর,
গ্রহগণে পরিবৃত, রাজপথ প্রকাশিত,
তিমির-নিকরে সিত রশ্মিচয় যার
পড়িতে নির্জ্জল-পঙ্কে যথা দুগ্ধ-ধার।

(সানুরাগে) মহাশয়ে! বসন্তসেনে! এই আপনার ঘর; আপনি গৃহে প্রবেশ করুন।

(বসন্তসেনা সানুরাগে অবলোকনপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্তা)।

চারু। বয়স্য, বসন্তসেনা চলে গেল। তবে এস, আমরাও বাড়ী যাই।

শূন্য এই রাজপথ ধাইছে প্রহরী,
পরিহার্য্য প্রতারণা সদোষা শর্ব্বরী।

(গমনপূর্ব্বক) এই সুবর্ণভাণ্ড রাত্রিতে তুমি আর দিনের বেলায় বর্দ্ধমানক রক্ষা করবে!

বিদূ। যে আজ্ঞে। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]।

"অলঙ্কার ন্যাস" নামক প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণ।

টপ্পা ও নিধু বাবু।

এই প্রবন্ধের শিরোবচন দেখিয়া অনেকে, বিশেষত যাঁহারা চল্লিশ-টুগেলা পার হইয়াছেন, নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন এবং পাতা উল্টাইয়া অগ্রসর হইবেন ও মনে মনে বলিবেন "শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ"। চল্লিশ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চদশকে নাকি মানুষ অসার অন্তসারহীন একেবারে অকর্ম্মণ্য। শাস্ত্রও তাই বলেন—পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ, যে বাপু হে তোমার আর লোকালয়ে থাকিয়া কাজ নাই, তুমি ফলার করিতেও অক্ষম, আদিরস ত দূরের কথা, তুমি পশু সুতরাং তুমি বনে যাও, বসিয়া বসিয়া গৃহিণীর নথ-নত্তন দেখিয়া আর কি হইবে। চল্লিশ বলিবার আরও তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারা বলেন— বল বুদ্ধিও ভরসা
তিন দশকে ফরসা,
আমি তাঁহাদের কথা মানি না। তবে চল্লিষের উপরও যে আক্রমন হয় নাই

এমন নহে। গুজরাৎ খোদ রামপ্রসাদ এখানে সেনাপতিত্ব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "পড়ে চেরের কোটায়, মনকে চুটায়, যে ভজে সে মত্ত গাঁজি। তবেই রামপ্রসাদের মতে চল্লিশের পর আর সাধনাই নাই—থাকুক রসের কথা সাধনা পায় লাজ। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভয়ে ভয়ে চল্লিশ বলিতে হয়, বলিলেও চলে। তাই চল্লিশ বলিয়াছি। তাঁহারা যদি পাতা উল্টাইয়া যান আমরা নাচার কিন্তু আমরা ইহাও জানি অনেক গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান আছেন যাঁহারা সাদরে "অত্র আরজি" পাঠ করিবেন,—তবে কেহ প্রকাশ্যে, কেহ গোপনে, কেহ দেখাইয়া কেহ বা লুকাইয়া। প্রাণের সহিত হামাগুড়ির যে সম্বন্ধ তাহারই বিচার করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে।

এখন এই দাঁড়াইল যে যুবকযুবতীর সহিত টপ্পার যে সম্বন্ধ, লৌহের সহিত চুম্বক প্রস্তরের সেই সম্বন্ধ। ভাল তাহাই হোক। পূর্ণিমার জান্ আধ্যাত্মিক বলিয়া পাঠক বা সমালোচক মহাশয় চটিবেন না। টপ্পার বুঝি আর অধ্যাত্ম নাই? টপ্পার কি সকলই আধিদৈবিক আর আধিভৌতিক? না, তাহা হইতে পারে না, তাহা হইলে শাস্ত্র মিথ্যা হইবে। তবে সবুরে ফলিতে পারে। আবার অনেক পণ্ডিতের মতে জ্যেঠামিটা খাটি (এখন খাঁটি "লেখাই আধ্যাত্মিক) আধ্যাত্মিক। ভৌতিক টা বলিব? "রাম প্রসাদ ও কমলাকান্তের সহিত সাধনসঙ্গীতের যে সম্বন্ধ নিধু বাবু ও বিদ্যাসুন্দরের সহিত টপ্পার সেই সম্বন্ধ" কেমন? তবে আজ ভৌতিক, টপ্পা, উপলক্ষে প্রথমেই নিধু বাবুর জীবনী বলিয়া জীবন সার্থক করিব। পাঠক মহাশয় একটু মেঘদূতের মালিনীর ন্যায় একটু ধৈর্য্য ধরিবেন।

হুগলি জেলার হুগলি সদর হইতে এগার মাইল পশ্চিমে থন্যান নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনের একটি রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। থন্যান হইতে মগরা আড়াই ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দেড় ক্রোশ, ত্রিবেণী সাড়ে তিন ক্রোশ। এই থন্যান হইতে এক ক্রোশ উত্তরে শিখিরা গ্রাম, শিখিরার দক্ষিণে দেড় পোয়া পথ দূরে চাঁপ্তা গ্রাম। চাঁপতা গ্রাম আজিও বৈদ্য-প্রধান স্থান, পূর্ব্বের ত কথাই নাই। এই চাঁপ্তা গ্রামে আনুমানিক ১৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ১১৪৮ সালে (১৭৪২ খৃঃ) নিধু বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত, ইনি কলিকাতায় কুমারটুলিতে বাস করিতেন। নিধু বাবু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার পিতা চাঁপ্তায়

বাস করিতেছিলেন। চাঁপ্তায় তাঁহার মাতুলালয় ছি[illegible] তুণ দিয়া, রামজয় কবিরাজ। তিনি বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে ভীত হইয়া [illegible]লা ভাষার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিধু বাবুর প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত। বা[illegible]ক্তি অতিশয় মেধাবী ছিল। কথিত আছে তিনি এক বৎসরের মধ্যেই পাঠশালার গুরুমহাশয়ের সমস্ত বিদ্যা দখল করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে কলিকাতায় গমন করেন। তিনি একজন পাদরীর নিকট কলিকাতায় ইংরেজী পড়িয়াছিলেন। নিধু বাবু অতিশয় সুশ্রী ও রূপবান পুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে তিনি গান শুনিতে ভাল বাসিতেন এবং যেখানে গান হইত সেইখানে উপস্থিত হইতেন। পলাসীযুদ্ধের পর সেই বৎসরেই (১৭৫৭) তিনি ছাপ্রায় একটি কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। সে সময়ে ছাপ্রায় অনেক বাঙ্গালী চাকরী করিতেন। রামতনু পালিত নামক একজন নিধু বাবুর চাকরী করিয়া দেন। রামতনু কালেক্টরির দেওয়ানজী ছিলেন এবং নিধু বাবুর প্রতিবেশী। জনাই গ্রামের জগমোহন মুখোপাধ্যায়ও এই ছাপ্রা কালেক্টরিতে চাকরী করিতেন। রামতনুর পর, সকলেই জানিতেন, নিধু বাবু দেওয়ানজী হইবেন কিন্তু জগমোহনের কৌশলে তাহা হয় নাই। নিধু বাবুর ব্রাহ্মণ-ভক্তি দেখিয়া কৌশলে জগমোহন ঐ পদ চাহিয়া লয়েন। তাহাতে নিধু বাবু কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হয়েন নাই। তবে জগমোহন অপর প্রকারে নিধু বাবুর উপকার করিয়াছিলেন। ছাপ্রায় অবস্থানকালে জগমোহন একজন মুসলমান ওস্তাদের সঙ্গে নিধু বাবুর পরিচয় করিয়া দেন এবং নিধু বাবু তাঁহার নিকট সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। উত্তরকালে নিধু বাবু যখন বুঝিতে পারেন যে এই মুসলমান-ওস্তাদ ছল করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতরূপ সঙ্গীত-শিক্ষা দেন নাই এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়াছেন তখন একদা তিনি রাগে ও অভিমানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মুসলমানের নিকট আর কখনও সঙ্গীতশিক্ষা করিবেন না। নিধু বাবু অল্পকাল মধ্যে একজন অসাধারণ সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ হইয়া উঠেন এবং এই সময়ে তাঁহার সঙ্গীত রচনায় বিশেষত দ্রুত রচনা তাঁহার বিশেষরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল। তিনি মুখে মুখে বলিবামাত্র, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগরের ন্যায় বলিবামাত্র বা দেখিবামাত্র সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন।

বাইস বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ হয়—শুথচর গ্রামে।
এমন নহে। গু
পুত্রটী রক্ষা পায় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হয়, কলি-
তিনি বলির
যোড়াসাঁকো গ্রামে (১১৭৮)। তৃতীয় পক্ষের বিবাহ হইয়াছিল,
গাঁলি
অধুনা শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন বরিজহাটী গ্রামে (১২০১)। শেষপক্ষের বিবাহের ফল, দুইটি কন্যা ও চারিটী পুত্র। সরকারী চাকরীতে তাঁহার পেন্সন হইয়াছিল। ১২৪৫ সালে নিধু বাবু দেশ অন্ধকার করিয়া স্বর্গলাভ করেন। নিধু বাবু ধ্রুপদী ও খেয়ালী ছিলেন। হিন্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষার গান রচনার তিনিই পথ প্রদর্শক। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় খেয়ালসুরে গান রচিত হইয়াছিল কি না বলা যায় না। তাঁহার গীত রচনায় আর অধিক কি পরিচয় দিব, এক কথায় বলি তাঁহারই রচিত গান "নিধুর টপ্পা" আর তিনিই প্রথমে বৈঠকী গাওনার সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার গানের বিশেষত্ব এই যে হিন্দীগানের পূর্ণ কায়দা তাঁর গানে বর্ত্তমান।

চাঁদে কলঙ্ক আছে, মৃণালে কণ্টক আছে, নিধু বাবুরও চরিত্রে দাগ আছে। মুর্শিদাবাদের মহারাজা মহানন্দ রায়ের রক্ষিতা শ্রীমতী নামে একজন বারনারী ছিল। তিনি নিধু বাবুর রূপ-গুণ বহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। মনে করুন কথাটা অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া এই পাস কথা তুলিতে হইল। তবে নিধু বাবুর উকীল বলিতে পারেন, নিধু বাবুর বিরুদ্ধে রায় দিবার পূর্ব্বে তখনকার সমাজের কথাটা একবার ভাবিতে হয়। যৌবনে পত্নী বিয়োগ অবস্থায় তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে, একথা বলিলেও এখনকার দৃষ্টিতে তাঁহার সাফাই নাই কেন না সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুতে তিনিই গাহিয়াছিলেন—

খাম্বাজ। মধ্যমান।

এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না॥
ভেবে ছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না॥

খট্ ভৈরবী। আড়াঠেকা।

না হতে পতন তনু দাহন হইল আগে।
আমার এ অনুতাপ তাহারে ত নাহি লাগে॥
চিতে চিত সাজাইয়া, তাহে দুঃখ তৃণ দিয়া,
আপনি হইত দগ্ধ আপনারি অনুতাপে॥

শুনিয়াছি হিন্দীগানে ভাষার গুণে যেরূপ লয় বজায় থাকে বাঙ্গালা ভাষার দোষে সেরূপ লয় বজায় থাকে না, ইহাই নিয়ম কিন্তু কেবল নাকি, আবার বলি, নিধু বাবুর রচিত্ গুণে এ নিয়ম খাটে না, ইহার ব্যতিক্রম হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি নিধু বাবু ১৭৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেব রাম প্রসাদ ১৭২৩ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তবেই রাম প্রসাদ নিধু বাবু অপেক্ষা উনিশ বছরের বড়। উভয়ে সমসাময়িক কবি। রাম প্রসাদ সত্তর বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, নিধু বাবু মৃত্যুকাল নব্বুই বৎসরের উপর পরমায়ু হইয়াছিল। পাঠক মহাশয় উভয়ের কবিত্ব তুলনা করিবেন। সিন্ধু ও গঙ্গা একই হিমালয় হইতে বাহির হইয়াছেন কিন্তু দুইটি বিভিন্ন সাগরে গিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। বিভিন্ন সাগর হইলেও—সাগর। ইংরেজ আগমনে দেশের একটা কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ভাবের উৎস আপনি ছুটিয়াছিল। এমনই হইয়া থাকে, যুগে যুগে এমনই হইয়াছে। এলিজাবেথের সময়, ফরাশি-বিপ্লবে, লুথরের ধর্ম্মবিপ্লবে এমনি করিয়া ভাবের উৎস ছুটিয়াছিল।

নিধুর টপ্পা পঙ্কিল হইলে এ প্রবন্ধের অবতারণা হইত না। দেখাইতে চেষ্টা করিব, পঙ্কে পদ্ম ফুটে, পঙ্ক হইতেই পঙ্কজ। টপ্পায় আদিরসের প্রাধান্য আদিরসই টপ্পার জান্। কিন্তু এক্ষণে সভ্যতা ও সুরুচির দিনে আদিরসের নাম হইয়াছে, অশ্লীলতা। আজিকার দিনের কথা স্বতন্ত্র। এখন বাটীর গাভীর প্রসবের সময় অশ্লীলতার ভয়ে মশারি খাটাইয়া দিতে হয়। অশ্লীলতার ভয়ে গর্ভবতী ভগিনী কাছে আসেন না কিন্তু আমাদের আদর্শ-পুরুষ ইংরেজ অশ্লীলতা বলিয়া সেক্সপীর বা বরন্সকে পরিত্যাগ করেন নাই, সুর বায়রণের নাম আজিও ধরাধাম হইতে লোপ হয় নাই। অশ্লীলতা বলিয়া আদিরস পরিত্যাগ করুন, বিদ্যাসুন্দর, দাশরথী রায়, ভারতচন্দ্র ও নিধু বাবুকে বঙ্গোপসাগরের "অতলস্পর্শে" ডুবাইয়া দিন, গর্ভাধান উঠাইয়া দিন তাহাতে দুঃখ নাই—দুঃখ করিয়াই বা কি করিব—কিন্তু একবার মনে রাখিবেন যে হিন্দুর সাধনায় আদিরসের প্রাধান্য, আদিরস ছাড়া হিন্দুর ভগবান ভগবতী নাই। যদি আপনি বৈষ্ণব হন, না হয় বৈষ্ণব বংশীয় বলি, তবে ব্রজধামের ষোড়শ সহস্র গোপিনী ও রাধার অভিসার মহারাস ত্যাগ করিবার যো নাই,

দ্বারকার ষোল শত অষ্ট রমণীও ত্যাগ করিবার যো নাই। আর যদি শাক্ত হন তাহা হইলেও শ্যামা মা আমার উলাঙ্গিনী দিগ্বসনা, বাবা ভোলানাথ আমার উলঙ্গ দিগম্বর। সেকালের শ্যামা প্রতিমা যিনি দেখিয়াছেন, আর এ কালের শ্যামা প্রতিমা যিনি দেখিতেছেন, তিনি বলেন, এখন আর ধ্যানানুসারে প্রতিমার গঠন হয় না। আর ভাই শ্লীল শাক্ত তুমি ছিন্নমস্তার প্রতিমা লইয়া কি করিবে, আমি ত ভাবিয়া আকুল। হিন্দুর রথে, হিন্দুর দেবমন্দিরে বিশেষত জগন্নাথদেবের মন্দিরে তুমি নাকি ভাই পাঠক অনেক অশ্লীল মূর্ত্তি দেখিয়া অবজ্ঞার তাড়নে আত্মহারা হইয়াছ এবং দেবমন্দিরে এরূপ কুৎসিৎ ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হও নাই। কখনও ভাবিয়াছ কি কেন সেকালে দিনব্যাপী নৃত্যগীতের অবসানে শেষের দিন খেঁউড় হইত? এখনও কেন অনেক বারোয়াড়িতলায় শেষের দিন পাঁচালীর পরে খেঁউড় গাওনা হয়? এখনও ঘরে ঘরে পুষ্পোৎসবে আরম্ভ আঁতুড়ের দ্বারে হিজ্‌ড়ারগানে শেষ কোন ঘটনা হয় কি? এত আদিরসের ছড়াছড়ি কেন? এই সমস্ত কথার একই উত্তর। গূঢ় সাধনা রহস্য সমাজ-জীবনে গৃহস্থ-জীবনে মিশাইয়া রাখা হইয়াছে। আমরা মর্ম্ম জানি না, কখনও জানিতে চেষ্টা করি নাই, অথচ ইংরেজী পড়িয়া বিকৃত কিম্ভূত কিমাকার জীব হইয়াছি তাই এ সকল আমাদের চক্ষুশূল হইয়াছে। ভগবান যদি ষড়ৈশ্বর্য্যের আধার তবে নবরস কোথায় যাইবে? ভগবান কেবল করুণরসের ভগবান না অপর সমস্ত রসের আধারও বটেন। ভগবান যদি সমস্ত রসের আধার তবে বীভৎস ও আদিরসকে কোথায় রাখিয়া আসিব। আমাদের সমাজের অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় শৃঙ্খলা পদ্ধতিক্রমে সমস্ত রস গুলি দিনে দিনে জনে জনের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া ভোগ হইত, হৃদয়ে ছাপ পড়িত, তখন কোন দিন না কোন দিন কেহ কোনক্রমে তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিতেন। সাধনার মর্ম্ম খুলিয়া যাইত, সাধক প্রকৃত রহস্য জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া সমাজকে ধর্ম্মকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন এবং সাধনার পথে ভগবানের দিকে শনৈ শনৈ অগ্রসর হইয়া ধন্য হইতেন।

ইংরেজ ও ইংরেজীর কল্যাণে ও তাহাদের অন্ধ অনুকরণে আমাদের যে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহার একটি উদাহরণ দিব। হিন্দুর সাধনায় শ্মশানের প্রয়োজন আছে। সম্প্রদায় বিশেষের আবার বিশেষ প্রয়োজন।

শ্মশানের শ্মশানত্ব কোথায়? সকলেই একবাক্যে বলিবেন বীভৎসরসে। কিন্তু এখন কি আর শ্মশানে কিছু আছে, এখন শ্মশানও যা বৈঠকখানা বা শস্য-ক্ষেত্রও তা। তখন শ্মশানে দেখিতেন, মুদ্দারফরাশের মাদুরের ঘর, ছিন্ন কন্থা, ছিন্ন লেপ, কর্দ্দমময় বা বিষ্ঠাময় মাদুর শত শত মৃৎকলসী, শত শত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ বা বংশ খণ্ড, শত শত মাংসহীন নৃমুণ্ড দন্ত বাহির করিয়া যেন তোমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। সন্ধ্যা-বায়ু মৃৎকলসীবিবরে সজোরে প্রবেশ করায় হো হো শব্দ হইতেছে, যেন প্রেত ও ভূতগণ হাস্য করিতেছে। অর্দ্ধ-দগ্ধ মাংস খণ্ড লইয়া কুকুরে শৃগালে ঝগড়া, শকুণি গৃধিণীর বিচিত্র স্বরভঙ্গী-সহকারে বিবাদকালীন সবেগ পক্ষ-সঞ্চালন, কোথায় বা রাশি রাশি স্ত্রী-লোকের কেশ পড়িয়াছে, কোথায় বা জলমগ্ন পর্য্যুসিত অর্দ্ধভক্ষিত পূতিগন্ধ-ময় আর তাহে এক দল নিশ্চেষ্ট শকুনি বসিয়া গম্ভীরভাবে সমালোচন করিতেছে। কোথাও একটা ব্যাঘ্র সদৃশ কুক্কুর অঙ্গুলি শুদ্ধ গোটা হস্ত রক্তমাখা মুখে লইয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে করিতে ছুটিতেছে। কোথাও চুল্লীর উপর রোগে জর্জ্জরিত বিকৃত দৃশ্য শব দেহ রক্ষা করিয়া কাষ্ঠাচ্ছাদন করা হইতেছে। কোথাও কেহ বা বংশখণ্ড প্রহারে প্রজ্জ্বলিত চিতায় শবের মস্তক ভাঙ্গিয়া দিতেছে আর ভুবড়ীস্ফুলিঙ্গের ন্যায় রাশি রাশি অগ্নিকণা আকাশে উঠিয়া শ্মশানের অন্ধকারকে গাঢ়তরে দ্বিগুণ তমোময় করিতেছে। এ সব কি আর আছে? এক কথায় শ্মশানে এখন মিউনিসিপালিটী। যে এ দৃশ্য একবার দেখিত সে কি কখনও তাহা ভুলিতে পারিত? না, প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় তার হৃদয়ে সেই দৃশ্য চিরকালের মত খোদিত হইয়া থাকিত? এরূপ একটা মনের ছাপের সংসারে সমাজে সাধনায় প্রয়োজন আছে।

তাই বলিতেছিলাম সকল রসেরই ব্যবহার আছে। আদি রসেরও ব্যবহার আছে। তবে সাধনায় আদিরসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা। সে গূঢ় কথা প্রকাশের এই স্থান নহে বলিয়া কেবল মাত্র কথাটা বলিলাম। আদিরসের উপযোগিতা একবার স্বীকার করিলে আর নিধু বাবুর গানকে বা বিদ্যাসুন্দরের গানকে উপেক্ষা করা যায় না। কবিওয়ালাদের বিরহ শুনিয়াও আর কাণে আঙ্গুল দিতে হয় না।

একজন ভাবুকের মুখে একদা একটা কথা শুনিয়াছিলাম। কথাই বলুন আর গল্পই বলুন কথাটার কিন্তু দাম আছে। কথাটা মিথ্যা হইলেও দাম

আছে। ছাতু বাবু লাটু বাবু কলিকাতায় দুই জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। সে কালের লোকের ন্যায় ইঁহারা গুণগ্রাহী ও রসজ্ঞ ছিলেন। গোপাল নামে একজন উৎকলবাসী বাবুদের খানসামা ছিল। গোপাল একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিল। বাবুদের আশীর্ব্বাদক একজন শক্তি উপাসক ভক্ত বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাবুদের জন্য বিদ্যাসুন্দরের কথা যাত্রারভাবে রচনা করি[illegible] বাবুদিগকে উপহার দেন। বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমার গান দ্ব্যর্থ[illegible] দ্ব্যর্থবাচক, এক পক্ষে সোজাসুজি সুন্দর মালিনী বিদ্যা আর অপর পক্ষে সাধক গুরু আর মহাবিদ্যা।" গোপালের পেন্সনের সময় হইলে বাবুরা তাহাকে ঐ গানের খাতাখানি দান করিয়া বলেন "গোপাল তোমাকে [illegible] অপূর্ব্ব সামগ্রী দিলাম ইহকালে জমীদারী পরকালের তরণী"।

এখন গল্পটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও যে তাৎপর্য্যটা আমরা পাইতেছি তাহাই আমাদের পরম লাভ। কবি হাফেজ, পারস্যের লোক যাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানেন, বলিয়াছেন যে প্রাচীরের গাত্রে যদি উপদেশ পাও তাহাও গ্রহণ করিতে পার—কর—মঙ্গল হইবে। এখন একজন সাধক ভক্ত ব্রাহ্মণ এরূপ কুৎসিৎ (সুরুচির দল যাহা বলে) গান রচনা করিয়া কেন এবং তাহা দুইবার দুই রকম রসে বুড়াইলেন কেন—একথা বোধ হয় কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু করিলেও আমার জবাব আছে। প্রকৃত সাধক যিনি, তিনি জ্ঞান ভক্তি ও যোগ তিনটি তত্ত্বেরই অনুশীলন করেন। শুষ্ক থিওরী লইয়া ইঁহারা থাকেন না, ইঁহারা প্রাকটিকাল [illegible] ভোগ করেন, তাহাই উচ্চ অঙ্গের সাধনা। এইরূপ ব্যাপার সকল [illegible] আছে কি না সে বিচারের স্থল ইহা নহে। তবে হিন্দুয়ানীর মধ্যে [illegible] সম্প্রদায়ই এরূপ রস ভোগ করিয়া থাকেন তাহা জানি। এই বৈষ্ণবে[illegible] দেখুন। যোগে জ্ঞানে বুঝিলাম মহারাস কি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলায় সেটা কিরূপ ব্যাপার। তুমি আমি হয়ত এইখানে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া, স্ফূর্ত্তির হাসি হাসিয়া তত্ত্বটা বুঝিয়াছি বলিয়া ছাড়িয়া দিব, গোপীর ঈশ্বর প্রাপ্তি ভগবানের কামজয়, আর কি? কিন্তু ভক্ত সাধক এরূপে তত্ত্ব ছাড়েন না, ইক্ষুদণ্ডে রস আছে বুঝিয়া ইক্ষুদণ্ড ফেলিয়া দেন না। তিনি ইক্ষুদণ্ড চিবাইতে থাকেন আর অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করেন। আবার কেহ কেহ এমন উচ্চ প্রাণের লোক আছেন যে তিনি পরের জন্য রস নিঙড়াইয়া

দেন, দন্তহীন ব্যক্তির জন্য, মূর্খের জন্য গাণ্ডীগাছ করেন তাহাতে রস গাড়িয়া গহ্বর পূর্ণ করিয়া বসিয়া থাকেন। যে আসে তাহাকে ইক্ষু দেখান, গণ্ডীগাছ দেখান, কলসে করিয়া মাড়া-রস তুলিয়া দেন, বলেন খাওগে। দন্তহীন আগন্তুক খাইলে তাঁহার সুখ হয়, একটা প্রগাঢ় সুখ ভোগ হয়, আনন্দ হয়। তাই মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ যথেষ্ট বলিয়া বৈষ্ণব কবিগণ চুপ করিয়া থাকেন নাই, তাই জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোপী-প্রেমের চিরস্থায়ী গণ্ডীগাছ বসাইয়াছেন। তাই কেন্দুবিল্ব গ্রামের নিভৃত কোণে বসিয়াও জয়দেব বৃন্দাবনলীলার আগাগোড়া রসটা আস্বাদন করিয়াছেন, আর প্রিয়ে চারুশীলেকে বলিতে পারিয়াছেন—স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্। তাই তিনি পদ্মাবতী রমেন। আর আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিম বাবুর মতে মহারাসটা আদর্শ মানুষের সঙ্গে কেবল গোপীর সাঁওতালী নাচ। আবার এদিকে দেখুন মহারাসে যে রস স্ফুরিত হইয়াছে তান্ত্রিকী সাধনায় জগৎ পিতা ও জগৎ মাতা আগমনিগমে, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধক ভক্তগণ আবার সেই রস আস্বাদন করিয়াছেন। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও দেব রামপ্রসাদ ইঁহারাও বৈষ্ণবকবিগণের মত হাতেকলমে সেই রস ভোগ করিয়াছেন। তাহারই দৃষ্টান্ত বিদ্যাসুন্দর। পাঠক মহাশয় যদি নাটকের অঙ্ক বা গর্ভাঙ্কবিশেষে আপনার মনঃসংযোগ করিয়া রাখেন আর সব কথা ভুলিয়া যান তাহা হইলে তাহা আপনার দোষ, গ্রন্থকারের দোষ নহে। আমরা বিদ্যাসুন্দরের আসল তত্ত্বটা ভুলিয়া গিয়াছি। অনুমান করি কথাটার উল্লেখ এখন অসাময়িক হইবে না। মালাধর হারাবতী শিবশিবার সহচর সহচরী, চামর ঢুলাইতেন। শাপগ্রস্ত হইয়া সুন্দর ও বিদ্যারূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। ভাটমুখে কাঞ্চীপুরে সুন্দর যখন বিদ্যার কথা শুনিলেন তখন দৈববাণী শুনিয়াছিলেন। বিদ্যাও দৈববাণী শুনিয়া জানিয়াছিলেন যে সুন্দরই তাঁহার পতি। ইঁহাদের উভয়ের মিলন জগদম্বার সাহায্যেই হইয়াছিল। সুড়ঙ্গ খনন, সেও দৈববলে, শেষে মশানে জগদম্বার আবির্ভাবে সকল কথা খুলিয়া গেল—জগদম্বার লীলা-কথা প্রকাশ হইয়া গেল। যথাকালে সিদ্ধত্ব লাভ করিয়া উভয়ে দেহত্যাগের পর কৈলাসে গমন করেন। এ সমস্ত ভুলিয়া কেবল বিপরীত বিহারটি মনে করিয়া রাখিলে চলিবে না। এই গল্পটি মনে করিলেই

বেশ বুঝিতে পারি, সাধকপ্রবর দেব রামপ্রসাদ কেন বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও তাঁহার লক্ষ সঙ্গীতের (লাখ উকীল) সহিত তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের কি সংশ্রব, কি মিল। বৈষ্ণবকবিগণ যেমন রস ভোগ করিয়াছিলেন, মুকুন্দরাম হইতে আরম্ভ করিয়া শাক্তকবিগণ সেইরূপ থিওরীর উপর রস ভোগ করিয়াছিলেন; রস আস্বাদন করিয়া অভূতপূর্ব্ব গাঢ় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া ভগবানের মহিমা প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ইঁহারা জানিতেন শ্যামা শুধু মেয়ে নয়, সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়। ভরসা হয় পাঠক মহাশয় এতক্ষণে ব্রাহ্মণ কি জন্য বিদ্যাসুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সদুত্তর পাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও দেব রামপ্রসাদ উভয়েই চোর সুন্দরের মুখ দিয়া বীরসিংহের রাজসভায় কতকগুলি শ্লোক বলাইয়াছেন, সে গুলি একদিকে বিদ্যাপক্ষে অপরদিকে কালীপক্ষে—মহাবিদ্যাপক্ষে। কেমন, সাধকের রসাস্বাদনটা কি খুব গাঢ় রকমের হয় নাই? ব্রাহ্মণ এই কথাটা মনে রাখিয়া কি ঐরূপ অভিপ্রায়ে রস আস্বাদনের জন্য দুই অর্থে গান রচনা করিতে পারেন না? তাহা যদি হয় তাহা হইলে বিদ্যাসুন্দরের ব্যাপারের আর গানের কুৎসিতত্ব কাটিয়া গেল। এখন পাঠক মহাশয় মালিনী মাসিকে একবার গুরু মনে করিয়া (গুরু ত বটেনই) গান মিলাইবার যত্ন করিবেন কি? কিন্তু সত্য বলিতেছি, আমি তাহা করি নাই।

বিদ্যাসুন্দরের, তর্কের অনুরোধে, ভাল যেন পঙ্কোদ্ধার হইল কিন্তু তাহা বলিয়া নিধু বাবুর সাফাই কই? আমরা বলি সাফাই আছে, নিধু বাবুর গান দেখিয়া বেশ বোধ হয় যে সাধনার গূঢ় রহস্য তিনি জানিতেন। এই বিষয়ের প্রকাশ্য বিচার নাকি হওয়া অসম্ভব, তাই কথাটা অতি স্থূলভাবে বলিব, অনেক কথা কেবল ইঙ্গিতের উপরেই থাকিবে। নিধু বাবুর সঙ্গীত রচনার জন্য একজন ideal ছিল, কার্য্যে ও কর্ত্তব্যে একটা যথার্থ আদর্শ ছিল, এটা মনে করিলেই অনেক গোলের কথা চুকিয়া যায়। জগতে ইলাইষা অবিলর্ড অনেক হইয়াছে। পরকীয়া রসের অর্থ লোকে ভিন্নভাবে বুঝিয়া থাকে, এটাও মনে রাখিতে হইবে। প্রথমের বৈধ অবৈধ তর্কটা ছাড়িয়া দিয়া এটাও মনে করা যাইতে পারে যে উভয়ই প্রেম-ধর্ম্মে পবিত্র; তায় উন্নীত হইতে পারে। আর যদি ইহাও মনে করা যায় যে তাঁহার

নিজের কোন আদর্শ ছিল না কেবল কতকগুলি আদিরসের খণ্ড গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও কোন দোষ হয় না। রচনাকালে ত একজন যুবক ও একজন যুবতীর ভালবাসা ভাবিতে হইয়াছে—না হয় থিওরিতেই রহিয়া গিয়াছে, এখন তাহা অনেকে প্রাক্‌টিকাল করিয়া রস আস্বাদন করিতেছেন। আদিরসের গান রচনা করিলেই বা কোকিল ভ্রমর আহা উহুঃ প্রিয়ে বসন্ত মলয় পবন এই সকল শব্দ ব্যবহার করিলেই লোক পামর হয় না। ভাব লইয়া কথা, ভাবের চক্ষে দেখিতে হইবে। ভগবান সকল ভাবের সকল রসের আধার। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুর ধর্ম্মে সাধনার হাড়ে হাড়ে আদিরস প্রবেশ করিয়াছে। রাস প্রভৃতির উদাহরণ দিয়াছি, এখন কেবল শাক্তের কালীপ্রতিমার আর শিবলিঙ্গের কথাটা তুলিব। যে শিবলিঙ্গ আমরা পূজা করিয়া থাকি, সমগ্র বঙ্গের, আর ভারতের হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের, সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব সময়ে মন্দিরে মন্দিরে আমরা যে শিবলিঙ্গ দেখিতে পাই তাহা, মনে রাখিবেন, গৌরীপট্টের উপর শিবলিঙ্গ। ইহার অধিক আর আমি খুলিতে পারি না। নিধু বাবু যে সাধক ছিলেন তাহা পরে দেখাইব কিন্তু চণ্ডীদাসও সাধক ছিলেন, সিদ্ধসাধক ছিলেন আর আজিও আমাদের চণ্ডীদাস ও রজকিনীর গান শুনিতে হয়। কোরাণ দেখুন, বাইবেল দেখুন, জেন্দাবেস্তা দেখুন, সেখানেও আদিরস। আদিরসই যে আদি রস, আদি রসেই যে সৃষ্টি। আদিরস গেলে কি আর জগতের সাহিত্য থাকে, না সঙ্গীত থাকে?

এই যে শ্রীমতী নাম্নী বারনারীর কথা বলিয়াছি—আমি বলিতে চাহি না যে তিনি একজন রম্ভা, তিলোত্তমা বা উর্ব্বশী বা অপর কোন স্বর্গবেশ্যা। তাঁহার প্রতি নিধু বাবুর উক্তি শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কি ছিলেন, নিধু বাবু কি ছিলেন বা উঁহাদের উভয়ের মধ্যে কি ছিল। এক সময়ে কেন ইহার উত্তরে নিধু বাবু গাহিয়াছিলেন—

সিন্ধু ভৈরবী। মধ্যমান।

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমাবই আর জানিনে॥
শ্রীমুখে মধুর হাসি, দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই দেখবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

শ্রীমতীর কথাটা ভুলিয়া যাউন। কেবল মাত্র গানটা দেখুন – হৃদয়ের অন্তস্থলস্পর্শী ভাবটা দেখুন। এ গান একটি সত্য, ইহা মিথ্যা হয় না, যে না নিজে ভোগ করে সে এমন গান রচনা করিতে পারে না। আপনার যদি না জানা থাকিত যে ওটা নিধু বাবুর গান আর আমি যদি বলিতাম যে ওটা কমলাকান্তের গান, শ্রীমতী রাধার উক্তি, তাহা হইলে কিছু তফাৎ হইত কি? শ্রীমতী "রজকিনী" ছিল কি না জানি না কিন্তু নিধুর গানে কথাটা একটু খুলিয়া আসিয়াছে—

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে বলে "অবলা" তোমায় মহাবল ধর প্রিয়ে।
ধরাধর ধর হৃদে চেকেছ বসন দিয়ে॥
স্মরহর শর সম, কটাক্ষ তব বিষম,
নিরূপমা নির্গুণ নর বধ নারী হয়ে॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেমসিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ।
রসিকে পার হতে পারে অরসিকের আতঙ্গ।
চাতুরী তরী একে তাহে কর্ণধার অনঙ্গ
বিচ্ছেদ প্রবল বায়ু কখন করে কি রঙ্গ।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

কেন ভাল বেসে ছিলাম তারে।
দেখিতে বাসনা হলে ভাসি অকুল পাথারে॥
যৌবন তরী আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
কেমনে হইব পার, পড়েছি বিষম ফেরে।
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি স্থির ভাবে থাকি,
তখনি তাহারে দেখি উদয় হৃদি মাঝারে॥

এই সকল গান দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তিনি একজন উচ্চদরের ভাবুক ও কবি ছিলেন, আদিরস জানিতেন ও সাধনা কি বুঝিতেন, স্ত্রী কি বুঝিতেন, পুরুষ কি বুঝিতেন এবং স্ত্রীপুরুষের উভয়ের মধ্যে কি শাস্ত্রানুগত সম্বন্ধ তাহা বুঝিতেন। উদাহরণ দি—

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পুরুষ পরম নিধি রমণী মনোরঞ্জন,
নারী বিনা কেবা তার মূল্য করে নিরূপণ।
পাইয়া পুরুষমণি, আপনারে ধন্য গণি,
সুখে বঞ্চয়ে রজনী, জানে কি পরের মন।
ইচ্ছা হয় হৃদয়াসনে, বসাইয়া পতিধনে,
দেবতা ভাবিয়া মনে, নিত্য করি আরাধন।
প্রণয় তুলসী তুলে, প্রফুল্ল যৌবনফুলে,
মানসচন্দন গুলে, শ্রীপদে করি অর্পণ॥

পিলু – পোস্তা।

মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না॥
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর, অন্য বারি চায় না॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারই উপমা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্কছলে॥
সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমি সাধ করে কি ধরি তারই পায়
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায়।
সে যে জগদ্‌গুরু কল্পতরু
মন দিতে হয় যে তারই পায়।
সে যে সাধনেরই ধন, অমূল্য রতন
তারে সাধন বিনা কে বা পায়।
সে যে অধম তারিণী, দুঃখ নিস্তারিণী
তারে প্রেম বিনা বাঁধা দায়॥

এই আদিরসের একটা শাস্ত্রীয় সামঞ্জস্য আছে –

সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা।
চনকাকার-বিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥
অনাদি পুরুষোদ্যুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।
জ্বলদগ্নে যথা দেবি স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ ॥

"সত্যলোকরূপ নিত্যধামে মহাকালী মহারুদ্রের সহিত পরস্পর আলিঙ্গনে একাঙ্গভাবে অবস্থিতা, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির সমষ্টি—জ্যোতির্ম্ময়ী সেই অনাদি-পুরুষারূঢ়া অনাদ্যাশক্তি চণকাকার বিস্তরা, অর্থাৎ চণকের দ্বিদল যেমন পরস্পর সংবদ্ধ, তদ্রূপ পরস্পর সংশ্লিষ্টা এবং চণক যেমন বহিরাবরণ বল্কল দ্বারা আবৃতা, তিনিও তদ্রূপ নিজ আবরণ মায়া দ্বারা আবৃতা, চণকের কোমল উজ্জ্বল দ্বিদল অপেক্ষা বল্কল যেমন কঠিন এবং মলিন, পরমানন্দ-তরল জ্যোতির্ম্ময় শিবশক্তি অপেক্ষা ত্রিগুণ-বিষমা মায়াও তদ্রূপ মলিনা ও কঠিনা, দ্বিদল এবং বল্কল এই উভয়ের সমষ্টিগত নাম যেমন চণক, তদ্রূপ শিবশক্তি এবং মায়া এই উভয়ের সমষ্টিগত নাম ব্রহ্ম। স্থূলদর্শীর চক্ষুতে বল্কের বহির্ভাগ হইতে দেখিতে চণককে এক বলিয়া বোধ হইলেও যিনি বল্কল ভেদ করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার চক্ষুতে যেমন এক চণকের মধ্যেই দুইটি দল পরস্পর অভিন্নভাবে মিলিত এবং মুখে মুখে সংবদ্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মায়ার অন্তরালে থাকিয়া যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয় করেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম এক হইলেও মায়ার ভেদজ্ঞ সাধনসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষুতে তাঁহার শিবশক্তিরূপ পরম প্রেমময় উভয় স্বরূপই প্রতিভাত হয়। জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ সকল স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ সেই জ্যোতির্ম্ময়ীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারই অংশরূপ জীব সকল ধাবিত হইতেছে।

ঈশ্বর মুর্ত্তিতেই হোক আর জীব মূর্ত্তিতেই হোক স্ত্রীপুরুষের পরস্পর বিভিন্ন দেহ কেবল দ্বৈত লীলার অভিনয় যন্ত্র, যন্ত্রগত ভেদ ভিন্ন যন্ত্রীগত ভেদ কাহারও নাই—উভয় যন্ত্রেরই যন্ত্রী একমাত্র আত্মা বা শক্তি।

শ্রীআনন্দময় শর্ম্মা।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

বামাবোধিনী, অন্তঃপুরের পরেই বামাবোধিনীর উল্লেখ করিতে হয়। ...বণে পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা হইয়াছে। তবে "নীরদবরণী"র মত প্রবন্ধ কেন, ...ঝিলাম না। অসংলগ্ন।

হিন্দু-পত্রিকা, শ্রাবণ। পূর্ব্ববৎ। পঞ্চদশী ভাল।

ভারতী, কার্ত্তিক। ধ্যানযুতা (পদ্য), বিষবৃক্ষের ফল, গুজরাটী শিল্প ও ...ল্পী, উপনিবেশিকের জীবন-সংগ্রাম, পসারিণী (পদ্য), মনস্তত্ত্বজ্ঞানের নূতন প্রণালী, বঙ্কিম বাবুর কাজীর বিচার, নয়নতারা (সমালোচন), যদি (পদ্য), ...ায়ত্ত সুখ, মমতা (পদ্য) বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকটি শব্দ। "ধ্যানযুতা" ভাল। "বিষবৃক্ষের ফল" সেই বিষবৃক্ষেরই গল্প—দেবেন্দ্রের বৈষ্ণবীসাজে গৃহস্থের বাড়ী যাওয়া—একটু বার্ণিস করা। শেষ রক্ষা হয় নাই বলিয়া আমাদের দুঃখ।—গুজরাটী শিল্পের কথা শুনিয়া বাঙ্গালির কিছু উপকার হইবে কি? ... "উপনিবেশিকের জীবন সংগ্রাম" বুঝিতে পারিলাম না। তাত মনে হয় না। ...ভাবের দারিদ্র্যে ভাষারছটা বড় বিড়ম্বনা।—মনস্তত্ত্বজ্ঞানের নূতন প্রণালী হিন্দুর কাছে, বিশেষত হিন্দুযোগীর নিকট নূতন নহে। বঙ্কিম বাবুর কাজীর বিচার, বেশ। গল্পটি এই। একজন পথিক ব্রাহ্মণ ছেলের ব্যারাম শুনিয়া কলিকাতা যাইবার সময় বারাসতে একজনের বাড়ীতে অতিথি হন। তখন বারাসতে রেল হয় নাই। রাত্রে বাড়ীতে চোর ঢুকে, তিনি দেখি... পাইয়া চীৎকার করেন; এমন সময় চোর গহনার বাক্স হাতে পল... থাকে। যখন ব্রাহ্মণ চোরকে ধরিলেন চোরও তখন বাক্স ফেলিয়া ... ধরিয়া চোর চোর বলিয়া চেঁচাইতে থাকে। লোকে আলো আ... অবাক কাণ্ড, একজন পোষাক পরা কনিষ্টবল ব্রাহ্মণকে ধরে বল... ব্রাহ্মণ বলচে এ চোর। এই মোকদ্দমার বঙ্কিম বাবুর নিষ্প... বঙ্কিম বাবু রায় প্রকাশে অনেক বিলম্ব করেন। শেষে যে দি... দিন তাহার পূর্ব্ব রাত্রে অনেক ভাবনাচিন্তার পর ... থিয়েটরের একজন লোক) ডাকিয়া কি বলিয়া দি... প্রকাশ হইবে। লোকে লোকারণ্য। এমন সময় এক... বলিল "সর্ব্বনাশ হুজুর ব্রজ বাবুকে কে খুন করে...

সাঁকোর নীচে পড়ে আছে”। শুনিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন পুলিষ তদন্ত করুক। একটু পরে বলিলেন না আমি একবার লাসটা দেখিব—[illegible] জান। তখন কথা উঠিল ডোম নাই কে আনিবে, ডোম যোগাড় করিতে একদিন কাটিয়া যাইবে। বঙ্কিম বাবু বলিলেন এই চোর দুইটা আনুক তাই হউল। পেয়াদা চোরের মাথায় লাস তুলিয়া দিয়া চাদর চাপা দিয়া দরকার আছে বলিয়া আগে আগে চলিয়া গেল। তখন শব [illegible] করিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন তোকে ধরে আমি কি কুকাজই করেছি। মুসলমান কনিষ্টবল বলিল “এখনও বাকি আছে। শ্রীঘরে যেতে হবে। আমার বড় বড় উকীল, অনেক ভাল ভাল সাক্ষী আর [illegible] বামুন কেউ নেই।” এদিকে লাস আসিয়া আদালতে উপস্থিত। বঙ্কিম বাবু লাস দেখিবার যোগাড় করিতেছেন এমন সময় লাস উঠিয়া বসিল। দানো পেয়েছে বলে লোক ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। ব্রজ সাক্ষীর স্থানে গিয়া হলপ লইয়া বলিল হুজুর ব্রাহ্মণ নির্দ্দোষী, কনিষ্টবল চোর। [illegible] কথা আমি শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণ খালাস হইল, কনিষ্টবলের তিন বৎসর [illegible] জেল। ধন্য বঙ্কিম বাবুর বুদ্ধি!—নয়নতারার সমালোচনটা বুঝিলাম না। “স্বায়ত্ত সুখ” ভাল।

হিন্দু-পত্রিকা, ভাদ্র ও আশ্বিন, একত্রে। কার্ত্তিক সংখ্যা, [illegible]। অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। পূর্ব্বমত চলিতেছে। “ঈশ্বর-মানা”টা কেন?

বীরভূমি, পৌষ। প্রথম প্রবন্ধ “তুমি ও আমি” শরতের মেঘ, তাহাতে [illegible] বীরভূমির ইতিবৃত্ত ভাল। বীরভূমি নাম কেন হইল এই কথার [illegible]া আছে। সম্পাদক টীকায় বলিতেছেন “পূর্ব্বে বীরভূমে বীরাচার [illegible]নুষ্ঠান সমধিক প্রচলিত ছিল। তারাপুর, নলহাটী, লাভপুর [illegible] স্থান তাহার প্রমাণ। অনেকের মতে বীরাচারের স্থান বলিয়া [illegible] হইয়াছে।” কথাটা টীকায় কেন? ইহাই প্রকৃত কথা। [illegible] ও নানা কথায় দেখিলাম “আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় শীঘ্র অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্থানে [illegible] [illegible]ছেন।” মাসিক পত্রিকায় এরূপ সংবাদ দেওয়া উচিত [illegible] [illegible] সাময়িক পত্রে প্রভেদ রাখিতে হইবে। হুতুম অনেক [illegible] [illegible] বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বলিয়াছিলেন। আরও

প্রকৃতি পুরুষের কথা। “ইহা সুরলোক বিহারিণী কলস্বনা মন্দাকিনী নয়—গভীর-তরঙ্গ-গর্জ্জন-সমাকুল ভীষণ মহাজলধি।” আর শেষ “সাঁকুলি যাইবার পথটি পাকা না করিলে লোকের কষ্টের একশেষ হইবে।”

বিশ্বজীবন, জীবনবৃত্ত-বিষয়ক ধারাবাহিক পত্র, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। “রামমোহন রায়” চলিতেছে। গানগুলি আছে ও অনেক সংবাদ আছে। (১) রামমোহন রায় একাকী একটি ছাগমাংস (?) ভোজন করিতে পারিতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে দ্বাদশ সের দুগ্ধ পান করিয়া হজম করিতেন। তিনি একদিন পঞ্চাশটি আম্র এবং প্রায় এক কাঁদি নারিকেল দ্বারা জলযোগ করিয়াছিলেন। (২) তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, আরবী, পারস্য, উর্দ্দু, হিব্রু গ্রীক, লাটীন, ফ্রেঞ্চ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। একদা দাক্ষিণাত্য হইতে জনৈক পণ্ডিত তৎপ্রদেশীয় ভাষায় তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি তিন মাসের মধ্যে উক্ত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ঐ ভাষাতেই পত্রোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। (৩) স্পেন দেশ স্বাধীন হইয়াছে শুনিয়া রামমোহন রায় কলিকাতার টাউনহলে এক ভোজ দিয়াছিলেন। ইংলণ্ড গমনকালে পথিমধ্যে ফরাসী জাহাজের স্বাধীনতার পতাকা সন্দর্শন করিয়া ব্যস্তভাবে উহাকে অভিবাদন করিতে গিয়া তাঁহার চরণ ভগ্ন হইয়াছিল। (৪) রামমোহন নারীজাতিকে নিরতিশয় ভক্তি করিতেন, হয় স্ত্রীলোকটিকে পৃথক্ আসন দিয়া বসাইতেন, নয় স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেন। (৫) বিশপ মিডিলটন তাঁহাকে পদমর্য্যাদা ও অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া খৃষ্টান হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি যাবজ্জীবন উক্ত সাহেবের সহিত আর বাক্যালাপ করেন নাই।

সাবিত্রী, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। ভাল। এইরূপই ত চাই।

স্বাস্থ্য, কার্ত্তিক। ভাল। সাবিত্রীর মত স্বাস্থ্যে বিষয়নির্ব্বাচন ভাল। হাঁপানীর ঔষধ। (১) সোরার কাগজ রোগীর গৃহে জ্বালাইলে তাহা হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহা আঘ্রাণ করিবামাত্র হাঁপানির টান নিবারণ হয়। সোরার কাগজ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। (২) হাঁপের টান আরম্ভ হইবামাত্র হাত পা গরমজলে ডুবাইলে টান শীঘ্র কমিয়া যায়। (৩) লাল পুনর্নবার শিকড় পাঁচ সিকি, গোলমরিচ তিনটি, জিরা তিনটি একত্র বাটিয়া স্নানের পর একদিন মাত্র সেবন করিলেই হাঁপানি আরোগ্য

হয়, ঔষধ সেবনের দিন হইতে এক সপ্তাহ প্রত্যহ এক পোয়া কাঁচা দুধ এক পোয়া জলের সহিত মিশাইয়া পান করিতে হয়।

বামাবোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ একত্রে। অনেকগুলি ভাল ভাল প্রবন্ধ আছে। পত্রিকার ৩৭ বৎসর বলিতেছে। "শিব-রহস্য" বেশ কিন্তু "কৈলাস" অর্থে মহাশ্মশান এটা বলা উচিৎ ছিল।

আলো, কার্ত্তিক। এবারকার আলো বেশ খুলিয়াছে। তবে "বৈদিক ঋষিগণের প্রতি" গ্যাসে লেখা।

প্রয়াস, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। ভারতীর যে রাশি, প্রয়াসও সেই রাশি পাইয়াছেন। "প্যারিচরণ সরকার" লেখাটা তোত্‌লা। ফিরিওয়ালা চলনসই তবে জ্যেঠামি ও "বন্ধুবর বুঝিলেন যে তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তরটি আমার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া ওষ্ঠাধর বিচ্ছেদপূর্ব্বক দুই একটি অমার্জ্জিত দন্তপংক্তি দেখাইল"—এরূপ গুলা বাদ দিতে হয়। বুদ্ধিমান ফিরিওয়ালা মিল ছাড়ে না। একদিন শিয়ালদহ হইতে গাড়ি আসিয়া শ্যামনগরে পহুঁছিলে একজন ফিরিওয়ালা ডাকিল "চাই মর্ত্তমান কলা আতা পাকা"। গাড়ীশুদ্ধ লোক হাসিয়া আকুল। স্বর্গীয় গঙ্গাচরণ সরকার গাড়ীতে ছিলেন তিনি ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া বলিলেন "বাপুহে আমার কাঁচা আতা চাই—দিতে পার্‌বে" ফিরিওয়ালা বড় বুদ্ধিমান, অপ্রতিভ না হইয়া একটু মুচকি-হেসে বলিল "মশাই ওটা মিলের জন্য—নহিলে হয় না। ডেকে দেখুন ঠিক্ কি না।" অক্টোবরের প্রয়াসে "সাধারণ শিক্ষা" লেখক বলিতেছেন "জাতীয় ভাষার প্রচলন একান্ত প্রয়োজন। "মানস-পরিণয়" বেশ। "মর্ম্মকথা" সত্যই মর্ম্মকথা কিন্তু কেবল রোগনির্ণয়ে কি হইবে, ঔষধ সেবন চাহি। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ একথা নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

পন্থা, অগ্রহায়ণ। এই বিষয়গুলি আছে—ভৌম-পৃচ্ছা (পদ্য), থিওসফি বা পরাবিদ্যা, স্বপ্নে দীক্ষা, মানবের সপ্তরূপ, শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর, স্বদেশের প্রতি (পদ্য), সাধনা। পন্থা ভালই, বেশ চলিতেছে। ভৌম-পৃচ্ছা, বেদের পুরুষ-সূক্ত অবলম্বন করিয়া পদ্য, একটু অস্পষ্ট। সম্পাদক কৃষ্ণধন বাবু বলিতেছেন এখন হইতে থিওসফি অর্থে বাঙ্গালায় "পরাবিদ্যা" শব্দ ব্যবহার হইবে। পূর্ব্বে শাম্ভবী বিদ্যা বলা হইত কিন্তু ঐ নামে একটি মুদ্রা আছে বলিয়া উক্ত নাম আর ব্যবহৃত হইবে না। "শাম্ভবীবিদ্যা" যে তন্ত্রেরও নাম এটা বলা হয় নাই। স্বপ্নেদীক্ষা হইতে আমরা একটু তুলিয়া দিলাম।

যে আকাশে কর্ম্মের চিত্র বিদ্যমান থাকে, উহার নাম চিদাকাশ। তৃতীয় নেত্র স্ফুরিত হইলে এই চিদাকাশ সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি নাড়ী আছে, উহার নাম সুষুম্না নাড়ী। ঐ নাড়ীর মধ্যে একটি ছিদ্র পথ আছে, সেই ছিদ্র বরাবর মস্তিষ্কের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই ছিদ্র পথের দ্বারদেশে মস্তিষ্ক মধ্যে একটি যন্ত্র আছে* উহার নাম তারাপীঠ। এই তারাপীঠের কিঞ্চিৎ পশ্চাৎভাগে কিছু উর্দ্ধে আর একটি যন্ত্র আছে; উহাই শিবলিঙ্গ†। এই শিবলিঙ্গের মধ্যে আবার একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে; ইহাই চিদাকাশের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে যখন আকাশ নিরীক্ষণ করা যায় তখন দ্রষ্টার দর্শনশক্তি ঐ যন্ত্রের ভিতর দিয়া আকাশে মিলিত হইয়া থাকে; সেইরূপ সাধক যখন তাঁহার দর্শনশক্তি আপন মেরুমধ্যস্থ রন্ধ্র পথে চালাইতে সক্ষম হন, তখন তাঁহার তেজ উক্ত রন্ধ্র পথে প্রবেশ করিয়া তারাপীঠে সঞ্চারিত হয়। এই সময় একটা দোলনের ভাব আসে। ঠিক রাধাকৃষ্ণের দোল। এই দোলনের বেগ ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে তারাপীঠে কি এক ক্রিয়া হয়; যন্নিবন্ধন উক্ত পীঠ হইতে একটি রশ্মি নির্গত হইয়া শিবলিঙ্গে সঞ্চারিত হয়। শিবলিঙ্গটি শুক্রতারার ন্যায় উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে। তখন সাধক দেখিতে পান, যেন আকাশটি তাঁহার মাথায় ঠেকিয়া রহিয়াছে। উজ্জ্বল শুক্রতারাটি ক্রমে পদ্মফুলের আকার ধারণ করে এবং এই ফুলটি যত ফুটিতে থাকে, ততই আকাশটি যেন হুস হুস করে উপরে উঠে যায়। এই যে আকাশ এই আকাশের নাম চিদাকাশ। শিবলিঙ্গের যে জ্যোতিঃ এই আকাশের প্রকাশক উহার নাম প্রাতিভ-জ্যোতি। এই জ্যোতিই ব্যক্তিগত বা জাতিগত কর্ম্মের প্রকাশক। সাধক যখন যাহার কর্ম্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন, তখন তিনি এই আকাশে সেই কর্ম্মের চিত্র চিত্রিত দেখিতে পান। যিনি আপন ইচ্ছানুসারে এই আকাশ দর্শন করিতে সক্ষম হন; তিনিই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।

সান্ধ্যাগগণে যেমন নানাবর্ণের মেঘ দেখা যায়, এবং কোন মেঘের আকার যেন মানুষের মত, কোন মেঘের আকার কোন পশুর মত, সেইরূপ চিদাকাশে কর্ম্মের চিত্র, সেই আকাশে ভাসমান নানাবর্ণে চিত্রিত নানা আকারের মেঘের ন্যায়।

চিদাকাশের চিত্রিত কর্ম্মের কথা বুঝাইতে গিয়া বাহিরের আকাশের তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মেঘের ন্যায় বলিয়াছি

*Petutary body. সম্পাদক। †Peneal gland. সং।

এবং ঐ মেঘ সকলের উৎপত্তি বুঝাইতে গিয়া উহাদিগকে জীবন্ত মূর্ত্তিমান জীব বলিয়াছি; এই দুই কথা মিলাইয়া কর্ম্মকে আমরা চিদাকাশের সজীব মেঘ বলিতে পারি। অভিমান বশতঃ প্রত্যেক মনুষ্য কতকগুলি সজীব মেঘকে এক এক জায়গায় ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে সকল বিষয়েরই শৃঙ্খলা আছে। নানাবর্ণের কর্ম্মকে একটি একটি চক্রের মধ্যে ধরিয়া রাখিবারও নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে। যাঁহারা এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা অবলম্বনে কর্ম্ম করেন না তাঁহাদের কর্ম্ম প্রসূত বিচিত্র বর্ণের মেঘ সকল তাঁহাদের আপন আপন গতি মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া থাকে। জননী দেবী প্রকৃতি বিশৃঙ্খলতা ভালবাসেন না; সেইজন্য কর্ম্মের শৃঙ্খলা শিখাইবার জন্য, মা স্বয়ং বাণীরূপে ঋষিগণের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কর্ম্মের শৃঙ্খলা বুঝানই ধর্ম্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য। সাধারণ মনুষ্য তবু ধর্ম্ম কথা শোনে না; কর্ম্মের শৃঙ্খলা মানে না। ছেলেরা যা ইচ্ছা করে করুক এই বলিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া থাকেন কিন্তু এক একটা সময় আসে যে সময় তাঁর চুপ করিয়া থাকা চলে না। তখন তিনি ঘোরা-মূর্ত্তি ধরিয়া কর্ম্ম সংহারে প্রবৃত্ত হন। চিদাকাশে তখন কাল মেঘ উদয় হয়, ঘোর হুংকার হইতে থাকে। কর্ম্মমেঘ সকল আপন আপন গণ্ডি ভাঙ্গিয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। মা অট্টহাসি হাসিতে থাকেন; আকাশে তাড়িৎস্রোত খেলিতে থাকে। বিশৃঙ্খল কর্ম্ম সমূহ পৃথক্ পৃথক্ অভিমানের গণ্ডি মধ্যে সঞ্চিত থাকায় ভিন্ন ভিন্ন মেঘে তাড়িত বৈষম্য জন্মিয়া থাকে; সেই বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য স্থাপন জন্যই আকাশের এই তাড়িৎস্রোতের খেলা আরম্ভ হয়।

কুরুক্ষেত্র সমরের সময় জননী, লোল রসনা বিকট দশনা রক্তমুখী ডাকিনীগণ সহ মিলিত হইয়া এইরূপ সংহারক্রিয়া একবার করিয়াছেন, আবার প্রায় সেইরূপ সংহার ক্রিয়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় মার এই সংহার ক্রিয়াটি যত শান্তভাবে সাধিত হয় সেই চেষ্টা মহাপুরুষগণ করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহারা চারিদিকে মার এই কর্ম্মসংহারের বার্ত্তা প্রচার করিয়া সকলকে মার এই কর্ম্মে সাহায্য করিতে বলিতেছেন। সকলকে আপন আপন জাত্যভিমান আলগা করিয়া দাও; তাহা হইলেই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম মেঘের তাড়িত সাম্য সহজেই সংঘটিত হইবে; তাহা হইলে মাকে আর ঘোর হুংকার নিনাদে চিদাকাশ কাঁপাইতে হইবে না; মধুর ওঁকার ধ্বনি করিয়াই কালীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধরিয়াই তাঁহার কার্য্য তিনি সাধিত করিতে পারিবেন।